ধীরে বহে দন

মিখাইল শলোখভ

প্রথম খণ্ড—শান্তি

—অনুবাদক—

প্রসূন চক্রবর্তী

[illegible] প্রকাশনী ● ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

সমস্যা গুরুতর! এমন অবাছিষ্টি কাজের কারণ বার করবার জন্য গ্রামে অনুমানের অন্ত নেই। মেয়ে মহলের ঔৎসুক্য এত বেশী যে ঘরকন্নার কাজ ফেলে রহস্যের কারণ নিয়ে গুলতানি করে। কেমন দেখতে প্রকোকীর স্ত্রী? গবেষণা সুরু হ'ল। কেউ বললে, অপরূপ রূপসী। কেউ বললে ঘোৎ!

হঠাৎ সৈনিক-গৃহিণী মাওরা একদিন থালি আনবার অছিলায় সাহসে ভর করে প্রকোকীর বাড়ী হাজির হল। প্রোকোফী থালি আনতে ঘরে গেলে সেই অবসরে উঁকি মেরে স্ত্রীটিকে দেখে মাওরা সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত করল প্রকোকীর স্ত্রী নিখুঁত একটি বিভীষিকা। সেই দিনই সমস্ত জল্পনা কল্পনার শেষ।

মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল এক গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাওরা চোখ মুখ পাকিয়ে নারীমহলের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রছে।

—কি দেখে যে ওর মন মজল বুঝলাম না ভাই। সোমত্ত মাগী তো, পেট পাছা কিছু নেই! পোড়া কপাল আর কি! ওর চেয়ে ঢের ঢের ভাল মেয়ে বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোমর ত সরু এইটুকু—ঠিক বোলতার মত। মোচড় দিলেই ভেঙে যায়। কালো পিটপিটে চোখ, আর কি তার চাহনি! ডাইনির মত চোখ দুটো জ্বলছে। রক্ষে করো বাবা! আমার কিন্তু মনে হ'ল ভাই ভরা মাস পোয়াতি।

—মাস হয়ে এসেছে?—উৎসুক বিস্ময়ে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে।

—আমি খুকী নই! তিন-চারটি ছেলেমেয়ে আমারও হয়েছে।

—আচ্ছা, মুখখানা দেখতে কেমন?

—মুখ? ফ্যাকাশে হলদে, বিচ্ছিরি! কেমন মনমরা ভাব। বিদেশে একলা থাকা মেয়েদের তাই বড় জ্বালা!...কত আর ঢাকবো ছাই, মেয়ে হয়ে সে কি না প্রকোকীর পাজামা পড়ে?

—সত্যি?—অবাক বিস্ময়ে মেয়েরা ভড়কে যায়।

—নিজের চোখে দেখেছি আমি! পাজামা পড়েছে বটে কিন্তু ডোরা কাটা নয়। ওটা হয়ত আটপৌরে। পাজামার ওপরে লম্বা একটা সেমিজ পড়ে। দেখে শুনে আমি তো তাজ্জব।

সঙ্গে সঙ্গে কাণাঘুষা হ'য়ে রটে গেল—প্রকোফীর স্ত্রী নিশ্চয় ডাইনি। আস্তাখফের পুত্রবধূ দিব্যি করে বললে, সূর্য্য উঠবার আগে নিজের চোখে দেখেছে সে একদিন,—খাড়া খাড়া চুল খালি পায়ে প্রকোফীর স্ত্রী তাদের গাই দোহাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সেইদিন থেকেই গরুর বাঁট শুকিয়ে কুঁচকে এইটুকু! আর দুধ হওয়া তো দূরের কথা ক'দিন বাদেই মরে সারা!

আস্তাখফদের ঘর প্রকোফীর পাশেই। কাজেই এ সাক্ষী অকাট্য।

যে কারণেই হোক্ মড়কের প্রকোপ সেবারে বেশ কিছু অতিরিক্তই হ'ল। দেখতে দেখতে দনের চড়া গরু বাছুরের কঙ্কালে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। গ্রামের গোহালটের গরুর পাল কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। গরু সাবাড় হ'য়ে গেলে এলো ঘোড়ার পালা। কুৎসিত একটা গুজব গলিতে গলিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সবাই মিলে বৈঠক ক'রে একদল কজাক জোট বেঁধে প্রকোফীর বাড়ী হাজির হ'ল। বারান্দায় এসে প্রকোফীর অভ্যাগতদের স্বাগত জানালে।

—হঠাৎ আপনাদের পদধূলি...। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস ক'রল।

নিঃশব্দে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে মাতাল এক বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে ব'ললে—টেনে বার কর ডাইনিকে; আজ ওর বিচার করব।

প্রকোফী দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করতেই দরজার কাছে তাকে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়ে লুশনিয়া ডাক নামের জোয়ান এক কজাক বললে—"টু শব্দ করবিনে। চুপ করে থাকিস—ত' কিচ্ছু

বলব না, ছোঁবও না তোকে! কিন্তু ডাইনিকে আজ দেখে নেব আমরা পা দিয়ে মাড়িয়ে ওকে শেষ করে তবে ছাড়া। গাঁ শুদ্ধ লোক মরতে বসেছে গরুর অভাবে; সবাই এক সঙ্গে শেষ হবার চাইতে একা ওকে সাবাড় করাই ভাল। কিন্তু তুই একটি কথাও বলেছিস ত' রক্ষা নেই। এই দেয়ালে ঠুকে মাথা গুড়ো করে দেব।"

—বার কর টেনে!—জনতার মধ্য থেকে চীৎকার ক'রে আর একজন বললে। (টেনে'

প্রকোফীর রেজিমেন্টেরই এক কমরেড্ এক হাতে চুল অপর হাতে মুখ চেপে ধরে হেঁচ্কা এক টান মেরে স্ত্রীলোকটিকে ফেলে দিল ক্ষিপ্ত জনতার পায়ের তলায়। তখন সেই পৈচাশিক হৈ হল্লোর ভেদ করে একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ প্রকোফীর কাণে এল। উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ছ' সাত জন কজাককে ঠেলে ফেলে ছুটে ঘরে ঢুকে দেয়াল থেকে তরবারি নিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল। হুড়মুড় করে সকলেই তখন বারান্দা থেকে ছুটে বেরুল।—মাথার ওপর বোঁ বোঁ শব্দে তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতে প্রকোফীও লাফিয়ে পড়ল তাদের পেছন পেছন। ভয় পেয়ে জনতা তখন প্রাঙ্গণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। লুশনিয়া দৌড়াতে পারত না বলে প্রকোফী জাঁতাকলের কাছে এক তেচ্ছি কোপে তার বাঁ কাঁধ থেকে কোমর অবধি দুভাগ ক'রে ফেল্ল। জাঁতাকলের বেড়া ভেঙে অন্যান্য সকলেই ততক্ষণে মাঠের মধ্যে সটকেছে।

আধঘণ্টাখানেক পরে আবার সকলেই এসে প্রকোফীর বাড়ীর চার পাশে উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল। দু'জন অতিসন্তর্পণে বেড়ার মধ্যে ঢুকে দেখে রান্না ঘরের চৌকাঠের কাছে প্রকোফীর স্ত্রী চিৎ হয়ে অসাড় ভাবে পড়ে আছে। সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত খেত্লান জিভ্টা অনেকখানি বেরিয়ে পড়েছে; দাঁতে খিল লাগান, আর ঠোঁট

দু-খানি তখনও অস্ফুট যন্ত্রণায় কাঁপছে। সীধা হেঁট করে প্রকোফী দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে ছলছল চোখে; হাতে ভেড়ার ছালে জড়ান টুকটুকে লাল পিণ্ডিল একটি নবজাতক—অনবরত ট্যাঁট্যাঁ করে কাঁদছে। অপূর্ণ মাসেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশুটি।

প্রকোফীর স্ত্রী সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই মারা যায়। নবজাত শিশুটিকে দেখাশুনা করবার ভার প্রকোফীর বৃদ্ধা মা-ই নিলেন। ছেলেটিকে দেখে বৃদ্ধার কেমন যেন মায়া হয়েছিল। অপূর্ণ মাসে জন্মেছে বলে ভূষির গুঁড়ো মাখিয়ে ঘোড়ার দুধ খাইয়ে মাসখানেক যখন কাটল তখন ভরসা হ'ল তুর্কী-চেহারার ছেলেটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে। গীর্জ্জায় নিয়ে গিয়ে নামকরণ করা হল। ঠাকুর্দার নাম অনুসারেই নাম রাখল পান্তেলিমন। বছর বার পরে প্রকোফী নির্ব্বাসন থেকে যখন ফেরে তার ছাটা সোনালী দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে; রুশ পোষাকে তাকে এমন দেখাচ্ছিলো যে হঠাৎ দেখে কজাক বলে চেনাই ভার। বাড়ী এসেই সে ছেলেকে নিয়ে নিজের ফার্ম্মে উঠল।

পান্তেলিমন দেখতে অনেকটা মায়ের মতই হয়েছিল। চেহারায় পুরোপুরি তুর্কী ছাপ—ময়লাটে রঙ। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাগে আনা দুষ্কর হ'য়ে উঠল। বেশী দেরী না করে প্রকোফী পড়শী এক কজাকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। সেই থেকেই কজাক-ধমনীতে তুর্কী-রক্তপ্রবাহের শুরু [illegible]। বড়শীর মত নাক মেলেখফ্ পরিবারের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এইটুকুই। গ্রামে এই তুর্কী-কজাক জানোয়ারের মত জোয়ান পরিবারটিকে সবাই ডাকত 'তুর্কী' বলে।

বাবা মারা গেলে ফার্ম্ম দেখাশুনা করবার ভার পান্তেলিমন নিজেই নিল। কিনে দু-এক একর জমি-জমাও বাড়াল। নতুন করে ঘরের চালে ছাউনি দিলে। টিনের একখানা নতুন গোলাঘর তুলে কাটছাট টিন দিয়ে

দুটো মোরগ তৈয়ারী করিয়ে চালের মাথায় লাগিয়ে দিল। পান্তেলিমনের বহু প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই মেলেখভ খামারের শ্রী বদলে গেল। দেখলেই মনে হ'ত বেশ নিশ্চিন্ত সন্তুষ্টি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে পরিবারটি।

বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে পান্তেলিমন প্রকোফিয়েভিচ্ বেশ ভারিক্কি আর খানিকটা কোল কুঁজো হয়ে উঠল। তবু তার কাটখোট্টা চেহারা বেশ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ বলেই মনে হ'ত। অনেক দিন আগে সম্রাটের সৈন্য পরিদর্শন করবার সময়ে ঘোড়া থেকে পড়ে তার বাঁ পা'খানা ভেঙে যায়। সেই থেকে সে পা'খানা টেনে একটু খুঁড়িয়ে চলে। বাঁ কানে ছিল একটা অর্দ্ধচন্দ্র ইয়ারিং। মৃত্যু পর্য্যন্ত তার ঘনকৃষ্ণ দাঁড়কাকের মত চুলদাড়ির কোন অপক্বই হয়নি। দোষ ছিল রাগ হ'লে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। আর এই গোঁয়ার্তুমিই বোধ হয় তার মোটা-সোটা স্ত্রী ইলিনিচনার অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু। এককালে মুখখানা দেখতে বেশ ভালই ছিল ইলিনিচনার; কিন্তু আজ চাইলে কুঞ্চিত রেখার ভাঁজ ছাড়া অন্য কিছু দেখবার জো নেই। মনে হয় যেন মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। বিবাহিত বড় ছেলে পিয়োতর দেখতে মায়েরই মত—গাট্টাগোট্টা, থ্যাবড়া নাক, কটা চোখ আর এক মাথা ঝাঁকড়া সোনালী চুল। বুদ্ধিও কিছুটা সোজাসোজাই ছিল। কিন্তু ছোট ছেলে গ্রীগরী ছিল হুবহু বাপের মত;—সেই বঁড়শীর মত নাক, ময়লা রঙ, বাঁকানো চিবুকের কাছে দাদ্‌চে ভাব, বাপের মতই একটু সামনে ঝুঁকে চলে, এমন কি দু'জনে হাসে পর্য্যন্ত এক ভাবে।—আশ্চর্য্য মিল! জন্তুরই থাকে শুনেছি। পিয়োতরের চাইতে দু'বছরের ছোট হলেও মাথায় ঢ্যাঙা গ্রীগরীই। প্রকোফীর আদুরে মেয়ে দুন্যা দেখতে ভালই; লম্বাপনা চেহারা টানা টানা চোখ—বেশ!

আর বাকী রইল পিয়োতরের স্ত্রী দারিয়া; কোলে ছোট্ট একটি মেয়ে!—এদের নিয়েই পান্তেলিমনের পরিবার!

—দুই—

ঊষার পাণ্ডুর আকাশে তখনও দু'একটি তারা এখানে-ওখানে লেগে রয়েছে। মেঘের কূল থেকে কনকনে হাওয়া এসে বনের বুকে জটপাকানো কুয়াসার কুণ্ডলী খড়ির পাহাড়ের গায়ে ঠেলে এনে জড়ো করে রেখেছে। কোথাও বা সেই ঘন পুঞ্জীভূত কুয়াসার কুণ্ডলী কবন্ধ সরীসৃপের মত পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। ওপারের নদী সৈকত, বালুচর, বাওড়, পাথুরে চড়া আর শিশিরসিক্ত লতা পাতার বুকে প্রভাতী পুলকের উচ্ছ্বসিত শিহরণ। সূর্য্য ওঠেনি তখনও দিগন্তের অন্তরালে হাই তুলছে।

মেলখভ-পরিবারে পান্তেলিমনই উঠল সবাইর আগে। আড়াআড়ি ভাবে সেলাইকরা সার্টের বোতাম দিতে দিতে বারান্দায় এসে দেখে প্রাঙ্গণের ঘাসের মাথায় রজতশুভ্র তুষারের টোপর ঝলমল করছে। গোয়াল থেকে গোরুগুলি ছেড়ে দিতেই দারিয়া বাসি কাপড় না বদলে ছুটল গরু দোহাতে। তার শুভ্র নগ্ন পায়ে তুষারকণা জড়িয়ে চিক্ চিক্ করতে লাগল—পশ্চাতে ঘাসের উপরে রইল শিশিরের ধূমায়িত একটি রেখা। কয়েক মুহূর্ত্ত পান্তেলিমন নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল—মাড়ান তৃনদল কি করে মাথা তুলে উঠছে আবার। তার পর, রান্নাঘরের দিকে গিয়ে ডাকল—এই গ্রীশকা, গ্রীশকা! ওঠ!'

খোলা জানালার পর বাগানের শেরীফুলের কয়েকটি আধশুকনো পাপড়ি পড়ে ছিল। উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছিল গ্রীগরী। বিছানা থেকে একটা পা নামিয়ে সাড়াদিল—'কি?' মাথা তুলে শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে দেখে বাবা দাঁড়িয়ে।

—'চল্ মাছ ধরতে যাবো!'—পান্তেলিমন বললে।

অত ভোরে বিছানার মায়া কাটাবার রুচি তার আদৌ ছিল না। তবু হাই তুলে দু-চারটে আড়মোড়া দিয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে সে উঠে বসল। নাকে ফোঁস ফোঁস করে আট পৌরে প্যাণ্টটা আলনা থেকে নামিয়ে আনল গ্রীগরী! সাদা পশমী মোজাজোড়া পায়ে গুঁজে হাত বাড়িয়ে জুতা জোড়া আস্তে টেনে আনল। তারপর দরজার কাছে এসে শুধাল—'মা রাই সিদ্ধ করেছে?'

—'করেছে। যা তুই নৌকোয় আমি আসছি।'

বৃদ্ধ তখন সেই ঝাঁঝালো সিদ্ধ রাই একটা ঘড়ার মধ্যে ঢালল; মেজেতে যা পড়েছিল সযত্নে কুড়িয়ে নিলে; তারপর খুঁড়িয়ে চলল নদীর দিকে। গ্রীগরী ততক্ষণ নৌকায় বসে উসখুস্ করছে।

—'কোথায় যাবো?'—গ্রীগরী শুধায়।

—'ও পারের ওই কালো পাহাড়টার কাছে। সেদিন যেখানে কাঠখানা ছিল তার কাছাকাছি ছিপ ফেলে দেখ্‌বো।

পাড়ে আঁচড় কেটে নৌকা জলে ভাসল। স্রোতের টানে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আড় হয়ে যেতে চায়। দৃঢ়হস্তে হাল চেপে রইল গ্রীগরী। বাইছে না।

—'বাইছিস্ না কেন?'

—মাঝ গাঙে যাই আগে!'

নদীর খরস্রোত কেটে নৌকা মাঝগাঙে এল। ওপাড়ের মোরগের ডাক জলকল্লোলে ব্যাহত হয়ে ক্ষীণ ভাবে কানে আসিছে। নদীর পাড় থেকে হাত ত্রিশেক দূরে একটা ডুবো এল্‌ম গাছের কয়েকখানা ঠুঁটো ডাল দেখা যাচ্ছে। নদীর তোড়ে জল পাকিয়ে ফেনিয়ে তার চারপাশে অজস্র আবর্তের সৃষ্টি করেছে। কালো পাহাড়টার গা ঘেঁসে নৌকা বেয়ে গ্রীগরী তারই কাছাকাছি একটা খাড়ির মধ্যে নোঙর করল।

—সুতো বার কর—আমি ভাল করে বেঁধে দিচ্ছি।'—অনুচ্চস্বরে পান্তেলিমন বলল।

ধূমায়িত ভাড়ে হাত দিয়ে পান্তেলিমন রাই ছড়িয়ে দিতে লাগল—টুপ, টুপ, টুপ। মনে হ'ল ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে কেউ। ঠোঁট চেপে মুচকি একটু হাসল গ্রীগরী।

—'ছোট বড় সব রকম মাছই আছে এখানে।' বৃদ্ধ বলল। বড়শী ফেলে পা দিয়ে ছিপটা ঠেসে ধরে, সন্তর্পণে তামাকের পাউচের জন্ত হাতড়াতে লাগল গ্রীগরী। সুতোগাছা প্রথমে প্যাচালোভাবে জলে পড়ে টান হল; তারপর আবার ঢিলে হ'ল।

—আজ খুব সুবিধে হবে না বাবা; চাঁদ ঐ দেখ ডুবছে।

—দিশলাই এনেছিস্?

—আছে।

—দে।

ধূমপান করতে করতে বৃদ্ধ চাইল পূব আকাশের দিকে। সূর্য্য তখন এলম গাছটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'কখন যে কার্পে টোপ খাবে কেউ বলতে পারে না। চাঁদ ডুবলেও কখনো কখনো খায়।

নৌকায় ধাক্কা লেগে জলে একটা অস্ফুট কুলকুল শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ একটা হাত তিনেকের মত কার্প মাছ লেজ বাঁকিয়ে জলের ওপর ছাট দিল। রক্তিম একখণ্ড তাম্রের আভা চোখ ঝলসে দিয়ে গেল যেন। জলের ছাঁট নৌকার ওপর ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল।

আস্তিনে ভিজা দাড়ি মুছে পান্তেলিমন বললে,—'চুপ করে বসে থাক্।'

ডুবো গাছটার ঠুটো ডালগুলির মধ্যে একসঙ্গে দুটো কার্প ছাট দিয়ে উঠল। আর একটা পাহাড়ের কোল ঘেসে ছুটাছুটি করতে

লাগল জলের ওপর। বাকী চাড়টুকু ছড়িয়ে দিয়ে পান্তেলিমন নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইল ছিপের দিকে। কুয়াসা ঢাকা সূর্য্য তখন দিগন্ত ছাপিয়ে আধখানা উঠেছে। এমনি ভাবে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব। গ্রীগরী উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে সে সিগ্রেটের শেষাংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিলে। স্রোতের টানে টুকরাটি পাক খেয়ে ভেসে গেল। এত ভোরে জাগাবার জন্য সত্যিই সে চটে গেছে বাবার ওপর। তার ওপর খালি পেটে সিগ্রেট ফুঁকে মুখটা কেমন বিশ্রী হয়ে গেল। নীচু হয়ে হাতের তেলোয় করে জল খেতে যাবে ঠিক সেই সময়েই ফাতনাটা ঈষৎ ঢুলে বাঁকা ভাবে আস্তে জলের তলায় চলল।

—'খেলিয়ে তুল্‌বি।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বলল।

সোজা হয়ে গ্রীগরী শক্ত করে ছিপটা ধরল; কিন্তু তুলতে পারল না; ধনুকের মত বেঁকে ছিপের মাথা জলের নীচে অদৃশ্য হল। দু-হাতে ধরে সজোরে টান মারল; কিছুতেই ওঠে না। টানাটানি করতে করতে পট ক'রে একটা শব্দ হ'ল। প্রায় পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে গেছল' গ্রীগরী; টাল সামলে নিয়ে চেয়ে দেখে অত শক্ত সুতোগাছা ছিঁড়ে গেছে। খপ করে ছেড়া সুতোটা ধরবার জন্য পন্তেলিমনও জলের ওপর থাবা দিলে কিন্তু সুবিধা হ'ল না। পলক ফেলতে না ফেলতে নৌকার পাশ কাটিয়ে সুতোটা চলে গেল। শূন্য মুষ্টি ওপরে তুলে রেগে বললে বৃদ্ধ—'গেছে ত! খাও! পেট ভরে জল খাও এখন।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বাবার পানে চেয়ে আর এক গাছা সুতো গেথে আবার ছিপ ফেলল গ্রীগরী। সুতো পড়ে সারতে পারল না। অমনিই টান পড়ল ছিপে।—'ঐ আবার ধরেছে শালা!'—গ্রীগরী বললে।

মাঝ গাঙে যাবার জন্য মাছটা তখন গোঁত্তা মেরেছে। জোর মত্তে টেনে গ্রীগরী নামাতে লাগল। সোঁ সোঁ শব্দে সুতোটা জল কেটে দিচ্ছে।

লোহিতাভ একটা কার্প ওপরে ভেসে উঠে জল তোলপাড় করে আবার তলায় যাবার জন্য গোঁ মারল। সুতো গুটিয়ে গ্রীগরী মাছটাকে নৌকার কাছে নিয়ে এল। সেচনীর হাতলটা তুলে পন্তেলিমন উঠে দাঁড়াতেই গ্রীগরী বললে—

—'আচ্ছা করে পিটবে শালাকে। না, দাঁড়াও!'

—ধরে রাখিস।

—রেখেছি!

—নৌকার তলায় যায় না যেন।

দম নিয়ে কোন মতে গ্রীগর মাছটা তুলল নৌকার পাশে। চোয়ালে বিঁধানো বঁড়শীতে টান লেগে হা করে গেছে মাছটা।—সেচনীটা তুলে মারবার আগেই মাছটা তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে টান মেরে আবার জলের তলায় ডুব দিল।

—মাথাটা টেনে তোল উপরে। হাওয়া খেলে ঠাণ্ডা হবে।—বৃদ্ধ বললে।

গ্রীগরী ক্লান্ত মাছটা টেনে নৌকায় পাশে তুলতেই তাড়াতাড়ি তাকে সেচনীতে করে তুলে বললে বৃদ্ধ—'যাক্ এবার আর পারল না যেতে।'

"দ্বিতীয় শিকারের আশায় আরও আধঘণ্টাখানেক তারা অপেক্ষা করল; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই!

—'নে, এখন সুতো গুটিয়ে ফেল। আজ আর ছাট রেখে না।' অবশেষে বৃদ্ধ বলল।

নৌকা ছেড়ে দিয়ে ঠিক ঠাক হয়ে বসে বাবার মুখের পানে চেয়ে গ্রীগরীর মনে হ'লো—কি যেন বলতে চায়! পান্তেলিমন উদাস দৃষ্টিতে পাহাড়ের গায়ে ওই গ্রামের পানে চেয়ে ছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটল। দু'জনেই নির্ব্বাক। পায়ের তলার চটখানা খুটতে খুটতে সহসা

বৃদ্ধ বললে—'দেখ গ্রাগরী! আমি লক্ষ্য করেছি, তুই আর আকসিনিয়া…'

বাবার মুখে আকসিনিয়ার কথা শুনে গ্রীগরীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। মাথা হেঁট করে অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইল। শার্টের আঁট সাট কলার তার রোদে পোড়া কালচে পেশল ঘাড়ে কেটে বসল।

এবারে বেশ ক্রুদ্ধভাবেই বৃদ্ধ বলতে শুরু করল—'স্তেপান আমাদের পড়শী। তার বৌয়ের সঙ্গে এ সব তোর মোটেই ভাল না। এ থেকে বহু কেলেঙ্কারী হ'তে পারে। আগে থেকে সাবধান ক'রে দিলাম। ফের যদি কোন দিন বেয়াদপি টের পাই ত চাবকে সোজা করব।'

আঙুলগুলি হাতের মধ্যে নিয়ে পান্তেলিমন রগ্‌ড়াতে লাগল। চেয়ে দেখে ছেলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—মিথ্যে কথা! জড়িত কণ্ঠে বাবার দিকে চেয়ে গ্রীগরী বলে।

—চুপ!

—লোকে যদি বলে তাহ'লেই…

—চুপ কর, হারামজাদা!

ধমক খেয়ে গ্রীগরী অবনতমুখে ঝুঁকে বসে দাঁড় টেনে যাচ্ছে। পেছনে ছোট ছোট জলের পাকানো কুণ্ডলী তুলে নৌকা ছপাৎ ছপ্‌ কলকল শব্দে লাফিয়ে এগুতে লাগল। দু'জনেই নীরব। পাড়ের কাছে এসে আবার শাসিয়ে বললে বৃদ্ধ—'খুব সমঝে চলবি। যা বললাম তার একচুল যেন নড়চড় না হয়! ফের যদি বেয়াদপি করবি ত' আজ থেকেই ইয়ারকি বন্ধ করে দেব। বাড়ী থেকে একপা' বেরুতে দেব না!'

গ্রীগরী নিরুত্তর। তীরে নৌকা বেঁধে শুধু জিজ্ঞাসা করল—'মাছ কি ঐ বৌয়ের দিয়ে আসব?'

—'না, মোথকের বাড়ীতে বেচে আয় গে; সিঁগ্রেট কিনবার পয়সা হবে তোর!'—কতকটা শান্ত ভাবেই বৃদ্ধ বলল।

ঠোঁট কামড়ে গ্রীগরী চলল বাবার পেছনে পেছনে। রুদ্ধ রোষে চোখ দুটো জলছে। বাপের ঘাড় চিবিয়ে খেলে হয়ত রাগ কমবে।

—'ভাখ না চেষ্টা করে'। ব'লছে মনে মনে—'পা বেঁধে রাখলেও আজ রাতে আমি যাবই।'

গোলাবাড়ীর ফটকের কাছে এসেই দৌড়ে সে বন্ধু মিচকার কাছে গেল। ঝিঝিত্রি কোরগুনক চাদি বসান বেল্টটা নিয়ে উঠানে খেলা করছিল। তার পীতাভ চোখ দুটি ছোট্ট কোটরের মধ্যে প্রায় সব সময়েই পিট পিট করত; তারার বেষ্টনী ছিল অনেকটা বিড়ালের মত ছড়ান। দৃষ্টিতে ছিল কেমন একটা চঞ্চল অস্থিরতা। গ্রীগরীকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করল—'মাছ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে গ্রীগরী?'

—মোখকের বাড়ী। আজই ধরেছি মিচকা।

—কত ওজন হবেরে? পাউণ্ড পনরো? মাছটার দিকে চেয়ে মিচকা বলে।

—না। মেপেছি। আরও আধ পাউণ্ড বেশী!

—আমাকে সঙ্গে নে না। আমিই বেচে দেবো তোর হয়ে!

—চল!

—কত দিবি আমায়?

—চল বখরা নিয়ে আর ঝগড়া হবে না!

গ্রীগরী হেসে বলে।

উপাসনা তখন শেষ হয়েছে। গ্রামবাসীরা সবাই যে যার বাড়ী চলেছে। শামিল ভ্রাতৃত্রয় দল বেঁধে পাশাপাশি আসছিল। বড় ভাই হুলো আলেকসি ছিল মাঝখানে। উর্দির আটসাট কলারের দরুণ আলেকসিকে শিরাল ঘাড় সোজ করেই চলতে হচ্ছিল। পাতলা কোঁকড়ান

দাড়ি গালের দুইপাশে বেখাপ্পাভাবে মোচড় খেয়েছে—অনবরত টিপ পড়ছে চোখে। একবার আলেকসির হাতের পরেই বন্দুকের নালটা ফেটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লোহার টুকরা ছিটকে তার বাঁ চোখের কাছে গালের মধ্যে বিঁধে যায়। সেই থেকে চোখটা সব সময়েই টিপ্ টিপ্ করে। গালের কাটা দাগটা আজকাল ঢাকা পড়ে গেছে পাতলা কোঁকড়ানো দাড়িতে। বাঁ হাতখানাও ছিল কনুইয়ের কাছে কাটা। তবু ঐ এক হাতেই সিগ্রেট পাকাতে আলেকসির জুড়ি গাঁয়ে ছিলো না। বুকের ওপর তামাকটা রেখে দাঁত দিয়ে মাপসই কাগজ কেটে পলক ফেলতে না ফেলতে সে সিগ্রেট তৈরী করে ফেলত।

নুলো হলেও মল্লযুদ্ধে আলেকসির সঙ্গে এঁটে ওঠা দুষ্কর। মুঠিটা তেমন বড় না হলেও এমন কড়া ছিল যে জমি চাষ করাবার বেলা হালের বলদ যদি বেয়াড়াপনা করতো আর চাবুকটা যথাস্থানে না থাকত, তাহলে এমন রদ্দাই সে লাগত যে নাককান দিয়ে রক্ত ছুটে বলদ সেই মাঠের মধ্যেই সাবাড় হ'ত। ধড়ফড় করে যে পড়ত আর উঠতেই হ'ত না। অপর দু'ভাই মার্তিন আর প্রখর দেখতে হুবহু আলেকসির মত। নিখুঁত মিল। দাদার মতই নিরেট চেহারা, প্রশস্ত বক্ষ; প্রভেদ শুধু হাত ওদের দুখানা করেই ছিল। মিচকা ও গ্রীগরীর কাছে এসে আলেকসি পর পর পাঁচ বার টিপ মারলে চোখে।

—এই বেচবি মাছ? জিজ্ঞাসা করলে আলেকসি।

—কিনবি?

—দাম কত?

—এক জোড়া ষাঁড় আর বউ একটা!

—বউ একটা—অ্যাঁ! ছেলেপিলেও নিবি তো! হি হি করে হেসে বললে আলেকসি নুলো হাতখানা নেড়ে।

—'এখনো মরে পড় বলছি'—রেগে শ্রীগরী বললে—'না হোলে শাফিল বংশের একটা থেকে যাবে।'

স্কোয়ারের কাছে অনেক লোক গোল হয়ে ভীড় করে বসে আছে। মাঝখানে এক বৃদ্ধ। বহু ক্রশ চিহ্ন এবং মেডেল তার বুকে। হাত ছুড়ে ঘুরে ফিরে বৃদ্ধ কি বলছে। নির্ব্বাক বিস্ময়ে শ্রোতৃমণ্ডলী হা করে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের ইশারায় তাকে দেখিয়ে মিচকা বললে—'দেখ শ্রীগরী, দাদু তুর্কী যুদ্ধের গল্প বলছে। চলনা, শুনে আসি।'

—না, মাছটা তা হোলে এরি মধ্যে মরে ফুলে উঠবে।

স্কোয়ারের কাছে দমকলের চালার পছনেই মোখফের বাড়ী। চালাটা কাটিয়ে তারা সিঁড়ির পাশে দাঁড়াল। রেলিঙয়ে জড়ানো বুনো আকালতা সিঁড়িতে একটা অলস বিবর্ণ ছায়া ফেলেছে।

শ্রীগরী বললে—'দেখ মিচকা কত আরামে থাকে?'

বারান্দায় ঢুকবার দরজা খুলে শ্লেষকটু কণ্ঠে মিচকা বললে—'ওঃ! দরজার হাতলের বাহার দেখ না!

—কে?—ভিতর থেকে বামাকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল।

সঙ্কুচিতভাবে ঘরে ঢুকল শ্রীগরী। মাছটার লেজে চিত্রিত মেজেতে একটা টানের দাগ পড়ল।

—কাকে চাই?

এক পিরিচ ষ্ট্রবেরী হাতে একটি মেয়ে বসেছিল রকিং চেয়ারে। মেয়েটির প্রগলভ্ গোলাপী ঠোঁটে একটি ষ্ট্রবেরী। পলকহীন চোখে শ্রীগরী দেখছিল মেয়েটিকে। চোখ তুলে মেয়েটি বেশ ভাল করেই দেখে নিলে ছেলে দুটিকে। ষ্ট্রবেরীটি তখনও তার ঠোঁটে। কয়েকপা' এগিয়ে এসে দু-একটা গলা খাকাড় দিয়ে মিচকা বললে—'মাছ নেবে...'?

বেরীটি মুখে পুরে মেয়েটি মুচকি হাসলে একটু।

—মাছ? আচ্ছা দাঁড়াও, এসে বলছি।

চুমকির চটি চটপট করে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। সূর্যের আলো তার শুভ্র স্বচ্ছ পোষাক ভেদ করে নিটোল পরবয়ের পরিপূর্ণ এক অস্পষ্ট ছবি মিচকার চোখের সামনে তুলে ধরল। আটসাট জাঙ্গিয়ার ভাজ কটিও তার সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারল না। মেয়েটির পা দুখানি দেখে তো তাজ্জব; সাটিনের মত সাদা গোড়ালীর কড়ার কাছে শুধু ঈষৎ পীতাভ—দুধের মত।

—কেমন কাঁচের মত পোষাক দেখছিস গ্রীশকা! সব দেখতে পাওয়া যায়।—গ্রীগরীর বদলে মাছটাকে ঠেলা মেরে মিচকা বললে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠে মেয়েটি বললে—ভেতরে যাও।

পা টিপে নিঃশব্দে গ্রীগরী ভেতরে গেল। গ্রীগরী চলে যাবার পর মেয়েটির সীমন্তের পানে চাইলে মিচকা। সোনালী কুন্তলের দুটি অর্দ্ধবৃত্তের মাঝখানে শুভ্র একটি সযত্ন বিন্যস্ত রেখা! চটুল দৃষ্টিতে মেয়েটিও লক্ষ্য করছিল মিচকার মনের গতি।

—এই গাঁয়েই তোমার বাড়ী?—জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি।

—হ্যাঁ!

—কার ছেলে?

—কোরশুনকের।

—নাম?

—মিচ্‌কা।

গোলাপী নখ খুট্‌তে খুট্‌তে সহসা মেয়েটি পায়ে পা জড়িয়ে চেপে বসল।

—মাছটা কে ধরেছে?

আবার শুরু হলো জেরা।

—শ্রীগরী আমার বন্ধু।

—তুমিও ধরো মাছ?

—খেয়াল হ'লে ধরি বই কি?

—বড়শী দিয়ে?

মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল মিচ্‌কা। একটু চুপ করে' থেকে মেয়েটি বললে—আমারও বড্ড ইচ্ছে করে মাছ ধরতে।

—বেশ তো যাও যদি একদিন নিয়ে যেতে পারি

—সত্যি?—সোৎসাহে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে,—কিন্তু কি ক'রতে হবে তাহ'লে?

—খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে।—মিচ্‌কা বলে।

—উঠ্‌বো। তুমি আমায় জাগাতে পারবে তো!

—সে হবে' খন। কিন্তু তোমার বাবা যদি···

—কি বাবা যদি?

—আমাকে চোর মনে করতেও তো পারেন!—হেসে মিচ্‌কা বলে।

—ওঃ! সে ভয় নেই! কিচ্ছু আট্‌কাবেনা তাতে। আমি ঐ কোণের ঘরে শুই! ওই যে জানালা দেখছো— আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মেয়েটি।—তুমি এসে জানালায় শব্দ ক'রলেই আমি জাগবো।

মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিক থেকে শ্রীগরীর ভারু জবাব আর পাচকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। মিচ্‌কা নীরবে তার বেল্টের বোতাম পর্য্যবেক্ষণ করে তা' থেকে নতুন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল।

—বিয়ে হয়েছে তোমার? অধরে হেসে কৌতূহলী কণ্ঠে মেয়েটি শুধাল।

—ও কথা জিজ্ঞেস্ করছো কেন ?

—না অমনিই ! কৌতূহল হ'ল তাই জিজ্ঞেস্ করলাম।

—নাঃ ! একাই আছি।

মিচ্‌কা একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল। ঠোঁটে ছুষ্টু হাসি হেসে মেজেতে ছড়ান' বেরীর একটি গুচ্ছ তুলে নিয়ে আনমনাভাবে আড়চোখে চেয়ে বললে মেয়েটি,—মেয়েরা তোমাকে খুব ভালবাসে না মিচ্‌কা ?

—কেউ বাসে কেউ বাসে না।

—আচ্ছা চোখ দুটো তোমার অমন বেড়ালের মত কেন ?—সহসা মেয়েটি বলল।

—বেড়ালের মত ?—নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে চাইল মিচ্‌কা।

—হাঁ, অবিকল।

—কি আর করি বলো ! ওদুটি আমি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি।

—আচ্ছা মিচকা, তারা তা হ'লে তোমাকে বিয়ে করে না কেন ?

এবারে মিচকার সাময়িক বিব্রতভাবটা একেবারেই কেটে গেল। মেয়েটির প্রশ্নে রঙ্গের আভাষ পেয়ে চোখে কয়েকটা টিপ মেরে কৌতুকী কণ্ঠে মিচকা বললে—আমার বউ এখনও খুকী।

মেয়েটি এ উত্তরের জন্ম আদৌ প্রস্তুত ছিল না। চেয়ার ছেড়ে বড় বড় চোখ তুলে একদৃষ্টে সে মিচকার পানে চেয়ে রইল। তার ম্লান ব্যথিত হাসি মিচকাকে বিছুটি মারলে।

হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার জুতোর শব্দ শোনা গেল। গৃহস্বামী স্থূলদেহ সেরগেয়ি প্লাতোনোভিচ মোথফ্ একটু পরেই ফিড-জুতো পরে ভারিক্কি চালে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। যাবার বেলা মুখ না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন—কোন কথা আছে আমার সঙ্গে ?

জবাব মেয়েটিই দিলে—ও মাছ নিয়ে এসেছে বাবা।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। গ্রীগরী বেরিয়ে এল খালি হাতেই।

—তিন—

প্রহরখানেক রাতে সফর শেষ করে গ্রীগরী বাড়ী ফিরল। বারান্দায় পা ফেলতেই একটা ঝাঁঝালো টক্ গন্ধ নাকে এল। পা টিপে ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে বেশভূষা ছেড়ে রবিবারে পড়বার ছিটের পাজামাটা সযত্নে টাঙিয়ে রাখল দেয়ালে। তার পর ক্রশ করে শুয়ে পড়ল। রূপালী এক ঝলক জ্যোৎস্না মেজেতে চিত্রবিচিত্র হয়ে গলে প'ড়েছে; তারই স্তিমিত আলোকে কোণের বুটিদার তোয়ালের নীচেকার ইকন থেকে একটা চক্চকে আভা ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার ওপরকার সেলফে চলেছে কর্মব্যস্ত মাছির জ্যানভ্যানানি। ঘুমিয়েই সে পড়ত। বাধা জন্মাল ভাইঝির ঘ্যানঘ্যান। তেল-না-দেওয়া গাড়ীর চাকার কচকচ আওয়াজের মত দোলনার শব্দ কানে এল। নিদ্রাতুর জড়িত কণ্ঠে বৌদি বলছে—'ঘুমো পাজী মেয়ে, একদণ্ড সোয়াস্তি পাবো না তোকে নিয়ে!' তার পরেই শুরু হল মৃদুকণ্ঠে ঘুমপাড়ানির ছড়া:

কোথায় গেল হাঁসের ঝাঁক
উলু খাগড়ার বনে।
উলু খাগড়া নেই কেন?
মেয়েরা নিয়েছে তুলে।
মেয়েদেরও পাবে না আজ
—যে যার স্বামীর ঘরে।
কজাকরাও সেই ঘরে—
পল্টনের ডাক পড়ে।

দোলনার একঘেয়ে কচ্‌কচ্‌ শব্দ শুনতে শুনতে গ্রীগরীর চোখের পাতাও ভারী হয়ে জড়িয়ে এল; মনে পড়ল—'কাল ভোরেই তো মেয়ে বউ রেখে পিয়োতর যাচ্ছে। এবার ফসল কাটবার সময়েও তো পাবো না ওকে!'

ঘোড়ার চিঁই-হি-হি-হিঁ শব্দে গ্রীগরীর ঘুম ভাঙল। আওয়াজ শুনে বুঝলে পিয়োতরের পল্টনের ঘোড়া। শিথিল আঙুল দিয়ে অলসভাবে এক এক করে বোতাম এঁটে বিছানা ছেড়ে চোখ রগড়ে সটান আস্তাবল থেকে পিয়োতরেরঘোড়াটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। উড়ো একটা মাকড়সার জাল আচমকা মুখে লেগে শুড়শুড়ি দিতেই গ্রীগরীর ঘুমের জড়তা কেটে গেল।

ঢেউ খেলান কাকজ্যোৎস্না নদী বরাবর একটি অপার্থিব পথ সৃষ্টি করেছে। মানুষের পদক্ষেপে তার স্নিগ্ধ কৌমার্য্য কোনকালেই কলুষিত হবে না। দনের বুকে জমেছে ঘন কুয়াসার কুণ্ডলী। ঊর্দ্ধে অলক্ত ঊষার বর্ণরাগ। চারিধার নিস্তব্ধ, নিঝ্‌ঝুম। সন্তর্পণে ঘোড়াটা পেছনের পা ফেলতে লাগল—জলে নামতে ইচ্ছে ছিল না মোটেই। গোপনে একটা অকারণ খুশী গ্রীগরীর মনে নাড়া দিয়ে গেল। জীবন মনে হ'ল আনন্দময় নিরঙ্কুশ। দূরে নদীতীরে হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে উঠতেই গ্রীগরী চমকে উঠল। হঠাৎ পাড়ের কাছে কাদার মধ্যে একটা কই মাছ লাফিয়ে উঠে ইতস্ততঃ চুনোপুঁটির জন্য খোঁজাখুঁজি সুরু করলে। পাড় থেকে ভিজা একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আসছে। টপ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটার মুখ থেকে। রক্তিম পুচ্ছ মেলে ঊষার অরুণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল আকাশের বুকে।

আস্তাবলের কাছে এসেই গ্রীগরী দৌড়ে মা'র কাছে গেল।

—কে গ্রীশ্‌কা?—পদশব্দে চমকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

—আর কে তবে?

—ঘোড়াটাকে জল খাইয়েছিস ?

সংক্ষেপে গ্রীগরী জানালে—হাঁ !

শুকনো কয়েকখানা ঘুঁটে নিয়ে ত্বরিত পদে মা ঘরে ঢুকলেন।

—আস্তাখক্‌দের ডেকে তোল না গিয়ে। স্তেপানও যাবে বলেছে পিয়োত্রয়ের সঙ্গে।—রান্নাঘর থেকে হেঁকে বললেন তিনি।

আস্তাখক ! বসন্তের পুলক শিহরণে এই নিরস প্রভাতও যেন মধুময় হয়ে উঠল। আস্তাখক মানে আকসিনিয়া ! সহসা কাঁটার খোঁচা খেয়ে যেন গ্রীগরীর সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ করে গ্রীগরী এক দৌড়ে আস্তাখকদের আঙিনায় হাজির হল। দরজা বন্ধ। রান্নাঘরের মেজেতে বিছান একখানা কম্বলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে স্তেপান স্ত্রীর মাথা বুকে চেপে !

সহসা একটা অশোভন কৌতূহল হলো গ্রীগরীর। উষার আবছা আলোকে উঁকি মেরে দেখলে—আকসিনিয়ার সেমিজ হাঁটুর ওপরে কুঁচকে রয়েছে ; তার-বার্চের মত সুডোল অসঙ্কোচে ছড়ান পা'দুখানি উরু অবধি গ্রীগরীর দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত। পলকহীন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রীগরী চেয়ে রইল। একটা তীব্র অস্বস্তিতে মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে উঠল ; জিভ্‌ শুকিয়ে এল। এক পা সরে এদিক ওদিক দেখে খাপছাড়া ভাবে ডাকল—এই ! এই ! কে আছো ভেতরে ? ওঠো !

ধড়মড় করে আকসিনিয়া উঠে বসল।

কে ? কে ?—ব্যস্ত ভাবে হাতড়ে সে কোনমতে টেনে-টুনে সেমিজ সামলে দিলে, বুক কাঁধ সামলাতে গিয়ে কোমরের কাছে জড়িয়ে যায়। বালিশের ওপর লালা পড়েছিল কয়েক ফোঁটা। রাত্রি শেষেই মেয়েদের ঘুম বেশ খানিকটা গভীর হয়।

—আমি ! মা ডাকতে বললেন তোমাদের।

—যাচ্ছি! মাছির উৎপাতে মেঝেতে শুয়েছিলাম। এই স্তেপান! শুনছো, ওঠ!

স্বরে বুঝা গেল আকসিনিয়া গ্রীগরীর উপস্থিতিতে বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। বিলম্ব না করে সে কেটে পড়ল।

মে মাসের ট্রেনিং ক্যাম্পে সেবার জন্য ত্রিশেক কসাক যাচ্ছে গ্রাম থেকে। সাতটা বাজতে বাজতেই ত্রিপল-ছাওয়া গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই ক'রে কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ হেঁটে এসে স্কোয়ারের কাছে জড় হ'তে লাগল।

পিয়োত্তর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চটপট একটা ছেঁড়া লাগাম সেলাই করছে, পান্তেলিমন ঘোড়াটাকে খাইয়ে ঠিকঠাক করে দিচ্ছে, এই সময় গ্রীগরী ফিরল।

—খাওয়া হলো না এখনো?—পিয়োত্তর জিজ্ঞেস করল।

—খুব খিদে পেয়েছে। পিঠের গদিটা পরীক্ষা করতে করতে বৃদ্ধ বল্লে—একটা কুচিও যদি এর মধ্যে আটকে থাকে, ত'বে একদৌড়ের পরেই পিঠে ঘা হয়ে যাবে!

—খাওয়া হ'লে আর একটু জল দিও বাবা।

—গ্রীগরী নদীতে নিয়ে যাবে 'খনি।'

উঁচু হাড় বার করা চাঁদিয়াল দনমুলুকের ঘোড়াটাকে ফটকের বাইরে এনে কাঁধের জোড়ার কাছে হাত রেখে একলাফে চড়ে বসল গ্রীগরী। ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে চললো সে দনের দিকে। ঢালু পাড়ের কাছে এসে গতি সংযত করবার জন্য গ্রীগরী বলগা টেনে ধরল। হোঁচট খেয়ে আরও বেগে ছুটল ঘোড়াটা—উড়ে চলল যেন। গ্রীগরী ঘোড়াটার পিঠের উপর এক রকম চিৎ হ'য়েই রইল।

হঠাৎ দেখে ভাঁড় নিয়ে একটি মেয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। পলকের মধ্যে ঘোড়ার মুখ ঘুরে গেল। পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত গতিতে

গ্রীগরী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পশ্চাতে উড়ো বালিতে মেঘের সৃষ্টি হ'ল।

দুলে দুলে নামছে আকসিনিয়া আস্তাখভা। খানিকটা দূর থেকেই হেঁকে বল্লে—এই বেকুব! আর একটু হলেই চাপা পড়তাম না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাকে। তোমার বাবার কাছে যদি বলে না দিই তো কি বলেছি।

—রাগ করো না সখি! কত্তা ক্যাম্পে গেলে আমাকেও খামারের কাজে লাগতে পারে!

—কি কাজ হবে তোমার মত অমন জানোয়ার দিয়ে?

—ফসল কাটবার বেলা ডাকতে হ'তে পারে।—হেসে কৌতুকী কণ্ঠে বললে গ্রীগরী।

হাওয়ায় উড়ে যায় বলে দু-পায়ে স্কার্ট চেপে আকসিনিয়া এক কলসী জল তুলল।

—তা হোলে ওরা তোমার স্তেপানকেও নিয়ে যাচ্ছে কি বলো?—গ্রীগরী জিজ্ঞেস করল।

—তোমার কি তাতে?

—চট কেন? জিজ্ঞেস করতে নেই নাকি?

—বেশ তো যাচ্ছে নিয়ে যাক্, কি হয়েছে তাতে?

—না হবে আর কি; তুমি বিরহিণী হ'লে এই যা!

—হই হলাম।—কৃত্রিম ক্রোধে আকসিনিয়া জবাব দেয়।

জল থেকে মুখ তুলে ঘোড়াটা দনের দিকে চেয়ে সামনের পা দুটো দিয়ে খপর খপর করতে লাগল। দ্বিতীয় ঘড়াটা পূর্ণ ক'রে আকসিনিয়া জোয়ালটা কাঁধে তুলে গৃহাভিমুখে চ'লল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গ্রীগরীও তার পেছন ধরল। হাওয়ায় আকসিনিয়ার স্কার্ট উড়ে যেতে চায়; চ্যাপটা বুটিদার টুপী বাঁধা কোমল এলোচুল ময়লাটে ঘাড়ের কাছে

হয়ে উঠে ক্রীড়াচঞ্চল। গোলাপী শার্ট দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে আকসিনিয়ার কাঁধ ও পিঠ ; কিন্তু সামনে ঝুঁকে ঢালু পার বেয়ে উঠবার বেলা কাঁধের কাছে শার্টের ফাঁকে বক্ষ অবারিত হয়ে পড়ছে। সন্ধানী দৃষ্টিতে আকসিনিয়ার প্রতিটি দেহভঙ্গী নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য ক'রে চলেছে গ্রীগরী। কথা বলবার জন্ত প্রাণ তার উসখুস্ করতে লাগল।

—স্তেপানকে তা হ'লে ছাড়তে হ'ল কি বলো ? নেহাৎ গায়ে পড়েই অবশেষে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল।

চলতে চলতে ঘাড় বাঁকিয়ে মুচকি একটু হাসলে আকসিনিয়া।

—বিয়ে করো বুঝবে ছাড়তে হয় কি না ! দম নিয়ে বললে।

ঘোড়াটাকে আকসিনিয়ার সামনে এনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে গ্রীগরী। বললে—কিন্তু আর সব বউয়েরা তো স্বামী চলে গেলে খুশীই হয়। বৌদি তো পিয়োতর গেলে রীতিমত মোটাই হবে।

—জোঁক না হ'লেও স্বামীরা রক্ত চুষে খায়। থেমে আবার বলে আকসিনিয়া।—তোমার বিয়েটাও ত' শীগ্‌গিরই দেখতে পাবো, কি বলো ?

—আমি কি জানি ? বাবার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে। তবে হাঁ, পল্টন থেকে ফিরে না এলে হবে মনে হয় না।

—ঐ তো বয়েস বিয়ে না হয় নাই ক'রলে।

—কেন ?

—ওতে দুঃখু ছাড়া কিচ্ছু নেই। চোখ তুলে গ্রীগরীর দিকে চেয়ে সংযত ভাবে হাসলে আকসিনিয়া। গ্রীগরী সেই প্রথম লক্ষ্য করল ওর স্ফীত ঠোঁট দুখান কত নির্লজ্জ পিপাসু। আঙুল দিয়ে ঘোড়ার কেশর খাঁচড়ে দিতে দিতে বললে,—বিয়ের ইচ্ছে আমারও নেই। যেমন আছি এই তো ভাল। এতেই তো ভালোবাসা পাই।

—কাউকে বাসতে লক্ষ্য করেছ নাকি ?

—কি করে লক্ষ্য করবো ? তুমি তো যাচ্ছো তোমার স্তেপানকে রওনা ক'রে দিতে…

—আমার দিকে নজর দিলে মুস্কিল আছে ; বোলে দেবো স্তেপানকে।

—দেখিয়ে দেবো তোমার স্তেপান…

—দেখবেন বীর পুরুষ, শেষমেষ নিজেই কেঁদে ফেলবেন না যেন।

—আমায় ভয় দেখাতে এসো না আকসিনিয়া !

—ভয় দেখাবো কেন ? সে সব মেয়ের কপাল পুড়েছে তারা তোমার কান ঝালাপালা করতে হয় করুক আমার ব'য়ে গেছে ! কিন্তু আমার দিকে নজর দেবে না ব'লে রাখছি !

—বেশী ক'রে চাইবো আজ থেকে।

—বেশ ছাখো ! চোখ ভরে ছাখো !

প্রশান্ত হাসি হেসে আকসিনিয়া ঘোড়াটা কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইচ্ছে করেই গ্রীগরী ঘোড়াটা আড় ক'রে পথ আটকে ধরল।

—পথ ছাড়ো বলছি।

—ছাড়বো না।

—স্থাকামো করো না গ্রীশ্‌কা, এখুনি যেতে হবে আমাকে।

গ্রীগরী নাছোড়। মুচকি হেসে ঘোড়াটা দিয়ে চেপে আকসিনিয়াকে পাহাড়ের গায়ে নিয়ে ফেলবার উপক্রম করল।

—আঃ! যেতে দাও বলছি, হাঁদা কোথাকার। পাশে লোক রয়েছে, দেখলে কি মনে করবে ?—অনুচ্চ ভীত কণ্ঠে বলে আকসিনিয়া। শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ভ্রূকুটি দিয়ে পশ্চাতে না চেয়েই সে চলে গেল।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিদায় নিচ্ছে পিয়োত্তর। গ্রীগরী ঘোড়া থেকে নামতেই পিয়োত্তর বল্‌গা টেনে ধরল। পথের গন্ধ শুঁকে ঘোড়াটা চঞ্চল

হ'য়ে উঠেছে। পা'দানিতে পা দিয়ে পিয়োতর বললে—ঘোড়াগুলোকে বেশী খাটাবেন না বাবা, শরৎকালে বেচে দেবো। তা ছাড়া গ্রীশ্‌কারও তো পল্টনের জন্ম চাই একটা! জমিতে খড় কেমন হবে জানেনই তো; ঘাস বেচে ফেলবেন না যেন!

—আচ্ছা সে হবে'খন। ভগবান তোমার সহায় হউন। সময় হয়েছে যাত্রা করো এখন।—ক্রশ করে বৃদ্ধ বলল।

এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেল্টের কাছে শার্টের ভাঁজগুলো ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে পিয়োতর ফটকের দিক চলল। তার চলার তালে তালে কটিবদ্ধ অসি দুলে উঠছে। তরবারির মুষ্টি থেকে সূর্যালোকে একটা শানিত রশ্মি ছিটকে পড়ছে। মেয়ে কোলে দারিয়া চলল পেছন পেছন। হাতে চোখ মুছে মা ইলিনীচনা উঠানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—'দাদা! দাদা! প্যাষ্টিস্ ফেলে গেছো। দাদা, তোমার প্যাষ্টিস্'—দৌড়ে ফটক অবধি গিয়ে ভগ্নী দুন্স্কা ডাকল। 'প্যাষ্টিস্ ফেলে গেছো!'—বলেই মেয়েটি ফটকের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে তার জ্যাকেট সিক্ত হ'য়ে গেল।

কপালে হাত রেখে দারিয়া নির্নিমেষ নয়নে, স্বামীর সাদা শার্টের পানে চেয়ে রইল। সহসা একটা উষ্ণ আর্দ্রতায় তার চোখের পাতা ভারী হ'য়ে এল।

পচা ফটকের খুঁটিখানায় ছুটো ঝাকুনি দিয়ে বৃদ্ধ পান্তেলিমন বললে—এইটে ফেলে দিয়ে ভাল একটা লাগাস গ্রীশ্‌কা! তার পর কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লে—চলে গেছে।

ওয়াট্‌ল গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গ্রীগরী চেয়ে দেখে স্তেপানও রওনা হচ্ছে। সবজে একটা পশমী স্কার্ট পরে আকসিনিয়া তার ঘোড়াটা আস্তাবল থেকে নিয়ে এল। হেসে স্তেপান কি যেন বললে। তারপর ধীরে নাটকীয় ভাবে স্ত্রীকে চুম্বন ক'রে উভয়েই কিছুক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ

হ'য়ে রইল। আকসিনিয়ার সাদা জ্যাকেটের উপর স্তেপানের রোদে-পোড়া প্রবলদিন হাতখানা কয়লার মত কালো দেখাতে লাগল। গ্রীগরীর দিকে পেছন ফিরে ছিল স্তেপান। বেড়ার এ পাশ থেকে তার কামান ঘাড় ও প্রশস্ত পেশল কাঁধ এবং স্ত্রীর পানে নীচু হ'লেই তার কটা পাকান গোঁফের উভয় প্রান্ত দেখা যাচ্ছিল। কি কথার পর আকসিনিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কালো ঘোড়টার পিঠে চড়ে স্তেপান কটকের দিকে চলল। আকসিনিয়া পদানি ধরে করুণ সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীর পানে চেয়ে হেঁটে এগুতে লাগল। রাস্তার মোড় অবধি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে গ্রীগরী এই বিদায়ের দৃশ্য দেখল।

সন্ধ্যার মুখেই প্রবল ঝড়বৃষ্টির আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে এল। আকাশ-জোড়া কালো গাঢ় মেঘ গ্রামের মাথার উপর ঝুলে শুধু সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে বিক্ষুব্ধ দন লক্ষ লক্ষ ফেনিল ঢেউ ছুড়ে তটভূমি তচনচ করে তুলল। আকাশে বিদ্যুতের স্মিত হাসি। বজ্রের গুরু গর্জ্জনে মাঝে মাঝে ধরণীর বুক কেঁপে উঠছে। ডানা মেলে একটা শকুনি মেঘের তলায় ভেসে বেড়াচ্ছে। গোটাকয়েক দাঁড় কাক ঠুকরে চীৎকার করে তাকে উদব্যস্ত ক'রে তুলল। ঠাণ্ডা লেগে মেঘগুলি দন বরাবর ওপারের ওই জলাভূমির দূর প্রান্তে আরও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সার বেঁধে দাঁড়াল। প্রান্তরে থমথমে স্তব্ধতা নেমে এসেছে; আসন্ন বিপদের মুখে ত্রাসে তার বুক দুরুদুরু কাঁপছে বুঝি। সহসা বদ্ধ খড়খড়িগুলি কেঁপে উঠল। ভগবানের নাম স্মরণ করে সত্রাসে বৃদ্ধেরা যে যার বাড়ী ফিরল। একটা বালির স্তম্ভ স্কোয়ারময় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। ধরণীর তপ্তবক্ষে ততক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণ সুরু হয়ে গেছে।

বেণী দুলিয়ে ছুটে গিয়ে দুন্যা তাড়াতাড়ি মুরগীর ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নাক ফুলিয়ে ঘোড়ার

মত শুঁকে বিপদের আঁচ করবার চেষ্টা করতে লাগল। রাস্তায় এক দঙ্গল ছেলে হুড়োহুড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে। আট বছরের মিশ্‌কা পর্য্যন্ত বাবার টুপীটা পরে মুখের আধখানা ঢেকে আনন্দে দু'হাত তুলে নেচে বেড়াচ্ছে আর বৃষ্টি তাড়াবার ছড়া বলছে;—'যারে বাদল যা'! ভগবানের মানত শোধ করতে আর যীশুকে প্রণাম করতে আজকের মত চলে যাচ্ছি আমরা।'

দুন্যা দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। হিংসে হ'ল। পায়ের তলা কেমন সুড় সুড় ক'রে উঠল। বৃষ্টির ফোঁটায় চুলটা ভিজিয়ে নিলে আরো কালো আরও কোঁকড়ান হবে। উৎসাহে তার বড় বড় চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল। সেও মিশ্‌কার হাত ধরে নেচে বেড়াবে! হঠাৎ চোখ পড়ল জানালার দিকে। মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। মৌন শাসনে মুহূর্ত মধ্যে তার উচ্ছ্বাস নিঃশেষে শুকিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াল দুন্যা। অবশেষে সমস্ত দৈন্য ঝেড়ে ফেলে এক দৌড়ে বারান্দায় উঠল। এমনি সময়ে ঠিক চালের ওপরেই কড়কড় শব্দে একটা বজ্র গর্জ্জন করে ওঠে। শব্দটা ক্রমে গড়িয়ে দনের ওপারে চলে যায়। 'মাগো', বলে আরও জোরে দৌড়ে দুন্যা ভীতা হরিণীর মত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গ্রীগরী ও পান্তেলিমন ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে ভাঁজ করা একটা টানাজাল বার করেছে। দুন্যাকে দেখেই গ্রীগরী বলল—ছুঁচ-সুতো নিয়ে আয় তো দুন্যা, তাড়াতাড়ি যা।

দারিয়া জাল সারতে বসল।

পৌত্রী কোলে বৃদ্ধা ইলিনীচনা বল্লে—বুড়ো হচ্ছে আর বুদ্ধিশুদ্ধি দিন দিন গোল্লায়-যাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়লেই হয়! রোজ বলি বেশী তেল পুড়ছে; তা যত বারণ কোরবো তবু আলো জ্বালবেই! কি মাথা মুণ্ড হচ্ছে ওখানে বসে! যাবে কোন্ চুলোয়? বাইরে যাবে

ভাবছ? মাছ ধরতে গেলে মরবে ডুবে। ভাখো, কেমন ঝাঁকুছে ঘরখানা। প্রভু যীশু রক্ষা কর। প্রভু যীশু…

মুহূর্তের জন্য এক ঝলক তীব্র নীল আলো চোখ ঝলসে দিয়ে গেল। সবাই চুপ। ঝিলমিলির ওপর টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে চড়াৎ করে অদূরেই বজ্রপাত হ'ল। ভয়ে চীৎকার করে জালের মধ্যে মুখ গুঁজল ছুন্যা। দারিয়ার বুকও শঙ্কায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে সে নীরবে দরজা-জানালাগুলো ভাল করে দেখে নিল। বৃদ্ধার 'প্রভু যীশু রক্ষা করো' অব্যাহত ভাবেই চলেছে। পায়ের কাছে কালো একটা বেড়াল ছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখে পড়তেই বৃদ্ধা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

—দূর কর্ ছুন্যা, শীগ্‌গির বালাইকে দূর কর্। হে ভগবান্, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু! হে ভগবান শান্ত হও, থামাও…!

মা'র ভাবগতি দেখে জালটা রেখে নীরবে একটু হাসলে গ্রীগরী।

—হাসছিস্ কি দাঁত বার করে। ঢের হয়েছে থাম্!—ধমকে বৃদ্ধ প্রকোফিমন বললে। নাও, তাড়াতাড়ি কাজ সারো বউমা, সেদিন বলি নি' তোমাকে জালটা সেরে রেখো।

—কি মাছ ধরবে ভাবছো? আড়ষ্ট কণ্ঠে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

—নাও বকো না, চুপ করে থাকো। ঝড়ে ভয় পেয়ে সব মাছ উঠে আসবে ওপরে। জল হয়ত এখুনি ঘোলা হয়ে গেছে। দেখে আয় তো ছুন্যা স্রোতের শব্দ শুনিস্ কিনা?

নিতান্ত অনিচ্ছাতেই ছুন্যা দরজার কাছে গেল। ইলিনীচনা থামবার পাত্রী মোটেই নয়। আবার জিজ্ঞাসা করলে—কে কে যাবে তোমার সঙ্গে জলে নামতে? দারিয়া পারবে না, ওর ঠাণ্ডা লাগবে।

—গ্রীশকা রয়েছে, আমি আছি; আর ঐ জালটার জন্য আকসিনিয়া আছে, আর একজন মেয়েকেও যা' হোক্ জুটিয়ে নেবো!

বৃদ্ধ খাবে দৌড়ে দুন্যা ঘরে ঢুকল। চোখের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা জমে' টলটল ক'রে কাঁপছে, গায়ে ভিজা মাটির ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

—খুব জোরে স্রোত চলছে বাবা—হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে।

—কোটটা পরে আকসিনিয়াকে ডেকে নিয়ে আয় গে। আবার আদেশ হ'ল।—আর শোন্, সে আসে যদি বলবি মালাশ্‌কা ক্রোলোভাকে ও ডেকে নিয়ে আসে যেন

ওদের দু-জনকে ডেকে দুন্যা তাড়াতাড়িই ফিরল। নীল স্কার্ট আর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছেঁড়া জ্যাকেট্‌টাতে আকসিনিয়াকে বেশ পাতলা ছিপছিপে দেখাচ্ছিল। দারিয়ার সঙ্গে হাসি বিনিময় ক'রে, রুমালখানা খুলে বেশ ভাল ক'রে চুলটা বেঁধে নিলে আকসিনিয়া। ফাঁকে একবার ঘাড় বাঁকিয়ে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল গ্রীগরীর পানে। মোজা বাঁধতে বাঁধতে স্থূলকায়া মালাশ্‌কা একগাল হেসে বললে—তুই মোঁজা আনিস নি আকসিনিয়া?—ঈশ্বরের দিব্যি আজকে মাছ ধরবোই।

সকলেই প্রাঙ্গণে এল। বৃষ্টি তখনও বেশ্ জোরেই পড়ছে। ঘোলাটে বৃষ্টির জল পাকিয়ে ফেনিয়ে কল্‌কল্ শব্দে মাটির খোয়ানি নিয়ে এঁকেবেঁকে দনের দিকে ছুটে চলেছে। গ্রীগরী পথ দেখিয়ে চলল আগে আগে।

—এখনও নামবার জায়গায় আসি নি গ্রীশ্‌কা?—সেই ঘুঁট ঘুঁটে আঁধারে একটু পরেই পান্তেলিমন জিজ্ঞেস করল।

—এসেছি!

—এখান থেকেই শুরু কর্‌তা হ'লে।—চীৎকার ক'রে বৃদ্ধ বললে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে নিতান্ত কাছাকাছি থেকেও কিছুই শোনা যায় না।

—বাতাসের শব্দে তোমার কথা কিছুই শুনতে পারছি না বাছু!—ভরা গলায় মালাশ্‌কা বলে।

—এখান থেকেই জলে নামতে আরম্ভ কর্—আমি বেশী জলের দিকে যাচ্ছি—বলছি—বেশী জলের দিকে—মালাশ্‌কা!—কালা নাকি তুই!—কোন্ দিকে টানছিস?—আমি—যাচ্ছি—বেশী জলের—দিকে।—গ্রীশ্‌কা—আকসিনিয়াকে পাড়ের দিকে থাক্‌তে বল্!'

বাতাসের সেঁা সেঁা আর দনের আক্রোশের গর্জন মিশে কানে তালা লেগে যাচ্ছে! বাতাসের দাপটে বাঁকা বৃষ্টি ধারা ছিড়ে ছিট্‌কে পড়ছে। পা দিয়ে জলের তলা অনুভব করে গ্রীগরী কোমর জলে নামল। অমনিই বুকের কাছে একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা তার অস্থিমজ্জা কাঁপিয়ে তুলল। ঢেউয়ের ঝাপটায় চোখ মেলবার জো নেই। অনবরত আঘাত হেনে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে। শ্বাস রোধ হবার উপক্রম। জালটা ক্রমে গভীর জলে ছড়িয়ে পড়ল। পশমী মোজা পরা ছিল গ্রীগরীর। হঠাৎ বালির ওপর পা পিছলে গেল। অমনিই টান পড়ে জালটা হাতছাড়া হয়ে গেল; কাত হ'য়ে পড়ে গিয়ে ডান পাখানা ভেসে উঠল। স্রোতের তোড় তাকে জোর করে মাঝ দরিয়ার টেনে নিয়ে চলেছে। গভীর আরও গভীর। আর রক্ষে নেই বুঝি; ডান হাতে সাঁতার কেটে প্রাণপণে সে পাড়ের কাছে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। কালো জলের অ... আবর্তে ডুবে যাবার আশঙ্কা মনে জেগে একটা অস্থির উন্মাদনা তাকে পাগল ক'রে তুলল। মরিয়া হয়ে সাঁতার কাটছে গ্রীগরী। শক্তি সব ফুরিয়ে এসেছে বুঝি; হাত-পা অসাড় বোধ হ'ল—এইবারে ডুববো! কিন্তু নীচে পা নামাতেই পা মাটিতে ঠেকল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলে গ্রীগরী। শরীর অনেক পাতলা হয়ে গেল। একটা মাছ হঠাৎ তার হাটুতে গুঁতো মেরে চলে গেল।

আর একবারও হাত থেকে ফসকে জালগাছা গভীর জলে চলে যায়; সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে আরও একবার সে অগাধ জলে ডুবে গিয়েছিল; কোন মতে সাঁতার কেটে কূলে এসেছে।

—আকসিনিয়া ঠিক আছো তো!—ডেকে জিজ্ঞেস করলে গ্রীগরী।

—কোন মতে!—উত্তর শুনল।

—বৃষ্টি কমছে না?

—হাঁ, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি কমছে বটে কিন্তু শীগ্‌গিরই জোয়ারের রকম আরম্ভ হবে মনে হচ্ছে!

—আস্তে! বাবা শুনলে রক্ষে থাকবে না!

—ওঃ! বাবার ভয়ও তো আছে দেখছি।—শ্লেষকটু কণ্ঠে বলে আকসিনিয়া। এর পর দু'জনেই নীরবে জাল টানল আরও কিছুকাল।

—গ্রীশ্‌কা, পাড়ের কাছে ঐ ডুবো গাছটার পাশে টানিগে চল।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগে আকসিনিয়ার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে ছিটকে পড়ল গ্রীগরী।—'আঁ—আঁ—আঁ'—তীরের কাছে একটা জায়গা থেকে আকসিনিয়া চীৎকার করে উঠল। ত্রস্ত ভাবে সাঁতার কেটে গ্রীগরী এগুলো সেদিকে।

—আকসিনিয়া।

কোন সাড়া নেই। শুধু বাতাসের শন্‌শন্ আর তরঙ্গের গর্জন। আবার ডাকল। আবার। ভয়ে তখন সে কাঠ হয়ে গেছে। সাড়াশব্দ না পেয়ে গ্রীগরী অন্ধকারে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগল। পায়ের তলা দিয়ে গড়িয়ে কি যাচ্ছে? খপ্ করে ধরলে গ্রীগরী।—জালগাছ! ছেড়ে দিয়ে আবার হাতড়াতে শুরু করল।

—গ্রীশ্‌কা কোথায় তুমি?—কাঁদ কাঁদ স্বরে আকসিনিয়া ডাকল।

—এত ডাকলাম সাড়া দাও নি কেন?—রেগে গ্রীগরী উত্তর করল। তারপর হাতড়ে হামাগুড়ি দিয়ে দুজনেই পাড়ে উঠল। হাঁটু

পেছে বসে গ্রীগরী জালের জট খুলতে লাগল। মেঘের আড়ম্বর তখন কমে এসেছে—গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে শুধু। নদীর ওপারে বর্ষণখিন্ন একখণ্ড মেঘের তলায় চাঁদ উঁকি মারছে। জলাভূমির ওপার থেকে ব্যাঙের ক্ষুব্ধ ঘোষ থেকে থেকে কানে আসছে। মাটি আর্দ্র বাষ্পে ভরপুর। বৃষ্টির জলে ধোওয়া আকাশ তখন পরিচ্ছন্ন নির্মল।

জাল রেখে আকসিনিয়ার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল গ্রীগরী। মুখখানা খড়ির মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেও তার রক্তিম ঈষৎ বাঁকান ঠোঁটে মধুর একটি আলতো হাসি লেগে ছিল।

—পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে ভাবলাম গেছি আর রক্ষে নেই। ভাবলাম তুমিও ডুবেছো বুঝি!

দু'জনের হাত মিললো। গ্রীগরীর শার্টের আস্তিনের মধ্যে নিজের হাতখানা ভরে দিয়ে আকসিনিয়া বললে—জমে যাবার যো হয়েছি। ওঃ, তোমার হাতটা কি গরম।

পাড় দিয়ে কে যেন দৌড়ে আসছিল। গ্রীগরীর মনে হল দুন্য়া। হেঁকে জিজ্ঞেস করল—পেয়েছিস্ সুতো?

—হাঁ পেয়েছি। তোমরা এখানে বসে আছ কেন? বাবা এখুনি যেতে বললেন ওখানে। অনেকগুলো পোনা মাছ ধরেছি আমরা; থলে ভর্তি হয়ে গেছে! দুন্য়ার কণ্ঠে বিজয়িনীর আত্মপ্রসাদ।

শীতে ঠকঠক্ ক'রে কোনমতে জালের ছেঁড়াকটা [illegible]রে নিলে আকসিনিয়া; তার পর যদি একটু গরম হওয়া যায় এই আশায় তারা দৌড়ে পান্তেলিমনের কাছে হাজির হ'ল। ভিজা হাতেই সিগ্রেট পাকাচ্ছিল পান্তেলিমন; ওদের দেখেই সোৎসাহে ব'লে উঠল—'প্রথম বারে সাতটা দ্বিতীয় বারে…।' কথাটা শেষ না ক'রেই সে পা' দিয়ে থলেটা দেখিয়ে দিলে। নীচু হ'য়ে আকসিনিয়া দেখে সত্যিই অনেকগুলো তাজা মাছ লাফাচ্ছে।

—আর একবার হাঁটু জল অবধি নেমে চেষ্টা ক'রে তারপর বাড়ী যাব। যা' গ্রীশ্‌কা! কি দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি?

নিঃশব্দে গ্রীগরী জলে নেমে গেল। আকসিনিয়া শীতে এত বেশী কাঁপছিল যে জালটা পর্য্যন্ত ঠিক ভাবে ধরে রাখতে পারছে না। জালটা শুদ্ধ কাঁপছে।

—জালটা কাঁপিয়ো না।—গ্রীগরী বলে।

—ইচ্ছে করে কচ্ছি কি? দম আটকে আস্‌ছে আমার।

—চল হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়ি। কচু হবে মাছ দিয়ে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই প্রকাণ্ড একটা কার্প জালের মধ্যে এমন গুঁতো মারল যে মনে হ'ল ছিঁড়ে গেছে বুঝি। গ্রীগরী জালটা দিয়ে মাছটাকে চেপে ধরল। পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঢেউ নেমে গেলে দেখে কার্পটা জালের মধ্যেই কাঁপছে।

—মাঠ দিয়ে যাবে?—আকসিনিয়া শুধালো।

—বনের পথই সোজা। গ্রীগরী জবাব দেয়।

ভ্রূকুঞ্চিত করে আকসিনিয়া স্কার্ট নিঙড়ে থলেটা কাঁধের ওপর ফেলে দৌড়ে চলল। জাল তুলে নিয়ে গ্রীগরীও চলল। শ' দুয়েক গজ গিয়েই আকসিনিয়া বলে বসল—আর পারছি না গ্রীশ্‌কা!

—ওই দেখ গত বছরের খড়ের গাদা আছে একটা; ইচ্ছে হ'লে ওর মধ্যে ঢুকে কিছুটা গরম হ'য়ে নিতে পারো কিন্তু!

—সে-ই ভাল। এই ভাবে বাড়ী যাবার চেষ্টা করলে পথেই সাবাড় হ'তে হবে।

গ্রীগরী গাদাটার মধ্যে একটা গর্ত করল। বহুদিন পরে নাড়াচাড়া লাগতেই তার মধ্য থেকে পচা উষ্ণ একটা গন্ধ বেরুলো।

—ভেতরে ঢোকো। এটা এক রকম স্টোভের মতই কি বলো!

থলেটা রেখে আকসিনিয়া গলা অবধি ডুবিয়ে বসে রইল গর্তের

মধ্যে। শীতার্ত গ্রীগরী ওরি পাশে গাদাটার ওপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ল। আকসিনিয়ার তিজা চুলের স্নিগ্ধ মাদক গন্ধ তার নাকে আসছে। পেছনে মাথা হেলান দিয়ে চুপ করে আছে আকসিনিয়া—খানিকটা হাঁ' করে দম নিচ্ছে।

—তোমার চুল থেকে হেনবেনের গন্ধ আসছে; চেনো সেই সাদা ফুলটা?—অনুচ্চস্বরে গ্রীগরী বললে তার দিকে ঝুঁকে। আকসিনিয়া নিরুত্তর। তার উদাস দৃষ্টি ওই ডুবন্ত অর্দ্ধচন্দ্রের পানে। পকেট থেকে হাত বার করে সহসা গ্রীগরী তার মুখখানা কাছে টেনে আনল। হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে গর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আকসিনিয়া বললে—আর থাকবো না এখানে চল।

—চুপ করো না।

—এখুনি যাবে কিনা বলো না হয় চেঁচাবো বলছি।—লাফিয়ে গাদা থেকে নামল আকসিনিয়া।

—আকসিনিয়া শোনো!

—ড্যাডী পান্তেলিমন!

—পথ হারিয়েছো নাকি?—কাছাকাছির একটা হথর্ণ গাছের ঝোঁপের ওপাশ থেকে পান্তেলিমন বললে। দাঁতে দাঁত চেপে গ্রীগরীও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—চেঁচাচ্ছো কেন? পথ হারিয়েছো নাকি?—আসতে আসতে বৃদ্ধ বললে। আকসিনিয়া গাদাটার পাশে দাঁড়িয়ে রুমালখানা ঠিক করে বাঁধছিল; তার গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

—পথ হারাইনি কিন্তু জমে প্রায় বরফ হ'য়ে গেছি।

—এই দেখ খড়ের গাদা রয়েছে একটা। এইটের মধ্যে ঢুকে গরম হয়ে নাও গে।—বৃদ্ধ বললে।

থলেটা ঝুলতে ঝুলতে আকসিনিয়া মুচকি একটু হাসলে শুধু।

—চার—

সেব্রাকভের ট্রেনিং সেণ্টার তাতারঝায়া থেকে মাইল চল্লিশেক দূর। স্তেপান ও পিয়োত্তর এক গাড়ীতেই চলেছে। সঙ্গে আছে গ্রামের আরও জনা তিনেক—কেবোৎ বদভ্‌স্‌কভ্‌, খৃস্তোনিয়া তোকিন আর গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন্‌।

খাওয়া দাওয়ার জন্য গাড়ী থামিয়ে স্তেপান ও খৃস্তোনিয়ার ঘোড়া দুটোকে গাড়ীতে জুড়ে বাকী ক'টাকে পেছনে বেঁধে নেওয়া হল। গাড়ী চালাবার ভার পড়ল খৃস্তোনিয়ার পর। তোকিন যেমন জোয়ান তেমনি মস্তিষ্কে উনপঞ্চাশ পবনের প্রভাবও যথেষ্ট। আতামান রেজিমেণ্টের প্রায় সবাই তো ঐ এক ধাঁচের। গাড়ীর সামনে খৃস্তোনিয়া এমন ভাবে ঝুঁকে বস্‌লে যে ভেতরে একটুকু আলো প্রবেশ করবার জো রইল না। পিয়োত্তর স্তেপান আর তোমিলিন ত্রিপলের তলায় শুয়ে সিগ্রেট ফুঁক্‌ছে। বদভ্‌স্কভ্‌ হেঁটে চলেছে গাড়ীর পেছন পেছন।

পথ দেখিয়ে খৃস্তোনিয়ার গাড়ীটাই আগে চলল। পশ্চাতে আরও সাত কি আটখানা সারি বেঁধে চলেছে। হাঁকডাক হাসি-ঠাট্টা গান ঘোড়ার নাসিকা-ধ্বনি এবং শূন্য পা'দানির ঝুনঝুন্‌ শব্দে পথ মুখরিত।

বিস্কুটের ব্যাগটা মাথার তলায় দিয়ে পিয়োত্তর গোঁফে তা দিচ্ছিল শুয়ে; সহসা ডাকল—স্তেপান!

—উঃ!

—গান গাইবি একটা!

—বড্ড গরম ভাই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—কিন্তু কাছাকাছি সরাই কোথায় পাচ্ছো?

—বেশ ধর! কিন্তু তুই যে ছাই একেবারেই কিছু না! হাঁ তোদের গ্রীশকাটা চমৎকার—সুর তো না যেন চাঁদির সুতো!

চিৎ হ'য়ে স্তেপান গলাটা বেশ ক'রে দু-একবার ঝেড়ে নিল; তার পর আস্তে সুস্তে গান ধরল:

'অরুণ আলোর ছোপ লেগেছে
পূব আকাশের গায়।'

প্রথম কলি শেষ হ'তে না হ'তেই তোমিলিন্ গালে হাত দিয়ে ধুয়া ধরল। পিয়োত্তর চেয়ে দেখে সঙ্গীতের কসরতে তার কপালের দুই পাশের নীল শিরাগুলো বেশ গোনা যাচ্ছে। শুয়ে ছিল স্তেপান, পাশ ফিরে দ্বিতীয় কলি ধরল:

'জলের তরে গাঁয়ের মেয়ে
গাঙের ঘাটে যায়।'

—খ্রিস্তোনিয়া ধর না!—স্তেপান আদেশ করে।

'কজাক ছেলে ঘোড়ায় চড়ে
পেছন পেছন ধায়।'

হেসে পিয়োত্তরের দিকে মুখ ঘুরাতেই সেও সুরু ক'রে দিল। বাকী রইল খ্রিস্তোনিয়া; কিন্তু পিয়োত্তরের কণ্ঠস্বরে তার সংযম বুঝি টুটে যায়। সহসা বিকট সঙ্গীতে ত্রিপল শুদ্ধ কেঁপে উঠল:

'এক নিমেষে ধরলো তারে
দূরও বেশী নয়!'

স্তেপান চোখ বুজে আপন মনে গেয়ে চলেছে—ঝঙ্কারে পথ মুখরিত:

শুধোয় তারে—গাঁয়ের মেয়ে!
একটু সরো
গাঙের জলে ঘোড়াটাকে
জল খাওয়াতে দাও।"

সঙ্গীত ক্রমে পিছনের গাড়ীতে সংক্রমিত হ'তে লাগল—সবাই গাইছে তখন। সেই নিরালা পথে চাকার অবিরাম কচমচ শব্দ, ঘোড়ার নাসিকা ধ্বনি, সঙ্গীত, সব মিলে এক পাঁচমিশালী কলরোল সৃষ্টি হল। ভয় পেয়ে একটি সাদা পাখী উড়ে গর্তের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওদের পানে চেয়ে রইল। সহসা এক লাফে স্তেপান গাড়ীর মধ্যে উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ত্রিপলটা ধরে অপর হাতে বেতালা তাল দিয়ে সে গেয়ে চলেছে। পেছন থেকে কেদোৎ বদভ্ স্ককভ তখন শিষ দিতে সুরু করল। গাড়ী থেকে মুখ বার করে পিয়োত্তর টুপি নেড়ে তাকে বাহবা দিল। খৃস্তোনিয়ার ধৈর্যচ্যুতির পক্ষে এ সব যথেষ্টর অনেক বেশী। চুলোয় যাক্ গাড়ী! আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ঘুরেফিরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে কসাক নাচ নাচতে শুরু করে দিলে।

সেদিনকার মত একটা মাটির ঢিবির পাশেই তারা রাত কাটায়। পশ্চিমের জমাটবাঁধা মেঘের ডানা থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। ঢিবির মাথার উইলোগুলি ধাক্কা খেয়ে মাথা নুইয়ে বাতাসের পথ করে দিচ্ছে। বদ্ধ পুষ্করিণীর চিকচিকে বক্ষে বিদ্যুতের পৈশাচিক উল্লাস ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। পৃথিবীর বুকে বাতাস বৃষ্টির ফোঁটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বক্‌সিস্ দিচ্ছে যেন।

পুষ্করিণী থেকে জল খাইয়ে দড়ি বেঁধে ঘোড়াগুলোকে প্রান্তরে চরতে দিয়ে জনা তিনেক রইল পাহারায়। বাকী আর সবাই আলো জ্বেলে গাড়ীর চালে ঝুলিয়ে রাখল।

খৃস্তোনিয়া জোয়ার রান্না কচ্ছিল। কসাকরা সবাই ঘিরে বসেছে তাকে। চামচে দিয়ে হাঁড়ি ঘুটতে ঘুটতে একটা গল্প শোনালে খৃস্তোনিয়া।

—ঢিবিটা হাঁ—এইটের মত উঁচু ছিল। বারাকে বললাম আতমানকে না বলে খুঁড়লে বাধা মেবে না।

—এরি মধ্যে গুন আরম্ভ হয়ে গেছে।—খোড়ার কাছ থেকে আসতে আসতে স্তেপান বললে।

—বাবা আর আমি কি করে যখের ধন খুঁজতে গেছলাম তার গল্প শোনাচ্ছি এদের। ওই মেরকুলক টিবি গো। বাবা বললেন—"চল খুস্তোনিয়া, মেরকুলক টিবিটা খুঁড়ি গে চল?" তিনি নাকি তাঁর বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন ওখানে যখের ধন রয়েছে। বাবা মানত করলেন—"এই ধন আমায় মিলিয়ে দাও ঈশ্বর; তোমায় আমি ভাল ক'রে গীর্জা তৈরী ক'রে দেবো।" রওনা হলাম। জমিটা সরকারী। আতমান ইচ্ছে করলেই বাধা দিতে পারতেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে পৌছুলাম। অন্ধকার না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হ'ল। তার পর একেবারে টিবির মাথা থেকেই শাবল দিয়ে খুঁড়তে লেগে গেলাম। বহু কষ্টে হাত চারেক এক গর্ত কাটলাম। মাটি তো না যেন পাথর। আমি ঐটুকু খুঁড়তেই ঘেমেচুমে অস্থির। বাবা প্রার্থনা করছিলেন দূরে বসে। বড্ড খিদে পেয়েছিল ভাই! গরমের কালে খাদ্য যা আমাদের তা ত' জানোই—সেই ঘোল আর কভাশ্; তাই-ই চালালাম। বাবা বললেন—"তুই একেবারেই নাস্তিক খুস্তোনিয়া! আমি এখানে বসে প্রার্থনা করছি আর তুই না খেয়ে পারলি না। ওঠ গর্ত থেকে! ওঠ বলছি, না হয় শাবল দিয়ে মাথা দু'ভাগ ক'রে দেবো। তোর এই অনাচারের জন্যই যখের ধন আরও মাটির তলায় বসে যাবে!" কি আর করি, বাইরে চুপ ক'রে বসে রইলাম। খিদের জ্বালায় পেট চোঁ-চোঁ করছে। বাবার গায়ে অসম্ভব জোর ছিল। একাই খুঁড়ে খুঁড়ে তিনি একটা পাথর বার ক'রে আমায় ডাকলেন। দৌড়ে গিয়ে চাড় দিয়ে পাথরখানা তুলে ফেল্লাম। বিশ্বেস করবি না ভাই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পাথর খানার তলায় দেখি কি…চক্ চক্……… চক্ চক্…

—মিথ্যে কথা বলবিনি খুস্তোনিয়া! গোঁফে তা দিয়ে পিয়োত্তর বললে হেসে।

—কি মিথ্যে কথা? হুঁ!—বলেই খুস্তোনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখের পানে চেয়ে তাদের ভাবগতিকটা ভাল করে দেখে নিল।

—গোল্লায় যাবে যে মিথ্যে কথা বলে। দিব্যি করে ব'লছি চক্‌ চক্‌ করছিল। ভাল ক'রে চেয়ে দেখি কয়লা! তা প্রায় বুসেল চল্লিশেক হবে। বাবা বললেন—"নীচে নেমে খোঁড় খুস্তোনিয়া।" কি আর করি রাত ভর খুঁড়লাম। ভোর বেলা হ'তেই দেখি যার ভয় করেছিলাম সে এসে হাজির!

—কে?—তোমিলিন জিজ্ঞেস্‌ করল।

—আর কে? আতামান! দু'জনকেই ধরে টান্‌তে টান্‌তে গ্রামে নিয়ে গেল। এই গত বছরের আগের বছর কামেনস্কায়ার আদালতে ডাক পড়ল। কি হবে তা' বুঝেই হয়ত বাবা পটল তুলে সরে পড়লেন। আমরা লিখে জানালাম তিনি বেঁচে নেই…

জোয়ারের হাঁড়িটা নাবিয়ে খুস্তোনিয়া চামচে আন্‌বার জন্ত গাড়ীতে গেল। ফিরে আস্‌তেই স্তেপান জিজ্ঞেস্‌ করল—গীর্জা তুলে দেবে বললে যে তোর বাবা মানত করেছিলেন তার কি হোলো?

—আস্ত একটি গাধা তুমি তাই জিজ্ঞেস করলে। কয়লা দিয়ে কি তৈরী করবেন?

—মানত যখন করেছিলেন শোধ করা উচিত ছিল।

—কয়লা তো আর চুক্তির মধ্যে ছিল না? হাঁ, যথের ধন যদি পাওয়া যেত তো…

হাসির রোলে আগুনের শিখাটা কেঁপে উঠল। হাড়ি থেকে মুখ তুলে খুস্তোনিয়া বিমূঢ় ভাবে চাইল সবাইর পানে। কেন হাস্‌ছে না বুঝে সেও হেসে উঠল। কিন্তু তার বিকট হাসির রোলে সকলের হাসিই তলিয়ে গেল।

—পাঁচ—

দনের ওপারে দুব্রোভ্‌কা গ্রামে আকসিনিয়ার বাপের বাড়ী। বছর সতের বয়সের সময় স্তেপান্ ওকে বিয়ে ক'রে নিয়ে আসে।

বিয়ের বছর খানেক পূর্ব্বে গ্রাম থেকে মাইলপাঁচেক দূরে আকসিনিয়া যখন জমি চাষ করছিল ওর বাবা, বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে—রাত্রে সেই নির্জ্জন প্রান্তরে হাত বেঁধে কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে।

—যদি কারও কাছে বলবি তো খুন করে ফেলবো। না বলিস্ তো লাল জ্যাকেট জুতো কিনে দেবো। মনে থাকে যেন খুন করবো যদি…

কিন্তু আকসিনিয়া সেই রাত্রেই ছেঁড়া সায়া নিয়ে দৌড়ে একাকিনী গ্রামে আসে। মা'র পায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে সে সব কিছুই বলে দিল। ক্রোধান্ধ দাদা ও মা তখন ওকে সঙ্গে করে প্রান্তরের দিকে ছুটলেন। এই পাঁচ মাইল পথ ঘোড়া দুটোকে প্রাণান্ত ক'রে ছুটতে হয়েছে। গিয়ে দেখে নেশায় অজ্ঞান হয়ে বাবা ওভারকোটটার ওপর শুয়ে আছে। পাশে শূন্য একটা ভোদকার বোতল। আকসিনিয়ার চোখের সামনেই দাদা গাড়ী থেকে একটা ডাণ্ডা তুলে নিল। পরিণতি বুঝে সে গাড়ীর তলায় লুকাল। পা ধরে দু-একটা হেঁচকা টান মারতেই বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দু-একটা কাটা কাটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পুত্র পিতার নাকসোজা মাথার উপর কষে ডাণ্ডা মারল। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মাতাপুত্রে অবিশ্রাম প্রহার চালাল। ক্রোধান্ধ জীর্ণ দুর্ব্বল স্ত্রী অজ্ঞান স্বামীর চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল—পুত্র চালাল লাথি কিল ঘুষি। লজ্জায় অপমানে আকসিনিয়া অবনত মস্তকে নির্বাক হ'য়ে বসে রইল। ভোর হবার পূর্বেই মাতাপুত্রে মিলে বৃদ্ধকে ধরাধরি

ক'রে বাড়ী নিয়ে আসে। কান দিয়ে অবিশ্রাম রক্ত ঝরছে ; সারাদিন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কাটাল বৃদ্ধ। তার মিনতি-করুণ দৃষ্টি দিনভর আকসিনিয়াকে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু লজ্জায় সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখেই তার মৃত্যু হয়। পড়শীরা জানল গাড়ী থেকে পড়ে মরেছে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ঘটকের আনা-গোনা সুরু হ'ল। বলিষ্ঠ হোঁত্‌কা সুগঠিত স্তেপান ভাবী বধূকে দেখে পছন্দ ক'রে গেল। ঠিক হ'ল আসছে শরৎকালেই বিয়ে হবে।

কুয়াসাচ্ছন্ন এক শিরশিরে ঠাণ্ডা দিনে আকসিনিয়া আস্তাখভ পরিবারের নবীন গৃহিণীপদে বহাল হ'ল। উৎসবের ঠিক্ পরের দিন ভোরেই শাশুড়ী তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। নববধূ এই রোগক্লিষ্টা বিশীর্ণা বৃদ্ধার পানে বিহ্বলদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রান্নাঘরে গিয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া ক'রে বৃদ্ধা বললেন—দেখ বউ ঘুমিয়ে কাটাতে কি সোহাগ করতে তোমাকে আনি নি। যাও গরুকটাকে দুইয়ে কিছু খাবার তৈরী করো গে। আমি বুড়ো হয়েছি কাজকর্ম করতে পারি এমন সাধ্যি নেই ; ঘরের সব কিছু দেখেশুনে তোমাকেই করতে হবে।

কিন্তু নববধূর ভাগ্যে এ ছাড়া আরও নূতন ধরণের আদর জুটেছিল। ঐ দিনই স্তেপান তাকে গোলাবাড়ীতে নিয়ে অকারণে নিদারুণ প্রহার লাগাল। প্রহারের চিহ্ন যাতে অপরের চোখে না পড়ে সেদিকে বেশ সতর্ক দৃষ্টি রেখেই স্তেপান মারল। নববধূর পেটে পিঠে বা বুকে মারলে তার দাগ কে আর দেখবে ? কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না। অতঃপর আকসিনিয়াকে সে নিতান্ত অবহেলার চোখেই দেখতে লাগল। রাত তার কাটত ছিনাল বিরহিণীদের সঙ্গে। আর আকসিনিয়া প্রথম প্রথম রইতো কয়েদীর মত তালাচাবিবদ্ধ ঘরে।

বছর দেড়েক ছেলেপিলে হ'ল না বলে আকসিনিয়ার দুর্গতির সীমা ছিল না। দেড় বছর কেটে গেলে স্তেপান কতকটা ধাতস্থ হ'ল। তবু রাত তার প্রায়ই ঘরে কাটতো না। আদরেও কার্পণ্যের অন্ত ছিল না। আকসিনিয়া সব কিছু নীরবে সয়ে গেছে।

স্তেপান ছিল বেহদ্দ কুঁড়ে। তাস খেলে গল্প ক'রে তামাক খেয়েই তার সময় কাটত। গোয়ালভর্তি গাই'র তদারক শুদ্ধ কার্যের সব কিছুই করতে হ'ত আকসিনিয়াকে। শাশুড়ীর সাহায্য যতোটুকু বা পেত তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। একটু কিছু করেই বৃদ্ধা হাঁপাতে হাঁপাতে চোখমুখ খাড়া ক'রে বিছানায় ছটফট্ করতেন। স্ত্রীরোগ তাকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে দিয়েছিল। কাজ ফেলে আকসিনিয়া আড়ালে দাঁড়িয়ে এই রোগ-জীর্ণা বৃদ্ধার পানে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত।

যেদিন সকালে আকসিনিয়ার প্রসব বেদনা হ'ল সেইদিনই দুপুরবেলা —কি ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক হবে, সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই শাশুড়ী সংসার থেকে বিদায় নিলেন। ধাত্রী দৌড়ে মাতাল স্তেপানকে শোবার ঘরে ঢুকতে নিষেধ করতে গিয়েই দেখে আস্তাবলের দরজায় বৃদ্ধা মরে পড়ে আছেন। সন্তান জন্মগ্রহণ করবার পর আকসিনিয়া স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু প্রাণে অনুরাগের সাড়া পেত' না। শুধু নারী-সুলভ তিক্ত করুণা এবং গতানুগতিকতার প্রভাবেই সে মুখ রক্ষা করে যাচ্ছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সন্তানটি মারা যায়। আবার শুরু হ'ল সেই পুরানো জীবন।

গ্রীগরী মেলেখফের আনাগোনায় প্রথম দিন থেকেই আকসিনিয়া প্রাণে এক নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করল। টের পেল তরুণ যুবকটির প্রতি তার দুর্নিবার অনুরক্তি। বুলডগের মত একাগ্র দৃঢ়তা নিয়ে গ্রীগরী আঁকড়ে থাকতে চায়। স্তেপানকে সে ভয় করে না। তার কথা বলে ওকে নিবৃত্ত করা দুষ্কর। আকসিনিয়া প্রমাদ গণল। প্রাণপণে সে

নিজের মন সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তবু একটা অজ্ঞাত উড়ো আকর্ষণে যেন তার দৃঢ়তা নানচাল হয়ে যায়। আপনা থেকেই যেন সাজসজ্জা ও প্রসাধনে লক্ষ্য করবার মত পরিপাটি এসে যায়। ছল-ছুতোয় নিজেকে ঠার দেবার জন্ম মন আকুপাকু করে। নানা অছিলায় গ্রীগরীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে ইচ্ছে হয়। গ্রীগরীর কালো চোখের মৌন আবেদনে অশোভন পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভোরবেলা উঠে গাই দোহাতে গিয়ে সহসা অজ্ঞাত খুসীতে মন ভরে ওঠে। মনে হয়—'আজ দিন ভালই যাবে। কিন্তু কেন ?—ও গ্রীগরী। গ্রীশ্‌কা !' আপন মনের গোপন আলেখ্য দেখে নিজেই সে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কল্পনায় সে খুঁড়িয়ে চলেছে। যেন মার্চ্চের ভাঙা ভাঙা আল্‌গা বরফের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে দন পার হচ্ছে।

স্তেপানকে রওনা ক'রে দিয়ে গ্রীগরীকে যথাসম্ভব এড়িয়েই চলবে ঠিক করেছিল। মাছধরার ঘটনার পর এ প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হ'ল।

ত্রিনিতি পর্বের দিন দুয়েক আগে প্রান্তরের বিলি-ব্যবস্থা হল। বণ্টনকালে পান্তেলিমনও উপস্থিত ছিল।

নৈশ ভোজনের সময়ে বৃদ্ধ যখন বাড়ী ফিরল মেজাজ বেশ গরম। ঘরে ঢুকেই বুটজোড়া খুলে দূর ক'রে ফেলে দিল। তার পর মাটিতে পা ঠুকে বললে—আমাদের ভাগ পড়েছে রেড্‌ক্লিফের (লাল পাহাড়) কাছে ; ওপরের দিকটা বনে গিয়ে ঠেকেছে। এখানে ওখানে ঝোঁপ, সারা জায়গায় ঘাস ভর্তি।

—আবাদ কবে আরম্ভ করবে ভাবছো ? গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করে।

—ছুটির পর।

সশব্দে উনুনের দরজা খুলে বৃদ্ধা বাঁধাকপির ঝোল নিয়ে এল।

অনেকক্ষণ বসে খেলে পারতেলিবন। খেতে বসে সারাক্ষণ মুখে ঐ এককথা—আতামানের উদ্দেশে বৎপরোনাস্তি কটুক্তি। পাজীটা শুধু আমাকে নয় সব কজাকদের ঠকিয়েছে।

—পাজা ক'রে ঘাস শুকোবে কে বাবা; আমি একলা তো পারবো না।—ভীরু দৃষ্টিতে পিতার দিকে চেয়ে দুন্তা জিজ্ঞাসা করে।

—আকসিনিয়াকে ডেকে নিবি। স্তেপান বলে গেছে তার জমিও আমাদেরই চাষ আবাদ করতে হবে।

দিন দুয়েক পরে হঠাৎ ভোরবেলায় মিচ্‌কা ঘোড়ায় চড়ে মেলেখফ্‌দের আঙিনায় হাজির হল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘনকুয়াসার আস্তরণ ঝুলছে গ্রামের মাথায়। ঘোড়ার পিঠে বসেই সামান্য হেলে ফটক খুলে মিচ্‌কা ভেতরে প্রবেশ করল। এই বদমেজাজী ঝগড়াটে ছেলেটাকে ইলিনীচ্‌না একটু নেকনজরেই দেখতেন। ঘোড়ার খুড়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে মিচ্‌কাকে প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেখে বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলে—এই কি চাস্‌?

বারান্দার পাশে ঘোড়াটা বাঁধতে বাঁধতে মিচ্‌কা জবাব দিল—আপনার কি চাই? আমি চাই গ্রীশ্‌কাকে; কোথায় সে?

—ঘুমোচ্ছে চালার মধ্যে। তোর কি হয়েছে রে যে সব সময়ে ঘোড়ায় চড়িস্‌? কেন পায়ে হেঁটে চলার শক্তি নেই না কি?

—আর সব সময়েই আপনার এক কথা।—বিরক্ত হ'য়ে মিচ্‌কা বলে। তার পর পালিশকরা চকচকে বুটের উপর চাবুকটা দিয়ে পটাং পটাং শব্দ করতে করতে সে গ্রীশ্‌কার খোঁজে গেল। গাড়ীর মধ্যে ঘুমোচ্ছে সে। বাঁ চোখটা তাক করবার ভঙ্গীতে কুঞ্চিত ক'রে গ্রীগরীর মাথায় গোটা কয়েক চড় মেরে বললে মিচ্‌কা—এই ছোটলোক ওঠ্‌।

'ছোটলোক'ই মিচ্‌কার মুখে সব চেয়ে বড় গালাগাল।

শ্রীগরী একলাফে উঠে বসল—কেন এসেছিস রে!

গাড়ীর পাশে বসে একটা লাঠি দিয়ে জুতার শুকনো মাটি ফেলতে ফেলতে অভিমানী কণ্ঠে মিচ্‌কা বললে—আমায় অপমান করেছে গ্রীশ্‌কা!

—কে?

—ছাখ্‌ সেই…বেশ দু-চারটে গালাগাল দিলে মিচ্‌কা…।

—বলে কি জানিস? বলে সে ট্রুপ কমাণ্ডার!—দাঁতে দাঁত চেপে সরোষে বলে মিচ্‌কা। পা দুখানা রাগে কাঁপছিল।

গ্রীগরী উঠে ঠিক-ঠাক হ'য়ে বলল,—কমাণ্ডার তো হয়েছে কি?

গ্রীগরীর হাতখানা ধরে সানুনয়ে বললে মিচ্‌কা—তোর ঘোড়াটার জিন লাগিয়ে তাড়াতাড়ি একটু মাঠে চল গ্রীশ্‌কা! দেখিয়ে দেবো কেমন কমাণ্ডার! আমি বললাম—'আসুন হুজুর দেখা যাবে।' সে বললে—'নিয়ে এসো তোমার যত সব বন্ধুবান্ধব আছে; সবাইকে হারিয়ে দেবো।' বলে, আমার ঘুড়ীটার মা পেতরবুর্গে হার্ডল রেসে পুরস্কার পেয়েছে; তা আমার বড় বয়ে গেছে। তার ঘুড়ী বা তার মায়ের কথায় আমার কি কাজ? মোটকথা আমি কিছুতেই আমার ঘোড়াকে হারাতে দেবো না।

গ্রীগরী তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিল। রাগে গড়্‌গড় করে মিচ্‌কা তাকে তাড়া দিচ্ছিল।

—লোকটা মোখফদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। নামটা কি যেন—দাঁড়া—কি যেন বললে—হ্যাঁ, লিস্তনিৎস্‌কি হবে হয়ত। বেশ দোহারা জোয়ান চেহারা। গম্ভীর প্রকৃতির মুখ। চোখে পিনস্‌-নে চশমাও আছে। থাক না বয়ে গেছে আমার। চশমা থাকলেইত' আর দৌড়ে জেতা যায় না। আমার ঘোড়াকে ধরতেই দেবো না।

হেসে গ্রীগরী তার বুড়ী ঘুড়ীটায় জিন লাগাল। বাবা পাছে দেখে

ফেলে এই ভয়ে তারা কাঁতা কলের কটক দিয়ে প্রান্তরে নামল। মাঠের টিবির ওপর উঠে দেখে শুকনো একটা আশ গাছের পাশে অপেক্ষা করছে ওরা। অফিসার পিত্তনিতস্কি বলিষ্ঠ সুগঠিত একটা ঘুড়ীর পিঠে; আর তাকে ঘিরে আছে জিন্‌বিহীন ঘোড়ায় গ্রামের ছ-সাতটি ছেলে।

চশমা জোড়া ঠিক্ ক'রে অফিসার মিচ্‌কাকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথেকে দৌড় আরম্ভ করবে?

—এই আশগাছ থেকে জারহুদ পর্যন্ত।

—জারহুদ এখান থেকে কতদূর হবে?—চোখ কুঞ্চিত ক'রে জারহুদ নিরীক্ষণ করার ভঙ্গীতে অফিসার বললে।

—ঐ তো ওই বনের কাছে।

সকলেই সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। মাথার ওপর চাবুকটা তুলে পিত্তনিতস্কি বললে—আমি তিন বললেই সব ছুটবে। রেডী, এক—দুই—তিন।

পিত্তনিতস্কিই সর্ব্ব প্রথম দৌড় দিল। সামনে ঝুঁকে এক হাঁতে টুপীটা চেপে ধরে দৌড়াচ্ছে সে। মুহূর্তের জন্ম সে-ই অগ্রগামী রইল। অপমান ও হতাশায় মিচ্‌কার মুখ পাংশুটে হ'য়ে উঠল। গ্রীগরী ভাবলে ঘোড়াটাকে কষে চাবুক লাগাতে মিচ্‌কা অসম্ভব বিলম্ব করছে।

পাল্লা বেশী নয়। জারহুদ গাছটা থেকে মাইল দুয়েক হবে। আধা-আধি পথেই মিচ্‌কার ঘোড়া অফিসারকে ধরে ফেলল। এর পর দুজনেই কিছুকাল পাশাপাশি দৌড়াতে লাগল। সামান্ত উনিশ-বিশ মাত্র। গ্রীগরী প্রথম থেকেই সকলের পশ্চাতে ছিল। জয়ের আশা ছেড়ে আস্তে চলে সে অশ্ব সওয়ারদের দৌড় লক্ষ্য করতে লাগল। জারহুদের কাছাকাছি একটা বালির টিলার মত ছিল। যুগ-যুগান্তর ধরে ধুয়ে ধুয়ে তা একেবারেই নীচু হ'য়ে গেছে; এখন একটা ঢিবিতে পর্য্যবসিত—উটের পিঠের কুঁজের মত।

ঢিবিটার ওপর অনেক আগাছা গজিয়েছে। ঐীগরী চেয়ে দেখে ঢিবির উপর উঠে মিচ্‌কা ও লিগুনিতস্‌কি তীর বেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকী আর সবাই পড়ে রইল পশ্চাতে।

হ্রদের কাছে পৌছে দেখে ঘোড়াগুলি লিগুনিতস্‌কির চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। সংযত পুলকে মিচ্‌কার দেহ রোমাঞ্চিত—প্রত্যেকটি ভাব-ভঙ্গীতে বিজয়ীর উল্লাস। যা ভেবেছিল অফিসারের ভাবটা মোটেই তেমন নয়। এতটুকু মনমরা সে হয় নি। সিগ্রেট মুখে গাছে হেলান দিয়ে তার শ্রান্ত ঘুড়ীটাকে দেখিয়ে (মুখে ফেনা উঠে গেছে) লিগুনিতস্‌কি বললে—এর আগে প্রায় এক-শ মাইল ছুটেছে। এই তো কাল স্টেশন থেকে এলাম; যদি ক্লান্ত না হ'ত তা হলে আমাকে তুমি ছুঁতেই পারতে না কোরগুনক্‌।

ভদ্রতার খাতিরে মিচ্‌কাও জবাব দিলে—হবে হয়ত।

আর সবাইকে ফেলে মিচ্‌কা এবং ঐীগরী পাহাড় ঘুরে বাড়ী চলল। নিতান্ত লৌকিকতার খাতিরেই লিগুনিতস্‌কি সংক্ষেপে টুপীতে দুটি আঙুল ঠেকিয়ে তাদের বিদায় অভিনন্দন জানাল। তার পর সেও চলে গেল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে ঐীগরী দেখল আকসিনিয়া তার দিকেই আসছে। চলতে চলতে সে হাতের পল্লবটার পাতা ছিঁড়ছিল। ঐীগরীর দিকে চোখ পড়তেই আরও মাথা নীচু ক'রে সে চলতে লাগল। নাক সোজা ঘুড়ী ছুটিয়ে ঐীগরী একরকম আকসিনিয়ার ঘাড়ের উপর পড়বার উপক্রম করল। কিন্তু সহসা সেই শান্ত ঘুড়ীটার পাছায় চাবুক মারতেই পেছনের পা দু'টো বসবার ভঙ্গিতে ভেঙে সে আকসিনিয়ার গায়ে খানিকটা কাদা ছিটিয়ে দিলে।

—এঃ, জানোয়ারের কাণ্ড দেখ।

বোঁ করে ঘুরে উত্তেজিত ঘুড়ীটা নিয়ে আকসিনিয়ার পাশে এসে বললে—দিনের বেলা এসে ছুটো কথা বললে কি হয়?

—তুমি তারও যোগ্য নও।

—অত বোকা বলেই তো কান্না ছিটিয়ে দিলাম।

বুড়ীটার মুখের সামনে হাত ঘুরিয়ে আকসিনিয়া বললে—খুব হয়েছে এখন যেতে দাও। কিসের জন্ত তুমি গায়ের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাবে?

—ঘোড়া নয় বুড়ী।

—যাই হোক না কেন আমার বয়ে গেছে। যেতে দাও বলছি।

—চটছো কেন আকসিনিয়া? মাঠের···সে জন্ত রাগ করেছ?

স্থির দৃষ্টিতে চাইলো গ্রীগরী আকসিনিয়ার পানে। সে কি বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সহসা এক ফোঁটা অশ্রু তার কালো চোখের কোণে টলমল ক'রে উঠল। রুদ্ধ কান্নার আবেগে ঠোঁট দুখানি কাঁপতে লাগল। আবেগরুদ্ধ কম্পিত স্বরে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সে বললে—তুমি যাও গ্রীশ্কা; আমি রাগ করিনি···আমি···। কথা সমাপ্ত হবার পূর্বেই সে ছুটে পালাল। বিমূঢ় গ্রীগরী কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। পরে মিচ্কার সঙ্গে ফটকে দেখা হ'তেই সে জিজ্ঞেস করল—সন্ধ্যাবেলা বেরুবি?

—না।

—কেন কি হোলো? রাত্রিযাপনের আমন্ত্রণ ক'রে গেল নাকি?

কোনও জবাব না দিয়ে গ্রীগরী কপাল রগ্ড়ে মুছলে শুধু।

ত্রিনিতির উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে। গ্রামের কাছে উৎসবের স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছিল মেজেতে ছড়ান শুকনো পাতার গুঁড়া, বিশুষ্ক টাইম লতা আর ফটক ও সিঁড়িতে বাঁধা শুষ্কপ্রায় কোঁচকানো ওক এবং অ্যাশ-পল্লবরাজি।

উৎসবের অব্যবহিত পরেই চাষ আবাদ আরম্ভ হ'য়ে গেল। ভোর থেকে মেয়েদের ছুটির দিনে পরবার চটকদার স্কার্ট রঙ বেরঙের রুমাল

আর বুটিদার এপ্রণের বর্ণচ্ছটায় প্রান্তর বিচিত্র রূপ ধারণ করল। গ্রামশুদ্ধ সবাই এসেছে ঘাস কাটতে—মনে হয় কোন বার্ষিক উৎসবে মেতেছে। বহুকাল ধরেই এমনি ধারা চলে আসছে। বন থেকে সেই সুদূর অলডার ঝোঁপ পর্যন্ত মেঠোজমিতে এক নতুন জীবনের সাড়া জেগে উঠল। মেলেখফরা কিছুটা বিলম্বেই কাজে নামল। তারা যখন রওনা হ'ল গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক তখন মাঠে পৌঁছে গেছে। ঘাস কাটতে কাটতে ঘর্মাক্ত পড়শীরা অনুযোগ ক'রে বললে—ঘুম থেকে উঠতে সত্যিই তোমাদের বেশ বেলা হয় পান্তেলিমন প্রকোফিয়েভিচ।

—দোষ আমার মোটেই নয়; মেয়েরাই পারে না।—কাঁচা চামড়ার চাবুকটা দিয়ে ষাঁড় দু'টাকে তাড়া ক'রে হেসে পান্তেলিমন উত্তর দিলে।

মুখে রোদ লাগে বলে ঘোমটা টেনে আকসিনিয়া গাড়ীর পেছনে বসে ছিল। গ্রীগরী ছিল তার ঠিক সামনেই। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে নির্নিমেষ নয়নে সে গ্রীশ্‌কার পানে চেয়ে ছিল। দারিয়া পা ঝুলিয়ে বসে আধ-ঘুমন্ত সন্তানটিকে মাই দিচ্ছে। পরনে তার বাহারে পোষাকটা। দুন্যা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে হেঁটেই চলেছে। তার পুলক-চঞ্চল দৃষ্টি থেকে প্রান্তরের কর্মরত নরনারী কেউই এড়াতে পারছে না। হাতের মুঠোয় জামার হাতাটা টেনে পান্তেলিমন কপালের ঘাম মুছে নিলে। সামনে ঝুঁকে বসতেই ছাটিন সার্টটার পেছনে কয়েকটা ভিজা দাগ পড়ল। পাতলা মেঘের অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রে রৌদ্ররশ্মি তির্য্যকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাম প্রান্তর এবং সুদূর বনের পাড়ের শুভ্র শৈলশীর্ষ তারই বাঁকান রশ্মির দোলাটে আভায় উদ্ভাসিত। অসহ্য গুমট। নিষ্প্রাণস বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড মেঘ এত ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে যে পান্তেলিমনের গাড়ীটানা ষাঁড় দুটোও যেন তাদের

চাইতে দ্রুত চলছে বলে মনে হয়। পান্তেলিমন চাবুক তুলে মারতে গিয়ে ষাঁড় দুটোর আহসার পিঠের দিকে চেয়ে সহসা থেমে গেল। উদ্যত চাবুক পিঠে পড়েও পড়ল না বুঝে ষাঁড় দুটোর মধ্যে তাড়াতাড়ি চলবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তেমনি মন্থর গতিতে যথাপূর্ব্বং চলল। একটা কালচে-সোণালী ডাঁশ তাদের ওপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

—ঐ আমাদের জমি। চাবুকটা দিয়ে দেখিয়ে পান্তেলিমন বললে। গ্রীগরী শ্রান্ত ষাঁড় দুটো গাড়ী থেকে খুলতেই জমির সীমানার খোঁটাটা যথাস্থানে আছে কি না, বৃদ্ধ তাই পরখ করতে গেল। নামতে গিয়ে তার কানের অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ডল দুটি চক্‌চক্ ক'রে উঠল।

—নিড়াবার কাস্তেটা নিয়ে আয়। দূর থেকে হাত নেড়ে বৃদ্ধ হাঁকল। গ্রীগরী কাস্তেটা নিয়ে ঘাস ভেঙে এল। পেছনে রেখে এল দলিত ঘাসের ডগায় তার পদক্ষেপের একটি তরঙ্গায়িত পথরেখা। কাস্তেটা হাতে তুলে সুদূরের ওই গীর্জার গম্বুজের পানে চেয়ে বৃদ্ধ ক্রশ ক'রে নিল। তার বঁড়শীর মত নাক সহসা উজ্জল হ'য়ে উঠল। মনে হয় এখুনি বার্নিশ করা হয়েছে। গালের টোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হ'তে লাগল। হাসতেই তার ঘন-কৃষ্ণ গোঁফদাড়ির অন্তরাল থেকে চকচকে দাঁতগুলি বেড়িয়ে পড়ল। ডান দিকে ঘাড় হেলিয়ে এক টান মারতেই হাত চারেক কাটা-ঘাসের একটা অর্দ্ধবৃত্ত তার পায়ের কাছে পড়ে রইল।

গ্রীগরীও নীচু হ'য়ে বাবার পেছন পেছন নিড়াতে লাগল। তার আনত দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েদের স্কার্টের একটি প্রসারিত রামধনু ভেসে উঠল। কিন্তু চোখ একান্তভাবেই বাঁধা পড়ল শাদা বুটিদার স্কার্টটির কাছে। একবার আকসিনিয়ার পানে চায় আবার বাবার সঙ্গে তাল রেখে কাটতে শুরু করে। বাবা এগিয়ে গেছে দেখেই তাড়াতাড়ি সে

কেটে এগিয়ে যায়। আজ আকলিনিয়ার কথাই শুধু শ্রীপতীর মনে জাগছে। অর্ধনিমীলিত চোখে কল্পনায় সে নির্লজ্জভাবে তাকে চুম্বন করছে আর যৌনদরদী ভাষায় যা মনে আসছে তাই বলে আদর করছে। কোত্থেকে এই সোহাগের ভাষা যোগাচ্ছে শ্রীপতী বুঝে উঠতে পারছে না; কিন্তু কাজ এবং কল্পনায় সঙ্গতি নেই বলে কল্পনার গতি পরিবর্তন ক'রে আবার ঘাস কাটতে হয়। এক-দুই-তিন। স্মৃতিতে অতীতের বিচ্ছিন্ন কথা জড়িয়ে আসে…'ভিজা খড়ের গাদার ওপর বসে আছি…মুক্ত প্রান্তরে চাঁদের নির্মল হাসি…মৃদুমন্দ পবনে ঝোঁপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে…এক… দুই …তিন। চমৎকার! আঃ, কি আনন্দ।' সহসা হাসির শব্দে চমকে পশ্চাতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দারিয়া গাড়ীর তলায় শুয়ে আছে। আকলিনিয়া তার ওপর ঝুঁকে কি বলছে। হাত নেড়ে দারিয়া কি দেখালে তার পর দুজনেই আবার একসঙ্গে হেসে উঠল। 'ঐ ঝোঁপটার কাছে গিয়েই কাস্তে রেখে দেবো।' ঠিক সেই সময়েই টের পেল তার কাস্তে-খানা নরম একটা কিসের মধ্য দিয়ে সহজেই চলে এল। নীচু হ'য়ে চেয়ে দেখে বুনো হাঁসের একটা ছানা ডাকতে ডাকতে পাশের ঘাসের মধ্যে আত্মগোপন করল। গর্তের পাশে বাসাটার ওপর দ্বিতীয়টা দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে পড়ে আছে। মৃত শাবকটিকে তুলে সে হাতের ওপর রাখল—সামান্য দিন কয়েক পূর্বেই ডিম ফুটে বেরিয়েছে। পেটের তলা তখনও উষ্ণ। কেমন একটা মায়া হ'ল। স্থির দৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডটির দিকে চেয়ে রইল।

—তোর হাতে ওটা কিরে গ্রীশ্‌কা? কাটা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে এসে কৌতূহলী দুস্তা জিজ্ঞেস করল। বিরক্তভাবে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মৃত শাবকটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীপতী আবার ঘাস কাটতে শুরু করল।

দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েরা ঘাস গাঁদা করতে আরম্ভ করবে। আধ-শুকনো কাটা ঘাস থেকে একটা ধাঁঝালো মুলো গন্ধ বেরিয়েছে। তাড়াতাড়ি সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। খাবার খুবই সংক্ষিপ্ত। খাংস, কলাকন্দের স্ট্যাণ্ডবি আর ঘোল। ভোজনান্তে পান্তেলিমন বললে—বাড়ী গিয়ে লাভ নেই। ষাঁড় কটাকে বনে চরতে দিয়ে আয়। কালকে শিশির শুকোলে নিড়ান শেষ ক'রে বাড়ী যাবো।

সন্ধ্যার মুখেই সেদিনকার মত কাজ শেষ হ'ল। শেষ সারির ঘাসগুলো গাদা ক'রে গাড়ীতে ফিরে এসে আকসিনিয়া জোয়ার সিদ্ধ করবার জোগাড় করতে লাগল। সারাদিন গ্রীগরীর পানে চেয়ে সে ছিনাল হাসি হেসেছে। দৃষ্টিতে ছিল একটা সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব। গ্রীগরী মুখভার করে ষাঁড় কটাকে নদীতে জল খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেল। পান্তেলিমন দুজনের ভাবগতিই লক্ষ্য করেছে। বিরক্তভাবে গ্রীগরীর পানে চেয়ে বললে—খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে ষাঁড়গুলো পাহারা দিবি; দেখিস্ ঘাসের মধ্যে যেন না নামে। আমার কোটটা গায়ে দিয়ে যাস্।

শিশুটিকে গাড়ীর তলায় শুইয়ে রেখে দারিয়া দুস্থাকে সঙ্গে ক'রে বনে জ্বালানি কাঠ আনতে গেল। বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ বনের অন্তরালে লুকিয়েছে। প্রান্তরের বিশাল বক্ষে আঁধারের অবগুণ্ঠন। অসংখ্য পতঙ্গ আগুনের আশে পাশে উড়ে উড়ে পড়ছে। মনে হয় প্রথম শীত সমাগমে গুড়ি গুড়ি তুষার পাত হচ্ছে। হাড়িতে জোয়ার সিদ্ধ হচ্ছে। স্কার্টের আঁচলে একখানা চামচে মুছে গ্রীগরীকে ডেকে দারিয়া বললে—খেয়ে যাও এসে! অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গ্রীগরী আগুনের পাশে এলো। বাবার কোটটা তার কাঁধে।

—অমন চটে আছো কেন বলো তো?—হেসে দারিয়া জিজ্ঞাসা

করল। বাবার সঙ্গে আলাপ জমাবার আশায় উত্তরটা জুড়াই দিলে—'ষাঁড় রাখতে যেতে ইচ্ছে করেছে না ওর।' কিন্তু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। গ্রীগরী হঁ-হাঁ করলে না। ঢোকঢুক চুমুক দিয়ে সেই আধসিদ্ধ জোয়ার পায়েসিন্নন চিবিয়েই খেয়ে ফেলল। আকসিনিয়া খাবার সময় মাথাই তুললে না। কেবল মাঝে মাঝে দারিয়ার ঠাট্টায় দাঁত বার করে হেসেছে। উত্তপ্ত গাল দু'খানি চাপা হাসিতে মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে পড়েছে। খাওয়া শেষে গ্রীগরীই সবাইর আগে উঠে বনের দিকে গেল।

আগুন নিবু-নিবু হ'য়ে এসেছে। ধূমায়িত ঝোঁপের গোড়া-পাতার মদির গন্ধ তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। দুপুর রাতে গ্রীগরী চোরের মত সন্তর্পণে তাঁবুর কাছে এসে দশ-বার পা' দূরে থমকে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে বাবার নিশ্চিন্ত নাসিকাগর্জন শোনা যাচ্ছে। অতৃপ্ত জলন্ত অঙ্গার ভস্মের অবগুণ্ঠন থেকে যেন ময়ূরের মত রক্ত চক্ষু মেলে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

সহসা আপাদমস্তক ঢাকা একটি আবছা ছায়া গাড়ীর দিক থেকে এসে তার দু'তিন পা' দূরে দাঁড়াল। আকসিনিয়া! গ্রীগরীর বুকের মধ্যে ধরাস্ ধরাস্ করতে আরম্ভ করল'। দ্বিধাজড়িত পদে এগিয়ে, কোটটা পেছনে সরিয়ে গ্রীগরী সেই মিলনোন্মুখ অভিসারিকাকে বুকের মধ্যে টেনে আনল। থর থর করে কাঁপছে আকসিনিয়ার উত্তপ্ত দেহ। দাঁত ঠক ঠক করছে। একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে সে হাঁটু ভেঙে নীচু হবার চেষ্টা করল। কিন্তু বুভুক্ষু নেকড়ে যেমন মৃত শিকার পিঠে ফেলে ছুটে পালায় গ্রীগরীও তেমনি তার নমনীয় দেহ পাঁজা কোলে তুলে মুহূর্ত মধ্যে সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। ওভারকোটটায় পা আটকে হোঁচট খাচ্ছে তবু প্রাণপণে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে গ্রীগরী।

—উঃ! শ্রীশ্‌কা তোমার বাবা···শ্রীশ্‌কা!

—চুপ!

ভেড়ার পশমের কোটে নাক চাপা পড়ে আকসিনিয়ার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। শ্বাস নেবার জন্ম ঠেলেঠুলে কোন মতে মুখ উঁচু ক'রে খেয়ালের সুনিশ্চিত পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করে একরকম চীৎকার করেই বল্লে—ছাড়ো···ছেড়ে দাও বলছি···নামাও—এখন আর কি—যা' হবার হ'য়ে গেছে···নিজেই আমি যাবো এখন।

সীমন্তিনীদের প্রেম অন্তঃশীলা। সর্পিল। রক্তরঙীন কুসুমের মত কোন কালেই তা ফোটে না। প্রকাশ তার তার পথপ্রান্তে প্রস্ফুটিত হেনবেনের মত,—বর্ণবাহুল্যের লেশমাত্র নেই, আছে শুধু সৌরভ।

নিড়ানের দিনের পর থেকে আকসিনিয়ার যেন রূপান্তর হ'য়ে গেছে। দেখলেই মনে হয় কে যেন ওর ওপর একটা কলঙ্ক চিহ্ন রেখে গেছে। মুখে একটা ছাপ এঁকে দিয়েছে। দেখা হ'লে মেয়েরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; পেছন থেকে বলে বুঝেছি। অ-সীমন্তিনীরা মরত' হিংসায়। কিন্তু আকসিনিয়া নির্লিপ্ত। এত কেলেঙ্কারী কিন্তু সে গ্রাহ্যই করে না। গর্বোন্নত মস্তকে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে—মুখে একটা নির্লজ্জ সন্তুষ্টির ভাব।

দিন কয়েকের মধ্যে তাদের এই সম্পর্কের কথা পাড়াময় কানাকানি হয়ে রটে গেল। প্রথমে অনেকে কথাটা বিশেষ আমল দেয় নি। কিন্তু রাখালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিজের চোখে দেখে এসেছে সে—চাঁদিনী রাতে উইও মিলের ছোট ছোট সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে দু'জনে শুয়ে ছিল ওরা। প্লাবনের ঘোলা স্রোতের মত সংবাদটি গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল। পান্তেলিমনের কানেও কথাটা না গেছে এমন নয়। এক রবিবারে সে মোখভের দোকানে গেল। এত ভীড় যে দরজা দিয়ে ঢুকবার জো নেই। তাকে দেখে সবাই যেন পথ ক'রে দিল। পোষাক-বিভাগের দিকে যেতেই কর্তা মোখভ্ নিজেই

এগিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এতকাল কোথায় ছিলে প্রকোফিয়েভিচ; দেখি কি যে বড়ো!'

—বহুত কাজ; ফার্ম নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত আছি!

—বলো কি হে অমন ছেলেরা সব থাকতে ফার্মে গণ্ডগোল!

—কোন্ ছেলের কথা বলছো? পিয়োতর তো গেছে পল্টনে। আমি আর গ্রীশ্কাই তো সব করছি।

আঙুল দিয়ে খোচা খোচা লালচে দাড়ি দুভাগ ক'রে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে মোখফ কশ্লাকদের পানে।

—হাঁ তা বটে! কিন্তু এটা কেমন কথা হলো বলো তো! আমাদের কাকেও এ সম্বন্ধে কিছু জানালে না!—মোখফ জিজ্ঞেস করল।

—কোন সম্বন্ধে?

—আকাশ থেকে পড়লে যে হে! ছেলের বিয়ে দিচ্ছো আর আমরা কেউ কিছু জানলাম না!

—কোন ছেলের কথা বোলছো?

—কেন তোমার গ্রীগরীর বিয়ে তো এখনও হয় নি।

—ওঃ! তা সে এখন বিয়ে করবার মত ভাবগতিক কিছু দেখায়নি তো!

—এই যে শুনলাম স্তেপান আস্তাখভের আকসিনিয়া নাকি তোমার পুত্রবধূ হচ্ছে!

—তার মানে? স্তেপান বেঁচে থাকতে? না প্রাকোফোভিচ, তুমি ঠাট্টা করছ। তাই না?—শেষের দিকে পান্তেলিমনের স্বরটা কিছু কেঁপে গেল।

—ওরা সব বলে তাই জিজ্ঞেস করলাম সত্যি কি না!

পান্তেলিমনের মনে হ'ল সবাই তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কাউন্টারে বিছান জামাটা ঠিক ভাবে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে

সে সোজা সদরের দিকে খুঁড়িয়ে চলল। কোথাও থামলে না পথে। সটান বাড়ী। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে। কিন্তু ক্রোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু যেন বেশী খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে হাতের আঙুল ক'টা মুঠোয় চেপে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। আন্তাথকদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার বেলা ওয়াটল গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আকসিনিয়া একটা শূন্য বালতি হাতে বারান্দায় উঠছে। কটিদেশের উপরিভাগ দুলিয়ে চলেছে সে। সর্বাঙ্গে বেশ একটি ফিটফাট পরিপাটি ভাব—তরুণী বলেই ভ্রম হয়। 'এই, দাঁড়াও'—ফটক ঠেলে ঢুকল পান্তেলিমন! আকসিনিয়া অপেক্ষা করতে লাগল। দুজনেই ঘরে ঢুকলো। ঝরঝরে মাটির মেজের এখানে ওখানে লালচে বালিকণা ছড়িয়ে রয়েছে। কোনের বেঞ্চিটার উপর সন্তভাজা পিঠে। রান্নাঘরের দিক থেকে আঁপেল আর গোবাকের গন্ধ আসছে।

মস্ত বড় একটা পোষা বিড়াল পান্তেলিমনের পায়ের সঙ্গে খেলা করবার জন্য এগিয়ে এল। পিঠ বাঁকা ক'রে সে বৃদ্ধের বুটের সঙ্গে গা ঘস্‌তে লাগল। পা দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠল—কি সব শুনলাম? অ্যাঁ! সেদিন স্বামী চলে গেছে আর আজই তুমিই অন্যের দিকে নজর দিতে আরম্ভ করেছ? গ্রীশ্‌কাকে মেরে আমি হাড় ভেঙে দেবো। স্তেপানকেও লিখে দিচ্ছি। সে শুনুক তোমার কীর্তি। বদমাইস মেয়ে কোথাকার। ছেলেবেলা মায়ের মার খেয়ে সোজা হওনি বুঝি! ফের তুমি আমার বাড়ীর চতুঃসীমানা মাড়াবে তো পা ভেঙে দেবো বোলে রাখছি। একটা বয়সের ছেলের সঙ্গে উনি ইয়ে কচ্ছেন! আর স্তেপান কি আমি যখন আসি…

নীরবে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে আকসিনিয়া সবই শুনল। লজ্জায় মাথা থেকে শালটা খুলিয়ে বিড়বিড় করতে করতে সে দাঁতে দাঁত চেপে সোজা বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে এলো।

—তুমি কে হে বুড়ো ? আমায় শাসন করবার তুমি কে ? যাও ঘরে ঐ মুটকী বুড়ী আছে তাকে শেখাও গে। নিজের ঘর সাম্‌লাও আগে !—খোড়া জানোয়ার কোথাকার ! বেরোও এখান থেকে—বেরোও ! মুখ দিয়ে ফেনা বার ক'রে বুনো ভালুকের মত আমার কাছে দাঁত খিচুতে হবে না ! ওতে ভয় পাবার মেয়ে আমি নই ! বুঝলে !

—আচ্ছা দেখ্‌বো !

বৃদ্ধের হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আকসিনিয়া বললে—যাও দেখবার কিছু নেই। যে পথে এসেছো সেই পথে খসে পড়। যদি গ্রীশ্‌কাকে আমি চাই তার মাথা খাবো ! হাড়মাস্ চিবিয়ে খেয়ে তবে ছাড়বো। গ্রীশ্‌কা যদি ভালবাসে আমাকে তাতে কি হয়েছে ? শাসন করবে তাকে ? স্তেপানের কাছে আমার কথা বলে দেবে ? আতামানের কাছে নালিশ করো না দেখি কি বয়ে যায় ! কিন্তু গ্রীশ্‌কা আমার আমার আমার। আমি তাকে পেয়েছি ; আর ছাড়বো না।

আকসিনিয়া বুক দিয়ে পান্তেলিমনকে এমনি ভাবে ঠেলে ধরেছিল যে ফাঁস-আটা পাখীর মত তার বুকের দপ্‌ দপ্‌ পাতলা সেমিজটার ওপর দিয়ে বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছিল। পান্তেলিমন যথেষ্ট বিব্রত বোধ করতে লাগল। মেয়েটার কালো চোখের বহ্নি-শিখা, তার সঙ্কোচহীন নির্লজ্জতা বৃদ্ধকে অভিভূত ক'রে ফেলল। ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে পিছু হটে বৃদ্ধ দোরের দিকে গেল। তারপর কোনমতে লাঠিটা হাতড়ে তুলে নিয়ে একটা কবাট খুলে নীরবে বেরিয়ে পড়ল। আকসিনিয়া ছুটে তার পেছন-পেছন বারান্দায় গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত চীৎকার ক'রে বললে—আমরণ তাকে আমি ভালবাসবো। ইচ্ছে হয় তাকে খুন করে ফেলো ; তবু গ্রীশ্‌কা আমার। সে আমার ! উত্তেজনায় তখন সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

অবসন্নের মত বৃদ্ধ বাড়ীতে ঢুকল। প্রথমেই রান্নাঘরে গ্রীপসীর

মরে দেখা। কোন কথাবার্তা না বলে সপাং করে কষালে তার পিঠে এক ঘা। আচমকা বাড়ি খেয়ে লাফিয়ে উঠে গ্রীগরী বাপের হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নেবার জন্ত টানাটানি করতে লাগল।

—একি মারছ কেন ?

—তোমার গুণের জন্ত। বজ্জাত ছেলে কোথাকার! এক'শ দিন ব'লেছি পড়শীর সঙ্গে কেলেঙ্কারী করিস নি—বাপমা'র নাম খোয়াবি না। মেয়েদের পেছনে ছুটবি' না…তা…'

পান্তেলিমন ক্রোধে গোঁ গোঁ করতে লাগল। লাঠি টেনে এনে যতই সে গ্রীশকাকে প্রহার করবার চেষ্টা করে কিছুতেই সে ছাড়ে না!

—না কিছুতেই মারতে দেবো না তোমাকে।—কর্কশকণ্ঠে চীৎকার ক'রে গ্রাগরী বললে। বাবার হাত কামড়ে সে লাঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে এলো। দুহাতে ধরে হাঁটু দিয়ে চাপ দিতেই মট্ করে শব্দ হল।

—আমি তোকে লোকের সামনে চাবকাব! হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা! তোকে গ্রামের একটা—একটা অজ বোকা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। তোকে আমি খোজা ক'রে দেবো।—ক্রোধে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে বৃদ্ধ।

পিতাপুত্রের ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে বৃদ্ধা ইলিনীচ্না দৌড়ে এসে বললে—পান্তেলিমন, থামো! কি হয়েছে, থামো! বৃদ্ধ তখন সত্যিই ক্রোধান্ধ। স্ত্রীকে ধাক্কা মারতেই সে সরে দাঁড়াল। তারপর টেবিলের ওপরকার সেলাইয়ের কল ইত্যাদি সব উল্টে ফেলে বৃদ্ধ বিজয়ীর মত দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। টানাটানিতে গ্রীগরীর শার্টটা কাঁধের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে সেটা খুলে ফেলতে যাবে ঠিক্ সেই মুহূর্তেই ঝড়ো মেঘের মত বৃদ্ধ আবার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে গ্রীগরীর পিঠের পানে চেয়ে সরোষে বললে—এই বেজাত ছেলেকে আমি বিয়ে দোবোই? কালই

খাবো মেয়ে দেখতে ! মুখের ওপর ছেলে চোখ রাঙাবে আর তাই সয়ে আমায় বাঁচতে হবে।

—শার্টটা খুলে নি তারপর বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

—আমি তোর বিয়ে দেবোই দেবো ! গ্রামের একটা অকাট মূর্খ মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো!—সশব্দে দরজার কপাট বন্ধ হ'য়ে গেল। বৃদ্ধের পদশব্দ সিঁড়িতে ক্ষীণতর হ'তে হ'তে অবশেষে মিলিয়ে গেল।

—ছয়—

সেব্রাকক্ গ্রামের প্রান্তে প্রান্তরের বুকে ত্রিপল-ছাওয়া গাড়ীগুলি সার বেঁধে সাজান। প্রান্তরে অসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি খেতবর্ণের শহর গড়ে তোলা হ'ল। চতুর্দ্দিকে সটান সোজা পথ। কেন্দ্রস্থলের তোরণের চারি পাশে শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে।

ট্রেনিং ক্যাম্পের স্বাভাবিক নিয়ম-মাফিক জীবন যাত্রা নিতান্তই একঘেয়ে। ভোরবেলা পাহারারত কজাকদল মাঠ থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে আসে; তার পর ধোয়ান, ব্রুস করা, জিন লাগান, নাম ডাকা, প্যারেড ইত্যাদি। ক্যাম্পের স্টাফ্-কমাণ্ডার কর্কশকণ্ঠে চেঁচামেচি ক'রে বেড়ায়। সামরিক কর্মচারীরা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। সার্জেন্টরা তরুণ কজাকদের শিক্ষা দেবার জন্যে হেঁকে অর্ডার দেয়। আক্রমণোদ্দেশ্যে তাদের পাহাড়ের ওপাশে জড়ো করা হয়। সুকৌশলে এগিয়ে এসে তারা শত্রুকে ঘিরে ফেলে। এর পর চলে চাঁদমারি। তরুণ কজাকরা অসিখেলায় পরস্পরকে

হারবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। পাকা খেলোয়াড়েরা সেই অবসরে ঝিমিয়ে ক্লান্তি দূর করে।

ক্যাম্প শেষ হবার হপ্তাখানেক পূর্বে ইভান তোমিলিনের স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সঙ্গে ছিল কিছু খাবার আর গ্রামের মুখরোচক দুই-চারিটি সংবাদ। প্রত্যুষেই সে আবার চলে গেল। কজাকরা তার মারফতে যে যার প্রিয়জন কি আত্মীয়দের সম্ভাষণ কিংবা নির্দ্দেশ পাঠিয়ে দিলে।

একমাত্র স্তেপানের কোন সংবাদই সে নিয়ে যেতে পারল না। আগের দিন সে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। রোগমুক্তির জন্য ভোদ্‌কার ঔষধের মাত্রাটা এমনই বেশী হ'ল যে, পর দিন তোমিলিনের স্ত্রী তো দূরের কথা বিশ্ব-দুনিয়ার সব কিছুই তার চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্যারেডের সময়ও সে এল না। স্তেপানের অনুরোধে ডাক্তারের সহকারী রক্ত বার ক'রে ফেলবার জন্য তার বুকে ডজনখানেক জোঁক লাগিয়ে দিলে। গাড়ীর চাকায় ঠেস দিয়ে বসে অবাক দৃষ্টিতে সে দেখছিলো শোণিত-পিপাসু জলোকাগুলি কেমন করে গাঢ় রক্ত চুষে ফুলে উঠ্‌ছে। তোমিলিন এসে সসঙ্কোচে ডাকল। স্তেপান ঘাড় ফেরাতেই বললে—একটা কথা আছে।

—বল।

—আমার স্ত্রী এসেছিল এখানে। আজ ভোরেই চলে গেছে।

—বলিস্ কি? তার পর!

—তোর স্ত্রীকে নিয়ে গাঁয়ে অনেক কথাই উঠ্‌ছে ভাই।

—বটে।

—মোটেই সুখবর নয়!

—হুঁ! তার পর।

—সে নাকি গ্রীগরী মেলেখফকে নিয়ে নিতান্ত প্রকাশ্যভাবেই…

চট্ করে স্তেপানের মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হ'য়ে গেল। জোঁক কটাকে ছিঁড়ে এক এক করে মাড়িয়ে পিষে ফেলে সে নীরবে শার্টের বোতাম আঁটকে দিলে। কিন্তু অমনিই আবার সসব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি বোতাম খুলে ফেলল। নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ওষ্ঠদ্বয় অবিরত কাঁপছে। ম্লান একটু রূঢ় হাসি ঠোঁটের প্রান্তে মিলিয়ে গেল। অবশেষে কুঞ্চিত অধর দাঁতে চেপে সে ভাবলেশহীন জড়ের মত বসে রইল। তোমিলিন ভাবলে স্তেপান শক্ত একটা কিছু চিবোচ্ছে। ক্রমে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। মাথা থেকে টুপীটা খুলে ধীরে স্তেপান বললে—ধন্যবাদ তোমিলিন। খবরটা জানালি সে জন্য ধন্যবাদ।

—আমি শুধু তোমাকে সতর্ক ক'রে দিলাম।

স্তেপানকে একটু তোয়াজ করবার জন্য তার উরুতে দু-একটা চাপড় মেরে আবার বললে—কিছু মনে করিস্ না ভাই।

তোমিলিন চলে গেলেও স্তেপান ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে কালদাগ-লাগা টুপীটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অর্দ্ধমৃত একটা জলৌকা সন্তর্পণে আবার তার বুট বেয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

•

দিন দশেকের মধ্যেই কসাকরা গ্রামে ফিরবে। প্রণয়ের বেপরোয়া আতিশয্যে আকসিনিয়া দিশেহারা। পিতার শাসানি সত্ত্বেও প্রতি রাত্রেই গ্রীগরী লুকিয়ে আকসিনিয়ার কাছে আসে; ভোরবেলা সবাই দেখে ঘরে শোওয়া। হপ্তা দুয়েক এমনি ক'রেই চলল। নিজের ওপর সাধ্যাতীত বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে গ্রীগরী। বিনিদ্র রাত্রি যাপনে মুখে একটা বিশুষ্ক পাংশুটে ভাব। কোটরাগত চোখে ক্লান্তির ম্লানিমা। আকসিনিয়া বেপরোয়া। মাথা খাড়া ক'রেই সে ঘুরে বেড়ায়। তার চোখের তলার কালোদাগ নির্বাপিত

তিতারির মতই বীভৎস। শুধু উন্মুখ ওষ্ঠাধরে সঙ্কোচমুক্ত প্রগল্ভ হাসিরেখা।

ওদের এ সম্পর্কটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এমনি সঙ্কোচমুক্ত দ্বিধাহীন ভাব, প্রণয়ের এমনি উলঙ্গ-প্রকাশ লোকের চোখে বেহায়াপনা বলেই মনে হ'ত। এক অনির্বাণ নির্লজ্জ বহ্নিশিখায় তারা পুড়ে খাক্ হচ্ছে। কোন বিবেকের দংশন নেই, গোপন রাখা তো দূরের কথা লুকোবার চেষ্টা পর্য্যন্ত নেই! রাস্তায় দেখা হলে পড়শীরা এখন ওদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। গ্রীগরীর বন্ধুমহলে পূর্ব্বে আকসিনিয়া সম্পর্কে ঠাট্টা-তামাসা চললেও আজকে তারা ওকে দেখলে বিব্রত বোধ করে কিম্বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করে। মেয়েরা মনে মনে আকসিনিয়াকে হিংসে করলেও তার নিন্দায় পঞ্চমুখ। কুৎসিত কৌতূহল নিয়ে তারা স্তেপানের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। গ্রীগরী যদি এ যোগাযোগের কথা গোপন রাখত কিম্বা আকসিনিয়া ব্যাপারটা লুকিয়ে যাবার চেষ্টা করত তা হ'লে সমাজের চোখে এর মধ্যে কোন কিছুই বিসদৃশ মনে হ'ত না। দু'চার দিন মধু-গুঞ্জনের পর সবাই ভুলে যেতে পারত। কিন্তু এরা চলেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। বিবাদ সেইখানেই। সাময়িক বিলাসের সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য নেই। সম্পর্ক এদের আরও দৃঢ়তর সূত্রে আবদ্ধ। কুৎসিত আগ্রহ নিয়ে পড়শীরা ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে লাগল। স্তেপান আসুক তাহ'লেই বাঁধন ছিঁড়বে।

আস্তাখভদের বিছানার উপরে শাদা-কালো ফুলোর-বীজ জড়ান একগাছা দড়ি টাঙান ছিল। মশা-মাছি তার উপরেই রাত্রি যাপন করে। আকসিনিয়ার নগ্ন বাহুর উপর মাথা রেখে গ্রীগরা স্থির দৃষ্টিতে দড়িটার দিকে চেয়ে আছে। আকসিনিয়া অপর হাতে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আঙুল থেকে গরম দুধের গন্ধ আসে। সুখ

ঘুমিয়ে গ্রীগরী বখন আকসিনিয়ার বগলে মুখ চেপে ধরে মেয়েদের ঘামের একটা মিঠে গন্ধে তার নাক ভরে যায়। বার্ণিশ করা খাটখানা ছাড়া ঘরে একটা সিন্দুক আছে দরজার পাশে—তার মধ্যে আকসিনিয়া সযত্নে বিবাহের যৌতুক পরিচ্ছদ গহনা ভরে রেখেছে। কোণে আছে টেবিল একটা, খানছুয়েক চেয়ার আর তৈলচিত্র একখানা। ছবিতে একটা পতাকার পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে জেনারেল স্কোবলিক যাচ্ছে। পাশের দেয়ালে অনেকগুলি ফটো; তার মধ্যে একখানা পল্টনের সঙ্গীসহ স্তেপানের: উসকুখুসকু মাথা, প্রশস্ত বক্ষে ঘড়ির চেন ঝুলান, কোষমুক্ত তরবারি হাতে একদল কসাকের ছবি। একটা আকৃশীতে স্তেপানের উর্দ্দিটা ঝুলছে। জানালার পথে চাঁদের খানিকটা ম্লান আলো উকি মেরে আঙুল দিয়ে উর্দ্দিটার কাঁধের উপরের সাদা ষ্ট্রাপ্ দুটো দেখিয়ে দিচ্ছে যেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকসিনিয়া গ্রীগরীর ভ্রূযুগলের মধ্যে চুমু খেয়ে ডাকল—গ্রীশকা!

—বলো।

—আর মাত্র ন'দিন বাকী।

—কম কি?

—আমি কি করবো গ্রীশ্কা?

—আমি কি বুঝি বল?

দীর্ঘশ্বাস চেপে নীরবে আকসিনিয়া গ্রীগরীর জট পাকান চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক পরে আবার বললে—স্তেপান আমাকে খুন করবে।

গ্রীগরী নিরুত্তর। ঘুমে তার চোখ ভেঙে আসছে। নিদ্রালস চোখে চেয়ে দেখে আকসিনিয়া তার সুনীল আয়ত চোখ দুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে।

—আমার স্বামী এলে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? ভয় পাবে?

—আমি কেন তাকে ভয় করতে যাব? তুমি তার স্ত্রী, ভয় করতে হয় তুমিই করবে।

—যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি এতটুকু ডরাই না। কিন্তু দিনের বেলা একলা বসে যখন মনে পড়ে আমার সত্যিই ভয় করে গ্রীশ্‌কা!

—স্তেপানের আসাতে কিছুই এসে যায় না; কিন্তু বাবা যে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন!—হেসে গ্রীগরী বলে; আবার কি বলতে যেতেই টের পেল তার মাথার তলায় আকসিনিয়ার হাতখানা অবশ হ'য়ে বালিশের উপর নেতিয়ে পড়ে সহসা আবার দৃঢ় হ'য়ে উঠল।

—কার সঙ্গে কথা বলছেন?

—পাকাপাকি কোথাও হয় নি কিছু। মা বললে কোরশুনফদের নাতালিয়ার কথা নাকি বাবা বলেছে।

—নাতালিয়া···নাতালিয়া খুব ভাল মেয়ে···খুব সুন্দর দেখতে···তুমি তাকে বিয়ে করলে···সেদিন তাকে দেখে ছিলাম গীর্জায়···সুন্দর একটা পোষাকে বেশ মানিয়েছিল।

—রূপের কথা আমার কাছে বলবে না আকসিনিয়া; আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই।

গ্রীগরীর মাথার তলা থেকে হাতখানা টেনে এনে আকসিনিয়া উদাস দৃষ্টিতে জানালার দিকে চেয়ে রইল। পাতলা কুয়াসার কটা আবরণে আঙিনা আচ্ছন্ন। বনে বিরামহীন ঝিল্লীরব। মনের ভাঁটি থেকে বকের গম্ভীর ডাক কানে আসছে।

—গ্রীশ্‌কা।

—কিছু ভাবছিলে?

গ্রীগরীর অনমনীয় হাতখানা টেনে নিজের বক্ষদেশে হিমশীতল গালে চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে আকসিনিয়া বলে উঠল—আমায় এমন ক'রে কেন তুমি পাগল করলে গ্রীশ্‌কা? এখন আমার

উপায় ?…আমি ডুবেছি। যেখানে এলে আমি কি ...কো নেই।
আবার দেখবে ? বল। হঠাৎ

গ্রীগরী নিরুত্তর। আকসিনিয়া তার সুগঠিত ঈগলের মত এই আঁখি! ছায়াচ্ছন্ন চোখের পানে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সহসা দুই! বন্যায় তার সংযমের বাঁধ ভেঙে চুরমার ক'রে গেল। ঝুঁকে সে উন্মাদের মত অজস্র চুম্বনে গ্রীশ্‌কার মুখ চোখ ঘাড় তার কোমল বক্ষ ভ'রে দিতে লাগল। পরে হাঁক ছেড়ে মৃদু কম্পিত স্বরে বললে,—গ্রীশ্‌কা! গ্রীশ্‌কা চল আমরা পালিয়ে যাই। সব ছেড়ে চল আমরা চলে যাই। আমি স্বামী সংসার সব ছাড়বো…যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবো… চল দূরে খনি অঞ্চলে কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভালবাসব, তোমার সেবা করব। পারামোনফ খনিতে আমার এক মামা দারোয়ান। তাকে বললে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। গ্রীশ্‌কা! গ্রীশ্‌কা! বল যাবে ? একটি শুধু মুখের কথা!—গ্রীগরী টের পেল তার সারা দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে।

অসাড় ভাবে মুখ চোখ বুজে গ্রীগরী পড়ে রইল। অপ্রত্যাশিত ভাবে চাইলে যখন চোখে তার রূঢ় বিদ্রূপের হাসি।

—তুমি একেবারেই বোকা আকসিনিয়া! সত্যিই বোকা! মাথামুণ্ড নেই কেবল বকে যাচ্ছ। ফার্ম ছেড়ে কোথায় গিয়ে মাথা রাখবে ? আসছে বছরেই আমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে। ফার্ম ছেড়ে এক পা'ও আমি নড়বো না। এখানে দেখছ দিগন্তবিস্তৃত বিশাল প্রান্তর। আর সেখানে ?—ইঞ্জিনের গোঙানি, কয়লার গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত —দম আটকে আসে আর কি! বাবার সঙ্গে গত বছর স্টেশনে গিয়ে আমি টের পেয়েছি। কি ক'রে যে সেখানে লোকে বাস করে আমি ভেবে পাইনে। হয়ত তারা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। থুথু ফেলে গ্রীগরী আবার বললে—গ্রাম ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছিনে।

—আ অন্ধকার গভীর হ'য়ে উঠল। প্রান্তরের কুয়াশার আস্তরণ হয় ঘুমিই হ। চাঁদের তলা দিয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে গেল। ঘরের —ব া গভীরতর হ'য়ে এল। স্তেপানের উদ্দিটা অস্পষ্ট হয়ে উঠল। বেলা এ অন্ধকারে আকসিনিয়ার কাঁধের মৃদু কম্পন কিংবা দু'হাতে । চেপে বালিশের ওপর উপুড় হ'য়ে তার নীরব কান্না—এ দুয়ের কোনটা গ্রীগরীর নজরে পড়ল না।

তোমিলিনের স্ত্রী এসে যাবার পর থেকে স্তেপানের চোখ মুখের ভাব একেবারেই বদলে গেছে। ভ্রূ ঝুঁকে পড়েছে চোখের ওপর। কপালে ক্ষুব্ধ চিন্তা-রেখা। ঘোড়া যেমন নিরুপায় হ'য়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সওয়ারকে পিঠে বহন ক'রে চলে, মৌন ধূমায়িত ক্রোধে স্তেপানও তেমনি নিজের দুঃখের বোঝা বহন করতে লাগল। সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বড় বেশী বলে না; সামান্য একটু কিছুতেই চটে-মটে অস্থির হয়। তা ছাড়া পিয়োতরের সঙ্গে তার বহু দিনের বন্ধুত্ব একেবারেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে। ফিরেও একবার তার দিকে তাকায় না। পরস্পর রীতিমত শত্রু হ'য়েই তারা বাড়ী ফিরল।

আসবার সময় পূর্বের মত দল বেঁধেই ফিরল। পিয়োতর এবং স্তেপানের ঘোড়া দুটোকে গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্তোনিয়া পিছনে চলেছে তার নিজের ঘোড়ার পিঠে। তোমিলিনের জ্বর। গাড়ীর মধ্যে কোট মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। গাড়ী চালান ফেদোৎ বদভ্‌স্কভের মত কুঁড়ে লোকের কাজ নয়। কাজেই পিয়োতরকেই রাশ ধরতে হ'ল। স্তেপান গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে আর হাতের চাবুকটা দিয়ে পথিপার্শ্বের কাঁটা-গাছগুলির শীষ চাবকে ভেঙে দিচ্ছে।

টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। কালোমাটি চর্বির মত চাকায় জড়িয়ে যাচ্ছে। শরতের সুনীল আকাশ অচ্ছ মেঘে পাণ্ডুর। ক্রমে

রাত্রি ঘনিয়ে এল। গ্রামের কোন প্রদীপশিখা দেখবার জো নেই। কশাঘাতে পিয়োতর ঘোড়া দুটোকে অস্থির ক'রে তুলল। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে স্তেপান ধমক দিয়ে বললে—এই ওকি! নিজেরটা ছেড়ে সব সময়ে কেবল আমারটার পিঠেই চাবুক চলছে!

—ভাল ক'রে চোখ চেয়ে ভাখো না। যেটা না চলছে তাকেই মারছি।

স্তেপান জবাব দিলে না। আধ ঘণ্টাখানেক নীরবে এই ভাবেই চলল। চাকার তলায় কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। ত্রিপলের পর বৃষ্টির টুপটাপ্ শব্দ। রাশ ছেড়ে পিয়োতর সিগ্রেট ধরাল। স্তেপানের সঙ্গে পরবর্তী ঝগড়ায় যে-সব গালাগাল ব্যবহার হবে মনে মনে পিয়োতর তার মহড়া দিচ্ছিল। সহসা একটা ঝাঁকানি খেয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। কাদায় পিছলে ঘোড়া দুটো পা দিয়ে মাটি ঘষছে।

—কি হোলো আবার?—শঙ্কিতভাবে স্তেপান জিজ্ঞাসা করে।

—একটা আলো নিয়ে এসো না শীগ্‌গির করে।—পিয়োতর বললে।

সামনের ঘোড়া দুটো উঠবার চেষ্টা করছে আর নাকের শব্দ করছে। কে একটা দিশলাইর কাঠি জ্বালল। ক্ষীণ একটু আলো-রেখা জ্বলে উঠে মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল। আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। কম্পিত হস্তে লাগাম ধরে পিয়োতর পতিত ঘোড়াটাকে চেপে রাখল। কোঁসকোঁস শব্দ ক'রে ঘোড়াটা কাত হ'য়ে পড়ল। অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে জ্বেলে স্তেপান্ দেখলে তার ঘোড়াটার সামনের বাঁ পাখানা প্রায় হাঁটু অবধি ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেছে। চটপট করে খুস্তোনিয়া ঘোড়া জুড়বার দড়ি-দড়াগুলো খুলে দিলে।

—শীগ্‌গির পিয়োতরের ঘোড়াটাকে খুলে ফেল।

কোন মতে স্তেপানের ঘোড়াটার পাখানা তোলা গেল। কাদায়

মধ্যে হাঁটু ভেঙে বসে ঘোড়াটার পায়ে হাত দিয়ে খৃস্তোনিয়া বললে—মনে হয় ভেঙে গেছে ; ছাখ তো হাঁটতে পারে কি না।

পিয়োতর লাগাম ধরে টান দিতেই বাঁ পা ফেলতে না ফেলে ঘোড়াটা দু-এক পা লাফিয়ে চলে চিঁহি ক'রে ডেকে উঠল। কোটের ভেতর থেকে মাথা বার ক'রে তোমিলিন বললে—ভেঙেছে, না ? যাক্‌, গেল ঘোড়া একটা !

এ পর্যন্ত স্তেপান্ একটি কথাও বলে নি। মনে হয় এই রকম একটা মন্তব্যের প্রতীক্ষাতেই ছিল। খৃস্তোনিয়াকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে' সে পিয়োতরের মুখোমুখি দাঁড়াল। মাথা লক্ষ্য করেই ঘুষি বসিয়েছিল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুষিটা লাগল কাঁধে। দুজনেই জড়াজড়ি ক'রে কাদার মধ্যে পড়ল। পড়্‌পড়্‌ করে শার্ট ছিঁড়বার শব্দ হ'ল। পিয়োতরকে তলায় ফেলে হাঁটু দিয়ে মাথা চেপে ধরে স্তেপান দু-হাতে পটাপট ঘুষি চালাচ্ছে। খৃস্তোনিয়া তাকে টেনে সরিয়ে আনল।

—এ সব কি ?—থুক্ ক'রে মুখ থেকে রক্ত ফেলে চীৎকার ক'রে পিয়োতর বললে।

—বলি নি রাস্তা ছেড়ে গাড়ী চালাস নে বদমাইস কোথাকার।

পিয়োতর খৃস্তোনিয়ার হাত ছাড়িয়ে স্তেপানের দিকে রুখে এগুলো। এক হাতে পিয়োতরকে গাড়ীর দিকে ঠেলে রেখে খৃস্তোনিয়া বললে—ছাখো ছাখো ! আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাস নাকি ?

অতঃপর বাস্ক্‌কফের ছোট্ট ঘোড়াটাকেই পিয়োতরেরটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। স্তেপান্‌কে তার নিজের ঘোড়ায় চড়ে যেতে বলে খৃস্তোনিয়া পিয়োতরের গাড়ীতে উঠে বসল। প্রায় দুপুর রাত্রে তারা একটা গ্রামে পৌছাল ; প্রথম বাড়ীর কাছে এসেই খৃস্তোনিয়া সেদিনকার মত রাত্রি যাপনের একটু জায়গা অনুনয়-বিনয় করে জোগাড় করল।

বাস্কক ঘোড়া ক'টাকে ভেতরে নিয়ে গেল। উঠানের

মাঝখানে একটা শূয়োরের জল খাবার পাত্রে হোঁচট খেয়ে বরতস্ক্কে গৃহকর্তার উদ্দেশে বেশ দু-দশটা গালি বর্ষণ করলে। ঘোড়া কটা চালার মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ল। দাঁত ঠক্ঠক্ ক'রে স্তেফানিদ ঘরে ঢুকল। পিয়োতর এবং খ্রস্তোনিয়া গাড়ীতেই রইল।

ভোরেই আবার রওনা হবার গোছগাছ হ'তে লাগল। স্তেপানের পেছন পেছন কুটীরের ভিতর থেকে একটি অশীতিপরা বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। চালার কাছে গিয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন—কই সেটা?

—ঐ কালোটা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্তেপান উত্তর দিল।

লাঠিখানা মাটিতে রেখে ঘোড়াটার পাখানা তুলে টিপে-টুপে দেখে বৃদ্ধা বললেন—না, ভাঙে নি তো! রেখে যাও আমি সারিয়ে দেবো।

স্তেপান অভিবাদন ক'রে গাড়ীতে ফিরল। পিছু থেকে বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—যাবে রেখে?

উত্তর এলো—থাক্।

তার জন্য আমি পাগল হয়েছি মা।"

—সাত—

—তার জন্ত আমি পাগল হয়েছি মা! চোখের আড় হ'লে সইতে পারি না। যখন সে উঠোন দিয়ে চলে যায়, আমার বুক ফেটে যায়। ইচ্ছে হয় মাটিতে লুটিয়ে তার পথের ধুলোয় চুমু খাই। ওরা তাকে বিয়ে দেবে···আমায় বাঁচাও মা। যা লাগে সব আমি দেবো; আমার শেষ সেমিজটা পর্য্যন্ত তোমায় দিয়ে দেবো! আমায় সাহায্য কর।

আকসিনিয়ার কাহিনী শুনে ললাট-রেখা কুঞ্চিত ক'রে বৃদ্ধা রোষশিখা উজ্জ্বল চোখে তার পানে চেয়ে অনুকম্পার স্বরে বললে— ছেলে কার?

—পান্তেলিমন মেলেখফের।

—ও, সেই বুড়ী! না?

—হাঁ!

ফোক্‌লা মুখ চিবিয়ে বুড়ী বললে—কাল খুব ভোরে আমার এখানে এসো। দনের ওখানে যেতে হবে। কোন দুঃখু থাকবে না তোমার। আসবার বেলা হাতে ক'রে একটু নুন নিয়ে এসো বুঝলে?

শালের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আকসিনিয়া সন্তর্পণে বেরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডুবে গেল। পদধ্বনিও ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে এল। দূরে গ্রামের প্রান্তে কোথায় যেন গান হচ্ছে।

সারা রাত সে একটুকু ঘুমুতে পারল না। ভোর হ'তে না হ'তেই আবার দ্রোজদিখার দরজায় এসে হাজির।

—মা! বুড়ী মা!

—কে?

—আমি আকসিনিয়া! ওঠো।

পাশের রাস্তার মোড় ঘুরে তারা দনের কাছে উপস্থিত হ'ল। জলের কিনারে বালিরাশি হিম-শীতল হ'য়ে আছে। দনের বুক থেকে আর্দ্র কন্‌কনে কুয়াসা ঊর্ধে উঠে যাচ্ছে। দ্রোজদিখা তার অস্থিসার হাত দিয়ে আকসিনিয়াকে ধরে জলের কিনারে নিয়ে গেল।

—দেখি নুনটুকু দাও তো আমার হাতে। পূব মুখো হয়ে ক্রুশ কর।

আকসিনিয়া বুড়ীর নির্দেশ যথাযথ পালন করল। পূব দিগন্তের অরুণচ্ছটার স্নিগ্ধ প্রলেপ তার আদৌ ভাল লাগল না।

—হাতে একটু জল নিয়ে খেয়ে ফেল। তাড়াতাড়ি!

আকসিনিয়া আদেশ পালন করল। বুড়ী তখন একটা অলস ঢেউয়ের ওপর পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় ক'রে যা বলল তার অনেক কিছুই আকসিনিয়া শুনতে পেল না। শেষের দিকে শুনলে শুধু বুড়ী বলছে: ···পবিত্র ক্রুশ, অতি পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মা···ঈশ্বরের দাস গ্রীগরী···।

—তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে একটু জল ছিটিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

আকসিনিয়া নির্দেশ পালন করল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্রোতস্বিনীর থলথলে কোঁচকান গালের পানে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—এতেই হবে তো?

—খুব!

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আকসিনিয়া বাড়ী ফিরল। গরুগুলি প্রাঙ্গণে হাম্বা রবে ডাকছে। নিদ্রাজড়িত চোখে দারিয়া তাদের গরুগুলি মাঠে নিয়ে যাচ্ছিল। আকসিনিয়াকে দৌড়াতে দেখেই হেসে জিজ্ঞেস করল—কি গো পড়শী রাতে ঘুম হয়েছিল?

—হাঁ ভাই, ধন্যবাদ!

—এত ভোরে কোথায় গেছলে।

—পাড়ায় কাজ ছিল একটা!

গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠল! প্রভাতী উপাসনার সময় আগত। আকসিনিয়া তাড়াতাড়ি গরুগুলি ছেড়ে দিলে। তার পর দুধের ভাঁড় বারান্দায় এনে ছাঁকবার আয়োজন করতে লাগল। সহসা রাস্তায় গাড়ীর চাকার কচ্‌মচ্‌ এবং ঘোড়ার নাকের-শব্দ শোনা গেল। ভাঁড়টা রেখে আকসিনিয়া জানালা দিয়ে উঁকি মারল। কটিবদ্ধ অসির মুষ্টিতে হাত রেখে স্তেপান ভেতরে ঢুকছে। হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে স্কার্ট চেপে ধরে আকসিনিয়া পাশের বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ল। সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে…বারান্দায়…তার পর একেবারে দরজার পাশে।

চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে আকসিনিয়ার পানে চেয়ে ধীরে সংযতকণ্ঠে স্তেপান জিজ্ঞাসা করল—ভাল আছ? ভীরু কম্পিত বক্ষে সশঙ্কিতা আকসিনিয়া সম্ভাষণ জানাবার জন্ত এগিয়ে এল। সামনে এসে অপলক দৃষ্টিতে স্তেপানের দিকে তাকিয়ে পাশ ফিরে বললে:

হু'জ এবং ঘোঁ মেরে পেছন থেকে স্তেপানকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু টলতে টলতে স্তেপান ক্ষেপা ভল্লুকের মত তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হ'য়ে গেল। মেলেখফ ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণপণে ঘুষতে লাগল। মনে হল ছুটো দাঁড়কাক মিলে একটা কঙ্কালকে ঠুকরে অস্থির ক'রে তুলেছে। স্তেপানের ঘুষিতে কয়েকবার গ্রীগরী ধরাশায়ী হয়েছে। স্তেপান শক্তপোক্ত হ'লেও পিয়োতর তার তুলনায় বেশী জোয়ান। তবু সে পর্যন্ত বায়ুতাড়িত গুল্মের মত স্তেপানের ঘুষিতে অস্থির হ'য়ে উঠেছে; কিন্তু দমবার মত ছেলে সে নয়! স্তেপান তাদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এক পা দু'পা ক'রে পিছু হটে সিঁড়ি পর্যন্ত এল। খ্রিস্তোনিয়া এমনি সময়ে তার কাছে কি ধার নেবার জন্ত এসেছিল; ব্যাপার দেখে সে ওদের ছাড়িয়ে দেয়।

—আঃ থামো! হাত ঘুরিয়ে খ্রিস্তোনিয়া বললে—সরে যাও, না হ'লে আমি আতামানের কাছে রিপোর্ট করে দেবো।

থুক্ করে হাতের তেলোয় কিছু রক্ত এবং আধখানা দাঁত ফেলে রুক্ষ স্বরে পিয়োতর বললে—চলে আয় গ্রীশকা, আর একদিন দেখে নেবো।

—আমার পেছনে লাগতে আসবি না বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না!—স্তেপান সিঁড়ি থেকে শাসিয়ে বল্লে।

—আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে।

—দেখা যাবে নয়। তা হ'লে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব বলে দিলাম।

—ওঃ ভুঁড়ি ফাঁসাবে! মুখে অনেক বেটাই বলে।

—মুখে বলে! দাঁড়া! স্তেপান ছুটে ওদের দিকে এলো। গ্রীগরী রুখে দাঁড়াল; কিন্তু খ্রিস্তোনিয়া তাকে ফটক অবধি ঠেলে দিয়ে বললে—ফের আসবি তো আমিই ভাল করে দু'ঘা দেবো তাকে।

—আট—

—পিয়োত্তরকে বল ঘুড়ীটা আর তার ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুতুক। উপাসনাকালে গীর্জার ওয়ার্ডেন যেমন ভারিক্কি চালে কথা বলে তেমনি গম্ভীর ভাবে আদেশ ক'রে পান্তেলিমন ক্ষত বাকী ঝোলটুকু শেষ করে ফেলল। খেয়ে একশা হয়েছে বুড়ো। সতর্ক দৃষ্টিতে দুস্কা গ্রীগরীর প্রতিটি ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল। ছুটির দিনে পরবার কমলালেবু রঙের শালটাতে ইলিনীচনাকে বেশ জমাকালো দেখাচ্ছিল। মায়ের মত দরদী কণ্ঠে বৃদ্ধা বললে—আর একটু ঝোল দিচ্ছি খেয়ে ফেল! না খেয়ে খেয়ে কি চেহারা হয়েছে দেখেছ?

—খাবার সময় নেই!—বৃদ্ধ উত্তর দিল। চৌকাঠের পাশে পিয়োত্তরের গমের মত গোঁফ দেখা গেল—গাড়ী প্রস্তুত এসো! তার ভাব দেখে দুস্কা হেসে স্কার্টে মুখ লুকাল।

ঘটক হিসাবে ইলিনীচনার সুচতুরা বিধবা মাসতুতো বোন ভাসিলিসা ওদের সঙ্গে যাবে ঠিক হয়েছে। সর্বাগ্রে সে-ই গাড়ীতে বসল। আনন্দের আতিশয্যে তার হাসি আর ধরে না। বাঁকা দাঁতকটি আবার কালো। পান্তেলিমন তার ভাবসাব দেখে বিরক্তভাবে বললে—অমন দাঁত বার ক'রে আর হেসো না ভাসিলিসা। তুমিই সব পণ্ড ক'রে দেবে! আর যে সুন্দর দাঁত! একটা এদিকে একটা ওদিকে যেন সবগুলি পাঁড় মাতাল।

—হোক না, আমি তো আর বর নই!

—না-ই বা হ'লে, তবু তুমি অমন ক'রে হেসো না বাপু।

ভাসিলিসা একটু দমে গেল। পিয়োত্তর ইতিমধ্যে কটক

খুলেছে। কাঁচা চামড়ার রাশটা ধরে গ্রীগরী সহিসের আসনে উঠে বসল। প্যান্তেলিমন এবং ইলিনীচনা তরুণ যুগলের মত পশ্চাতের আসনে উপবেশন করল। ঠোঁট কামড়ে গ্রীগরী চাবুক লাগাতেই হেলে দুলে ঝাঁকানি খেয়ে গড়্ গড় শব্দে রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল। বাঁকা হয়ে গ্রীগরী পিয়োতরের ঘোড়াটার পিঠে বাড়ি মারল। বাতাসে আঁচড়ান-দাড়ি উসকুখসকু হ'য়ে যাবে এই আশঙ্কায় এক হাতে দাড়ি ধরে বৃদ্ধ গ্রীগরীর দিকে ঝুঁকে বললে—ছুড়ীটাকে চাবকা না। বাতাসের ঝাপটায় চোখের কোণে জল জমেছে; জ্যাকেটের প্রান্তে মুছে ইলিনীচনা পুত্রের পিঠের ওপর উড়ন্ত কালো সাটিনের শার্টটা লক্ষ্য করছিল। কসাকরা পথ ছেড়ে দিয়ে উৎসুক ভাবে তাদের দিকে চেয়ে রইল। ঘেউ ঘেউ ক'রে কুকুরগুলি এগিয়ে আসে; পরক্ষণেই ঘোড়ার চাঁট খেয়ে কেঁউ কেঁউ শব্দ ক'রে পালায়। মিনিট দশেকের মধ্যেই গ্রীগরী গ্রাম ছেড়ে কোরশুনকের তক্তার-বেড়া দেওয়া উঠানের সামনে হাজির হ'ল। রাশ টানতেই গাড়ীখানা সহসা সিরণের রঙ করা ফটকের কাছে থেমে গেল। গ্রীগরী গাড়ীতেই রইল। প্যান্তেলিমন্ খুঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল। পশ্চাতে স্কার্ট খস খস করে এলো ইলিনীচনা এবং ডাসিলিশা। পথে আসতে আসতে বুকে যে সাহসটুকু সঞ্চয় করেছিল পাছে সেটুকু গুলিয়ে যায় এই আশঙ্কায় বৃদ্ধ দ্রুতপদে অগ্রসর হ'তে লাগল।

উঁচু খাড়া সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে বৃদ্ধ হোঁচট খেল। ব্যথায় ভুরু কুঁচকে, খোঁড়া পা খানায় ছুটো ঝাঁকানি দিয়ে চট পট পরিচ্ছন্ন সিঁড়ি বেয়ে বৃদ্ধ উপরে উঠে গেল। প্রায় একসঙ্গেই প্যান্তেলিমন ও ইলিনীচনা রান্নাঘরে ঢুকল। কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা বলে তার পাশে না দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ এক পা এগিয়ে দাঁড়াল। তার পর মাথার টুপী খুলে ইকনের সামনে ক্রশ ক'রে জিজ্ঞাসা করল—সব ভাল তো!

—নমস্কার!—কেদারা ঝেড়ে উঠে শণের মত চুল গৃহস্বামী অভিবাদন জানিয়ে বললে।

—আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি এসেছে মিরণ গ্রীগরিয়েভিচ্!

—তা বেশই তো! মারিয়া, এঁদের বসবার কিছু দাও!

ধুলো নেই তবু হাত দিয়ে ঝেড়ে প্রবীণা মারিয়া তিনখানি টুল এগিয়ে দিলো। পান্তেলিমন একখানি টুলের প্রান্তে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ভনিতা না করেই বলল—আমরা একটা দরকারে এসেছি। এ কথার পরে ইলিনীচনা এবং ডাসিলিশা স্কার্ট টেনে বসে পড়লে।

—বলুন কি দরকার! হেসে গৃহস্বামী বলল।

গ্রীগরী ঘরে ঢুকে এদিক ওদিকে চেয়ে কোরশুনভদের সম্ভাষণ জানালে। গ্রীগরীকে দেখে আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে তার এতটুকু বিলম্ব হ'ল না! স্ত্রীকে বললে—ঘোড়াকটাকে ভেতরে এনে কিছু খড় দাও।

দাড়ি চুলকে বৃদ্ধ আবার বল্লে—কথাটা খুব বেশী কিছু নয়। আপনার একটি কুমারী কন্যা আছে; আমাদেরও ছেলে আছে একটি একটা কোন যোগাযোগ করা যায় নাকি? মেয়ের এখন বিয়ে দেবেন তো? সেই কথাই আমরা জানতে এসেছি। একটা আত্মীয়তা হয়ে যেতো!—দ্বিধার দ্বন্দ্বে বৃদ্ধ কানের ইয়ারিংটি খুঁটতে লাগল।

—কে তা বলতে পারে বলুন।—টাকে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ মিরণ বললে—সত্যি কথা বলতে কি, হাতে এত কাজ রয়েছে যে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তা ছাড়া বয়সও তো এমন বেশী হয় নি। এই আঠারোয় পড়ল বুঝি না মারিয়া?

—ঐ রকমই হবে।

—ওর তো বিয়ের ঠিক বয়সই হয়েছে।—[illegible] ক'রে ভাসিলিসা বললে;—মেয়েরা তো বুড়ী তাড়াতাড়িতেই হয়ে পড়ে। রান্নাঘর থেকে চুরি ক'রে যে সম্মার্জনী সে জ্যাকেটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল তার খোঁচা লেগে ভাসিলিসা টুলের উপর উস্‌খুস্ করতে লাগল। প্রবাদ আছে, যে ঘটক কনের ঝাঁটা চুরি ক'রে নিতে পারে তার উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হয় না।

—বসন্তের প্রথম দিকে আর একটা সম্বন্ধ এসেছিল; কিন্তু মেয়েকে একটা যা' তা' ঘরে তো আর দেওয়া যায় না। ঘরের বাইরের সব কাজই সে করতে পারে।—মারিয়া উত্তর দিল।

কোরশুনফ-পত্নীর অনাবশ্যক কথার মধ্যেই পান্তেলিমন বলে উঠল: ভাল লোক আসলে আপনারা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিতেন না।

মাথা চুলকে গৃহস্বামী বলল—না, ফিরিয়ে দেবার কোন কথা নয়। যে কোন সময়ই আমরা ওর বিয়ে দিতে পারি।

প্রস্তাব কেঁসে যাবার উপক্রম হ'ল। পান্তেলিমন ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগল। মিরণ-পত্নীও ছায়ায়-বসা মুরগীর মত অনবরত বক্ বক্ করে চলেছে। সুযোগ বুঝে সুচতুরা ভাসিলিসা এমনি খোশামোদে ভাষায় কোরশুনফের গুণকীর্তন করলে যে মুহূর্ত মধ্যে ফাটল জোড়া লেগে গেল। ভাসিলিসার কথার ফুলঝুরি জলন্ত আগুনে নুন ছিটিয়ে দেবার কাজ করল।

—দেখুন, এই রকম একটা কথা যদি ওঠে তা হ'লে ভেবেচিন্তে সব দিক দেখে তার সমাধান করা দরকার। মেয়ের সুখশান্তির কথাও ভেবে দেখা উচিত। সত্যিই তো, কাজকর্মে নাতালিয়ার মত মেয়ে কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়? দেখতেও যেমনি কাজেও তেমনি। কাজে যেন আগুন জলে। আর বাব্ ফিটফাট কত! তার পর গ্রীশকাকে দেখিয়ে মিরনের দিকে চেয়ে বললে: তার পর ছেলের দিক

যদি দেখেন তো অমন বর পাওয়া বরাতের কথা। ওর দিকে যখন তাকাই, আমারই লোভ হয়। হাঁ, দেখতে ও অনেকটা আমার কর্তার মতই। তা' ছাড়া ওদের ঘরে কাজকর্মে সবাই পটু। এ অঞ্চলে যে কারও কাছে প্রকোফিয়েভিচের কথা জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। সবাই লোক ভাল। অমন সৎ লোক···নিজের সন্তানের কোন অমঙ্গল হোক্ কোন বাপ-মা কি তাই চায় ?

ভাসিলিসার কথায় বুনানি পান্তেলিমনের কানে মধু বর্ষণ করল। আনত দৃষ্টিতে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের লোম খুঁটতে খুঁটতে সে ভাসিলিসার মুখনিঃসৃত কোরশুনকের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষের গুণকীর্তন শুনতে লাগল। মনে মনে বললে—মাগী কেমন মধুর ফোয়ারা ছুটিয়েছে ত্যাখো না।

—বালাই মেয়ের অমঙ্গল চাইব কেন ?—মারিয়া বললে।

—কিন্তু কথা কি জানেন, তেমন বড় হয় নি তো তাই বিয়ে দিতে চাই না !—প্রশান্ত হাসি হেসে মিরন উত্তর করল।

—না তেমন ছোট আর কই ! পান্তেলিমন বললে।

—আজ হোক কাল হোক তাকে পরের বাড়ী পাঠাতে হবেই ! খানিকটা ভনিতায় আর খানিকটা মেয়েলী আবেগে ধরা-গলায় কোরশুনক-পত্নী বললে।

—মেয়েটিকে তা হ'লে একবারটি ডাকুন না গ্রীশমিয়েভিচ, দেখে যাই।

—নাতালিয়া !

ভীরু একটি মেয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল। নোংরা আঙুল দিয়ে অপ্রন খুঁটছিল মেয়েটি।

—আয়, ভেতরে আয় ! ও একটু লাজুক !—কন্যার উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্য অশ্রুসজল চোখে হেসে মারিয়া বললে।

ক্রেতা যেমন কিনবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পণ্য দ্রব্যটাকে পর্যবেক্ষণ করে, গ্রীগরীও তেমনি ভাবে এই লাজুক মেয়েটির আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করতে লাগল। মেয়েটিও চেয়েছিল তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে গ্রীগরীর পানে। চোখ দুটি কটা হ'লেও শান্তশ্রীমণ্ডিত, টোল পরা গালে ঈষৎ গোলাপী আভা; হাত দুখানি শ্রম-মলিন। খাটো সবুজ জ্যাকেটের অন্তরালে তার দৃঢ়সংবদ্ধ উদ্ভিন্ন যৌবন কিশলয়ের প্রকাশ আজও সলজ্জ। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তা' সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। ছোট্ট খাড়া বোঁটা দুটি বোতামের মত। আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ ক'রে গ্রীগরী মনে মনে সিদ্ধান্ত করল—চলতে পারে।

মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো গ্রীগরীর দিকে। তার সেই সরল অকপট এবং ঈষৎ বিব্রত চাহনি দেখে মনে হয় সে যেন বলছে—যেমন দেখছ এই-ই আমার সব। নিজের পছন্দ মত বিচার ক'রে নাও। গ্রীগরীর মুগ্ধ দৃষ্টি বললে—চমৎকার! ঠোঁটের প্রান্তে হাসিরেখা দেখা দিল।

হাত নেড়ে যাবার ইঙ্গিত করে নাতালিয়ার বাবা বললে—হয়েছে যাও।

দরজা বন্ধ ক'রে দিতে গিয়ে নাতালিয়া হাসি এবং আগ্রহ লুকোবার চেষ্টা না করেই চাইল গ্রীগরের পানে।

গৃহিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে কোরশুনফ বলতে শুরু করল: শুনুন পান্তেলিমন প্রকোফিয়েভিচ, আপনারা এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করে দেখুন। আমরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। তার পর ঠিক্ করা যাবে এ সম্বন্ধে হবে কি হবে না—কেমন?

যাবার বেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পান্তেলিমন বলে গেল—পরের রবিবারে আবার আসবো তা হ'লে। যেন শোনে নি' এই ভাণ ক'রে কোরশুনফ ইচ্ছে ক'রে জবাব দিলে না।

ঘুণে-ধরা দাম্পত্য জীবন সত্ত্বেও স্তেপান যেদিন তোমিলিনের কাছ থেকে আকসিনিয়ার কুৎসা শুনল, অন্তরের দাহ এবং ঘৃণা সত্ত্বেও সেই দিন থেকে সে বুঝল—আকসিনিয়াকে সে ভালবাসে। নিষ্ফল এবং তিক্ত হ'লেও তা ভালবাসা। কোট মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে গাড়ীতে শুয়ে সে সারা রাত ভেবেছে, বাড়ী গেলে আকসিনিয়া তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে। ক্রুদ্ধরোষ ও যন্ত্রণায় সে ঘুমোতে পারে নি। চোখ বুজে কি ক'রে প্রতিশোধ তোলা যায় সে সম্বন্ধে হাজারো কথা ভেবেছে।

স্তেপান্ বাড়ী ফিরবার পর দিন থেকে আস্তাখভদের বাড়ীতে একটা সন্ত্রস্ত বিভীষিকার ছায়া নেমে এসেছে। আকসিনিয়া সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাটত, কথা বলত' ফিস্‌ফিস্ করে। তবু তার ভয়-চকিত দৃষ্টির মধ্যে গ্রীগরী যে বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তার পুলক জ্যোতির ছিটে তখনও লেগেছিল।

আকসিনিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েও স্তেপানের মনে হ'ত সে ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে আকসিনিয়া এখন অনুভূতি মাত্র। মানসিক যন্ত্রণায় স্তেপান্ ছট্‌ফট্ করত। রাত্রিতে মক্ষিকার দল কড়িকাঠে আশ্রয় গ্রহণ করলে আকসিনিয়া যখন বিছানা পাতত' লোমশ হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে তাকে প্রাণভরে প্রহার ক'রে স্তেপান্ যন্ত্রণার লাঘব করত'। গ্রীগরীর সঙ্গে যা-কিছু হয়েছে নির্লজ্জের মত খুঁটিনাটি সব কিছু বলবার জন্ত সে জিদ ধরত।

আকসিনিয়ার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ত। যন্ত্রণায় সে বিছানার পর গড়াগড়ি করত। অবশেষে স্ত্রীর কোমল শরীরে প্রহার ক'রে স্তেপানের হাত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত' চোখে জল এসেছে কিনা দেখবার জন্ত সে মুখের উপর হাত বাড়াত! কিন্তু আকসিনিয়ার উত্তপ্ত গালে কোন দিন একফোঁটা জল পাওয়া যায়নি।

—বলবে কি না?

—না।

—খুন ক'রে ফেলে দেবো।

—তাই ভাল! দোহাই তোমার! দোহাই যীশুর! আমাকে খুন ক'রে ফেল। এ জীবনের চাইতে আমার···

দাঁত কড়মড় ক'রে স্তেপান্ আকসিনিয়ার স্বেদসিক্ত স্তনের পাতলা চামড়া মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করত। তীব্র যন্ত্রণায় আকসিনিয়া 'মাগো' বলে আর্তনাদ ক'রে উঠত।

—খুব লাগছে, না?—শ্লেষকটু কণ্ঠে স্তেপান জিজ্ঞাসা ক'রত।

—লাগে না?

—ভেবেছ কি আমিও ব্যথা পাই নি?

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটবার পর গভীর রাত্রে স্তেপান্ ঘুমিয়ে পড়ত'। ঘুমের মধ্যেও সে দাঁত কড়মড় করে ঘুষি বাগায়। কনুইয়ে ভর ক'রে স্থিরদৃষ্টিতে আকসিনিয়া নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকত। তার পর বালিশে মাথা রেখে একান্তে আপন মনে বিড়বিড় করত'।

গ্রীগরীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল প্রায়ই হয় না। সেদিন ডনের কাছে একবার মাত্র দেখেছিল তাকে। কচি একটা ডাল হাতে নিজের পা ফেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষাঁড়গুলিকে জল খাইয়ে উপরে উঠে আসছে গ্রীগরী। আকসিনিয়া নদীতে জল আনতে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হতেই মনে হ'ল বালতির জোয়ালটা হাতে হিম-শীতল হয়ে গেছে। ধমনীতে রক্ত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল।

পরে যখন এই সাক্ষাতের কথা মনে পড়ত, আকসিনিয়া বিশ্বাস করতে পারত না এমনতর সাক্ষাৎ একটা ঘটেছিল। পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা বালতির শব্দ শুনে গ্রীগরী চোখ তুলে চেয়ে দেখে আকসিনিয়া। কৌতুকোজ্জ্বল চোখে তার পানে চেয়ে গ্রীগরী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে হাঁদার মত হেসে উঠল। আকসিনিয়া তার মাথা

সোজা একদৃষ্টে ধনের সুনীল তরঙ্গের পানে চেয়ে রইল। শ্রীপতী ডাকল—আকসিনিয়া !

কয়েক পা এগিয়ে আকসিনিয়া আনত মস্তকে থমকে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধভাবে পশ্চাতের একটা ষাঁড়কে চাবুক মেরে মুখ না ফিরিয়েই শ্রীগরী বলল—স্তেপান রাই কাটতে কখন যাবে ?

—জোগাড় কচ্ছে দেখে এলাম।

—তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমাদের সূর্যমুখী ফুলের ঝোঁপটার কাছে যেও, আমি পরে আসবো।

আকসিনিয়া বালতিতে শব্দ করতে করতে ধনের জলে নামল। সর্পিল ফেনরাশি অপূর্ব নৃত্যছন্দে সুনীল ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে মালার মত নদীর কিনারে বেয়ে উঠছে। সাদা গাঙ চিল উড়ে বেড়াচ্ছে নদী বক্ষে। চুনোপুঁটি মাছ জলের উপর লাফিয়ে উঠছে ইতস্তত। ওপারে চড়ার ওধারে প্রাচীন পপলার-শীর্ষ উদ্ধতভাবে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জল ভরতে গিয়ে আকসিনিয়া হাত থেকে বালতিটা ফেলে দিল। তারপর স্কার্ট উঁচু করে হাঁটু জলে নামল। স্নিগ্ধ জলরাশি তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। স্তেপানের বাড়ী ফিরবার পর আকসিনিয়ার ঠোঁট দুখানি এই-ই সর্বপ্রথম এক অর্থহীন হাসির স্নিগ্ধ সংযত উল্লাসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আকসিনিয়া। শ্রীগরী তখনও কচি ডালটা ঘুরাতে ঘুরাতে ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠছে। দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলেছে সে। ঢিলা পাজামার অন্তরাল থেকে মাঝে মাঝে সাদা উলের মোজা জোড়া দেখা যায়। চোখের জলে আকসিনিয়ার দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এ'ল। মনে মনে সে দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্রীগরীর সবল পদদ্বয় জড়িয়ে সোহাগ করতে লাগল। পেছনে ঘাড়ের কাছে তার ময়লা শার্টটা ছেঁড়া ছিল। বাতাসে সেই ছিন্ন

ফুলকারি উড়ে গ্রীগরীর বলিষ্ঠ দেহের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আকসিনিয়া তার প্রিয় দেহের অংশটুকু দৃষ্টি চুম্বনে অস্থির ক'রে তুলল। মনে হল একদিন ঐ দেহ ত তারই ছিল। টপ্‌টপ্‌ ক'রে তার সহাস বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল!

জোয়ালের আঁকড়ায় লাগিয়ে দেবার জন্য বালতি ছটো মাটিতে রেখে নীচু হ'তেই বালির উপর গ্রীগরীর বুটের দাগ চোখে পড়ল। শঙ্কিতভাবে সে এদিক্ ওদিকে চেয়ে দেখল কাছে কেউ নেই। দূরে নদীর কিনারে কয়েকটা ছেলে স্নান করছে মাত্র। জানু পেতে বসে দু-হাতে সে পায়ের দাগটি চেপে ধরল। তারপর জোয়ালটা ঝাঁকানি দিয়ে কাঁধে তুলে আপন মনে হাস্‌তে হাস্‌তে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরল।

স্বচ্ছ মুসলিন-অবগুণ্ঠনে দিবাকর গ্রামদিগন্ত পাড়ি দিচ্ছে। কুঞ্চিত খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ওপাশে আকাশের বুকে একটা স্নিগ্ধ আরক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের উত্তপ্ত টিনের চালে, ধূলিমলিন পথচারীহীন রাস্তায়, ফার্ম প্রাঙ্গণের শুক্‌নো পাটল ঘাসের উপর নেমে এসেছে এক অসহ্য গুমট্।

আকসিনিয়া সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখে স্তেপান ফসল কাটবার গাড়ীটার সঙ্গে ঘোড়াটা জুড়ে দিচ্ছে। সামনের আসনের পর কোটটা রেখে রাশ টেনে ধরে আকসিনিয়াকে ডেকে বললে—ফটকটা খুলে দিয়ে যাও।

আদেশ পালন করতে করতে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আকসিনিয়া ভরসা করে জিজ্ঞেস্ করল—কখন ফিরবে আবার?

—সন্ধ্যার মুখে। আনিকুশ্‌কার সঙ্গে একত্রে কাট্‌ব ঠিক করেছি। কামারের ওখান থেকে কাজ সেরে বাড়ী এসে সে মাঠে যাবে। তার সঙ্গে আমার খাবারটা দিয়ে দিও।

কচ্‌মচ্‌ শব্দে ফসল কাটা গাড়ীটার চাকা রাস্তার বালিতে দাগ কেটে গড়িয়ে চলল। ঘরে এসে আকসিনিয়া খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; অবশেষে মাথায় রুমালখানা বেঁধে নদীর দিকে ছুটল। কিন্তু যদি সে ফিরে আসে? তবে?—বিদ্যুৎ-চমকে কথাটা মাথায় খেলতেই আকসিনিয়া থম্‌কে দাঁড়াল। মনে হয় পাশে একটা গর্ত দেখে ভয় পেয়েছে বুঝি। কিন্তু এ দ্বিধা ক্ষণিকের। পিছনে এদিক ওদিক চেয়েই সে আবার রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

বেড়া বাগান রৌদ্রকরোজ্জ্বল সূর্যমুখীর দিগন্তস্পর্শী হরিৎ ক্ষেত পার হয়ে গেল। সবুজ আলুর চারাগাছের উপর ঝুঁকে শামিলদের বউয়েরা চারার গোড়া খুঁড়ছে। তাদের গোলাপী স্কার্টের সামান্য কিছু দেখা যায়। মেলেখকদের বাগানের কাছে এসে আকসিনিয়া কয়েকবার এদিক ওদিক চেয়ে ফটক খুলল। সূর্যমুখীর ঝোঁপটার কাছে এসে দু-হাতে সবুজ গাছগুলি ফাঁক ক'রে নীচু হয়ে ভেতরে ঢুকে ফুলের রেণু মুখ থেকে মুছে আকসিনিয়া মাটির ওপরে বসে পড়ল। চারিধার নির্জন নিস্তব্ধ। কান পেতে সে নিঃশব্দ ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন শুন্‌তে লাগল!

আধ-ঘন্টাখানেক বসে থাকবার পর তার সন্দেহ হ'তে লাগল। আসবে কি? চলে যাবে মনস্থ ক'রে সে মাথার রুমালখানা ঠিক করছে এমনি সময়ে বাগানের ফটক খুলবার আওয়াজ হ'ল। পরক্ষণেই ডাক শুনল—আকসিনিয়া!

—এই দিকে এস।

—যাক্‌ তা হ'লে এসেছ তুমি। ভেতরে ঢুকে গ্রীগরী তার পাশে বসল। দু'জনের চোখাচোখি হ'ল। গ্রীগরীর মৌন-জিজ্ঞাসার উত্তরে আকসিনিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—আমার এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই গ্রীশকা; আমি গেছি।

—দেখ দেখি কত রক্ত ?

রাগে-অভিমানে আকসিনিয়া জ্যাকেটের কলার খুলে দেখালো। কুমারীর মত পরিস্ফীত তার গোলাপী স্তনদ্বয়ে অসংখ্য [illegible] মত নীলচে কালশিটা।

—বুঝলে ? রোজ মারে। আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে।…আর তুমিও বেশ ! কুকুরের মত আমায় কলঙ্কিত ক'রে এখন সরে পড়েছো ! …সবাই তোমরা এক ধাঁচের। কম্পিত হস্তে জ্যাকেটের বোতাম আটকে আকসিনিয়া চেয়ে দেখে গ্রীগরী মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে আছে।

একটা ঘাসের পাতা চিবোতে চিবোতে ধীরে সে বললে—তা হলে আমার ঘাড়েই তুমি দোষ চাপাতে চাও ?

—অপরাধী তুমি নও ?

—অনিচ্ছুক কেটিকে কুত্তা কখনও উত্যক্ত করে না আকসিনিয়া।

এই পূর্ব-পরিকল্পিত সরাসরি অপমান আকসিনিয়ার বুকে শেলের মত বিঁধল। দু-হাতে সে চোখ চেপে রইল। ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বক্র দৃষ্টিতে গ্রীগরী চেয়ে দেখে তার তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। পাতলা একফালি রৌদ্র সেই স্বচ্ছ অশ্রুকণার উপর টলমল ক'রে মুহূর্তের মধ্যে ভিজা দাগটি মুছে দিল। চোখের জল গ্রীগরী সইতে পারল না। এক তীব্র অস্বস্তিতে সে উস্‌খুস্ করতে লাগল। একটা লাল পিঁপড়ে তার পা-জামার উপর উঠেছিল, আর কিছু না পেয়ে অবশেষে সেইটেকেই পিষে ফেললে। আকসিনিয়ার পানে চেয়ে দেখে সে ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে। কিন্তু এবারে তার হাতের পিঠে একটার জায়গায় তিনটি ক্ষীণ অশ্রুধারা।

—হলো কি ? তোমাকে ব্যথা দিয়েছি ? আকসিনিয়া ! আঃ ! আকসিনিয়া ! শোন, একটা কথা আছে।

চোখ থেকে হাত নামিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে আকসিনিয়া বললে—আমি

তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলাম ; আর তুমি ?—একটিও আমি কইতে পারি না. তারপর তুমি—ভয় নেই, তোমার কাছে চাইতে আসি নি।

তখন সে সত্যিই তাই ভাবছিল। কিন্তু মনের দিকে ছুটে আসবার বেলা ভেবেছে—আজকে ছাড়াছাড়ি নেই ; আর কথা আদায় করবোই। তাকে ছেড়ে আর কার সঙ্গে আমি থাকবো ? সেপাদের কথা মনে হয়েছে। জোর ক'রে মাথা ঝেঁকে আকসিনিয়া সেই কণ্টকিত কল্পনা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছে।

কনুইয়ে ভর ক'রে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল গ্রীগরী। থুক ক'রে মুখ থেকে চিবানো গোলাপী পাপড়িটা ফেলে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—তাহ'লে এইখানেই আমাদের ভালবাসার শেষ ?

আকসিনিয়া আঁতকে উঠ্‌লো—কি করে শেষ হল ?

গ্রীগরীর চোখের পানে চাইবার পর্য্যন্ত ভরসা হচ্ছিল না তার—কি ক'রে শেষ হ'ল বল ? কি কোরে ? গ্রীগরী মুখ ঘুরিয়ে রইলো।

বিশুষ্ক নিরস মৃত্তিকা থেকে একটা আর্দ্র গন্ধ আসছে। পবন সূর্য্যমুখীর সবুজ-পত্রের মধ্যে প্রলাপ বকে চলে গেল। মুহূর্তের জন্য একখণ্ড মেঘ সূর্য্যকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। প্রান্তরে গ্রামে এবং আকসিনিয়ার মনেও সেই কৃষ্ণমেঘের ছায়া পড়ল। গলায় শক্ত থাকলে ঘোড়া যেমন দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে গ্রীগরীও তেমনি ভাবে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল। তারপর মাটির উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে বল্লে—শোনো আকসিনিয়া ! ধীরে সুস্থে কথাটা শুরু করলে গ্রীগরী : একটা কথা আমি ভাবছি ! বাগানের ফটকের কাছে বামাকণ্ঠ ও গাড়ীর শব্দ শোনা গেল : ওঠ, টেকো ! ডাকটা আকসিনিয়ার এত কাছে মনে হ'ল যে সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। মাথা তুলে গ্রীগরী চাপা গলায় বললে—রুমালটা খুলে ফেল, না হ'লে দেখা যায়। ওরা হয় ত আমাদের এখনও দেখে নি।

আকসিনিয়া রুমালখানা খুলে রাখল। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে কৌতুকরত বাতাস অমনিই ছুটে এসে তার সোনালী কেশগুচ্ছের সঙ্গে অশোভন রঙ্গে মেতে উঠল। গাড়ীর শব্দ ক্রমে দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—দেখ আমি ভাবছি; গ্রীগরী আবার বলতে সুরু করল,—যা হ'য়ে গেছে তা আর ফেরান যাবে না। দোষারোপ ক'রে কোনও লাভ নেই! কিন্তু যে কোরেই হোক আমাদের বাঁচতে হবে তো!

একটা ফুলের ডাঁটা ভেঙে আকসিনিয়া অধীর আগ্রহে গ্রীগরীর কথা শুনতে লাগল। গ্রীগরীর দিকে তাকিয়ে দেখে তার দৃষ্টিভাব লেশহীন সুস্থির।

—আমি ভাবছি, এস আমরা এখানেই···

আকসিনিয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠল। দেহ আর মনে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে সে কথাটির সমাপ্তির জন্ম প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঠোঁট দুখানি ভয় ও অধীর আগ্রহে উৎসুক হ'য়ে উঠল। মুখ শুকিয়ে এল। নাসা প্রসারিত হল। ভাবলে গ্রীগর হয় ত বল... ···এ ব্যাপারটার একটা শেষ ক'রে ফেলি;—তুমি স্তেপানকে ছেড়ে চলে এস। কিন্তু হায়! দু'একবার ঠোঁট চুষে গ্রীগরী বলে ব...—এ ব্যাপারটার এইখানেই যবনিকা ফেলে দিই, কি বলো?

আকসিনিয়া খোঁচা খেয়ে উঠে দাঁড়াল! ... কথা না বলে সূর্য্যমুখীর হরিৎ-নীর্ব ফাঁক ক'রে সে সোজা ফটকের দিকে এল। সন্ত্রস্ত ভাবে গ্রীগরী ডাকল—আকসিনিয়া। আকসিনিয়া বধির! সাড়া দিল ফটকের কর্কশ শব্দ।

পাছে লাল ফিতেটা দেখা যায় এই ভয়ে টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে গ্রীগরী আকসিনিয়ার পানে চেয়ে রইল। কিন্তু যাকে দেখছে সে ত আকসিনিয়া নয়! তার স্বাভাবিক ব্রীড়া-চঞ্চল দোলায়িত চলনভঙ্গী কোথায়? নাঃ, এ আর কেউ। সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিদেশিনী কেউ হবে।

রাই কেটে গোলায় তুলতে না তুলতেই গম পেকে উঠল। কর্দম-সিক্ত প্রান্তর পাটল পাতায় পরিপূর্ণ। কোন কোনটা আবার বটে নলের মত হয়ে গেছে। ডাঁটাগুলি শুষ্কপ্রায়। ফসল ভালই হয়েছে। পল্লীর আবালবৃদ্ধ-বনিতার আনন্দদীপ্ত মুখে ঐ এক কথা। মঞ্জরিগুলিতে শস্য বেশ ভারী এবং বড় বড় হয়েছে। কিন্তু বসন্ত কালে কিছুদিন অনাবৃষ্টির জন্য ডাঁটাগুলি তেমন বাড়তে পারে নি। খড় দিয়ে কোন কাজই হবে না।

ইলিনীচনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে প্যান্তেলিমন ঠিক করল যে কোরশুনফ বুড়ো সম্বন্ধে রাজি হয় তবে আগষ্ট মাস পর্যান্ত বিয়ে স্থগিত থাকবে। জবাব আনবার জন্য কোরশুনফের কাছে এখনও সে যেতে পারে নি। ফসলের হাঙ্গামা সর্বাগ্রে মিটাতে হবে তো! তা'র পর আর সব। তা ছাড়া সুবিধামত একটা ছুটীর দিনও পাচ্ছে না।

শুক্রবারে মেলেখফরা ফসল কাটা আরম্ভ করে। প্যান্তেলিমন একখানা ওয়াগন খুলে কাঠামোটাকে ফসল বয়ে আনবার মত করে রাখল। গিয়োতর আর গ্রীগরী কাটবার জন্য চলল মাঠে। গিয়োতর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল; গ্রীগরী পায়ে হেঁটে পিছু পিছু চলল। আজ গ্রীগরীকে দেখে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে। তার চিবুকের তলায় একখণ্ড মাংস ঈষৎ কাঁপছে। এর অর্থ গিয়োতর বেশ ভাল ভাবেই জানে। ক্রুদ্ধ রোষে গ্রীগরী গড়গড় করছে। একটু কিছু বললেই ঝগড়া সুরু হয়ে যাবে। তবু গিয়োতর লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ক্রোধের ইন্ধন যোগাবার প্রলোভন কৌতূহল নিয়ে সে বলল—সত্যি বলছি গ্রীগরী, মেয়েটি নিজে আমাকে বলেছে।

—বলুক না তাতে কি হয়েছে! কাটা কাটা ভাবে গ্রীগরী উত্তর করল।

—বললে আমি যখন সহর থেকে আসছিলাম, মেলেখফদের ওই পূর্বমুখী ঝোঁপের কাছে কথার শব্দ পেলাম।

—পিয়োতর, এখনও থাম বলছি!

—হাঁ, কথা শুনলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি…

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গ্রীগরী তাকে শাসিয়ে বললে—ভাল হবে না পিয়োতর! এখনও থাম বলছি!

—আচ্ছা লোক তো? কথাটা শেষ করতে দে।

—এখনও বলছি থাম না হলে ঘুসোঘুসি হবে কিন্তু!

ভুরু টান করে পিয়োতর ঘাড় ফিরিয়ে আবার বললে—বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি প্রেমিকযুগল আলিঙ্গনাবদ্ধ আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কারা? সে বললে—আর কে? তোমার ভাই আর আকসিনিয়া! আমি বললাম…

ফসল কাটবার যন্ত্রটার পেছন থেকে পিচ্‌ফর্কটা নিয়ে গ্রীগরী পিয়োতরের দিকে লাফিয়ে এগুলো। রাশ ছেড়ে দিয়ে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পিয়োতর বললে: দেখ, শুয়োরের কাণ্ড দেখ! এতেই ক্ষেপে গেছে। মুখের চেহারা কেমন হয়েছে ছাখো না!

নেকড়ের মত দাঁত খিচিয়ে গ্রীগরী পিচফর্কটা ছুঁড়ে মারল। পিয়োতর উপুড় হয়ে পড়তেই সেটা তার পিঠের ওপর দিকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মাটিতে পুঁতে বসল; ভীত ঘোড়াটার বল্গা ধরে পিয়োতর বললে: লাগলে মরে যেতাম না! জানোয়ার কোথাকার!

—হাঁ মারবার জন্তই ত ছুঁড়েছিলাম।

—হুঁ মারবার জন্তই ছুঁড়েছিলাম! গাধা কোথাকার। আচ্ছা বাপ্‌কা বেটাই হয়েছিস!

বাঁট ধরে পিচফর্কটা টেনে তুলে গ্রীগরী আবার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রে পিয়োত্তর বললে: দে আমার হাতে পিচফর্কটা দে! ঐ হাতে রাশ ধরে গ্রীগরীর হাত থেকে উল্টো ভাবে পিচফর্কটা নিয়ে বাঁটটা দিয়েই গ্রীগরীর মেরুদণ্ডের উপর সপাং ক'রে মারলে এক ঘা। গ্রীগরী লাফ মেরে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তার পানে চেয়ে পিয়োত্তর বললে: এই এক ঘাতেই হবে!

সামান্য কিছু পরে দুজনেই বসে সিগ্রেট ধরালো। চোখাচোখি হতেই উভয়েই হো হো ক'রে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ভিন্নপথে বাড়ী যাবার বেলা খৃস্তোনিয়ার স্ত্রী এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখে গেল। গাড়ী ভর্তি রাইয়ের পাঁজার উপর কোন মতে আঙুলে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দেখে গ্রীগরী সক্রোধে পিচফর্কটা ছুঁড়েছে। ফলাফল ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ওদের গাড়ীটা মাঝখানে ছিলো তাই ভাল ক'রে ওপাশের ব্যাপারটা দেখা গেল না। কিন্তু সংবাদটা পান্তেলিমনের কাছে না দিতে পারলেও স্থির থাকা যায় না। গাঁয়ে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে বললে—এই ক্লিমোভ্‌না, মাগ্‌গির তুই যা পান্তেলিমনের কাছে। তার্তার বাঁধের কাছে তার ছেলে দুটো পিচফর্ক নিয়ে মারামারি ক'রে শেষ হ'ল। গ্রীগরীটা ফর্ক দিয়ে পিয়োত্তরের পেটে মেরেছে এক ঘা; পিয়োত্তরও দিয়েছে ভাল করে। রক্তে রক্তাকার হয়ে গেছে!

ভ্রাতৃদ্বয় ততক্ষণে ফসল কাটতে সুরু ক'রে দিয়েছে। পিয়োত্তর ক্লান্ত ঘোড়া দুটোকে অকথ্য গালিবর্ষণ করেছে; আর গ্রীগরী ফর্ক দিয়ে কাটা শস্যগুলি গুছিয়ে পাঁজা ক'রে রাখছে। মাঠ জুড়ে ফসল কাটা চলেছে। সর্বত্রই শস্যের পাঁজা আর ফসল কাটা যন্ত্রের কর্কশ শব্দ। চালকদের নকল ক'রে পাহাড়ে ইঁদুরগুলি গর্তের ভেতর থেকে শিস্‌ দিচ্ছে।

—আর ছ'টান কেটেই তামাক খেয়ে দেবো।—যন্ত্রের কর্কশ শব্দ ছাপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে পিয়োত্তর বললে। শ্রীগরী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ঘেমে সে এক-শা হয়ে গেছে। একসঙ্গে বেশী ক'রে শস তুলে সে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার চেষ্টা করছে। ঘোড়া ছটো থামিয়ে ছজাই বসল। হাতে চোখ আড়াল ক'রে পিয়োত্তর বললে—কে যেন খুব জোর ঘোড়ায় চড়ে আসছে গ্রীশকা!

স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে সবিস্ময়ে গ্রীগরী বলে—বাবা নাকি?

—পাগল নাকি? কি চড়ে আসবেন তিনি? ছটো ঘোড়াই তো আমরা নিয়ে এসেছি।

—আমি বললাম, দেখ নিশ্চয়ই বাবা!

অশ্বারোহী ক্রমে নিকটবর্তী হ'তে লাগল। ছজনেই সে দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই তাকে চেনা গেল। উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে পিয়োত্তর বললে—সত্যিই তো!

—বাড়ীতে একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়!

এ শঙ্কা দুজনের মনেই ছিল কিন্তু গ্রীগরী বলে ফেললে।

শ'খানেক হাত দূরে অশ্বের গতি সংযত ক'রে মাথার ওপর চাবুকটা ঘুরিয়ে পান্তেলিমন ক্রোধোন্মত্ত স্বরে ধমকে বললে—আজ ছটোকেই শেষ করবো, খান্‌কির ছেলে কোথাকার!

পিতার এই শাসানিতে পিয়োত্তর স্তম্ভিত হয়ে গেল; বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে গ্রীগরীর দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল—হোলো কি গ্রীশকা!

—শীগ্‌গির গাড়ীটার ওপাশে চল! আজ বরাতে দুর্ভোগ আছে! দেখেছিস্ চাবুক, তলায় গিয়ে সারতে না সারতেই চাব্‌কে পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দেবে। হেসে গ্রীগরী গাড়ীটা ঠেলে মাঝখানে এনে রাখলো।

কাটা শস্যের ওপর দিয়ে ঘোড়াটা দাবিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। নগ্ন পিঠে

চড়েই প্যান্তেলিমন এগেছিল। ঘোড়াটার পেটের উপর পা ঠুকে জিজ্ঞেস করলে—কি হচ্ছিল এখানে?

সত্রাসে চাবুকটার দিকে চেয়ে পিয়োত্তর বললে—দেখছোই তো ফসল কাটছি।

—কর্ক দিয়ে মেরেছে কে? কিসের জন্য মারামারি করছিলি?

পিতার দিকে পেছন ফিরে গ্রীগরী আকাশের দিকে চেয়ে দেখ শুনছিল।

—কিসের কর্ক? কে মারামারি করছিল?

অভিনীত বিস্ময়ে বাবার দিকে চেয়ে পিয়োত্তর জিজ্ঞাসা করল।

—কেন ইয়ে বললে যে! ছুটে এসে বললে—তোমার ছেলেরা কর্ক নিয়ে মারামারি করে মরছে দেখগে। ও মিথ্যা কথা বলেছে?

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে মাথা নেড়ে প্যান্তেলিমন প্রশ্ন করল—আমি একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে ছুটে এলাম।

—কে বলেছে তোমাকে? পিয়োত্তর জিজ্ঞাসা করল।

—ঐ ক্লিমোভ্‌নাটা!

—মিথ্যে কথা বাবা! গাড়ীতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছে।

—দাঁড়া দেখাচ্ছি তাকে! হারামজাদিকে চাব্‌কে ঠাণ্ডা করব!

প্রাণপণে হাসি চেপে গ্রীগরী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। পিয়োত্তর প্যান্তেলিমনের কাছ থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফেরায় নি। প্রাণভরে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি ক'রে প্যান্তেলিমন পায়ের ঝাল মিটাল। তারপর কিছুটা ফসল কেটে ঘোড়ায় চড়ে আবার গ্রামে ফিরল। চাবুকটা মাটিতে পড়েছিল—মনে ক'রে নিয়ে আসতে পারে নি। পিয়োত্তর সেটাকে তুলে এভাবে ওভাবে পরীক্ষা ক'রে ভাইকে বললে—খুব বেঁচে গেছি গ্রীশকা! দেখছিস কি জিনিব! ভাল এক ঘা বসালে আর দেখতে হবে না! মুণ্ডুটি কেটে ব্যস্ দুভাগ!

—দশ—

অবস্থাপন্ন পরিবার বলে কোরশুনক্‌দের একটা খ্যাতি ছিল। তাতার-ভায়া গ্রামে তারাই নাকি সবচেয়ে পয়সাওয়ালা। হবেই বা না কেন? চার জোড়া ষাঁড়, ঘোড়া, ঘুড়ী, গনরটা গাই, আরও অনেক গৃহপালিত পশু, কয়েক শ' ভেড়ার পাল, এত সব আর কার আছে? তাছাড়া তাদের টিনের ঘর মোখভের ঘরের চাইতে এতটুকু খারাপ নয়! ছয় ছয়টা ঘর, আছে! উঠান নূতন দামী টালী দিয়ে বাঁধান; বাগানটাও প্রায় একর তিনেক। একটা লোকের আর কত চাই?

পান্তেলিমনও এসব জানত। কাজেই সম্বন্ধ করতে যেতে প্রথমে তার মন সরছিল না। মনে মনে শঙ্কা ছিল, না-বলে বস্‌তেও তো পারে! মেয়ের জন্ত গ্রীগরীর চাইতে সম্পন্ন বর খুঁজে নেওয়া কোরশুনকের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। এই সব ভেবেই কোরশুনকের করুণা ভিক্ষা করতে যাবার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। কিন্তু কামারে যেমন লোহাকে খুঁইয়ে দেয় ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ইলিনীচনাও তেমনি পান্তেলিমনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। স্ত্রীর হাত এড়ান আর সম্ভব হ'ল না। অনিচ্ছাসত্বেও আর একদিন তাকে জবাবটা শোনার জন্ত কোরশুনকের বাড়ী যেতে হ'ল। পথে পথে স্ত্রী গ্রীগরী এবং সারা দুনিয়ার সে মুণ্ডপাত করেছে।

এদিকে কোরশুনকের বাড়ীতে মহা গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। মেলেখভরা চলে যাবার পর নাতালিয়া বলে বসেছে, গ্রীগরী যদি তাকে ভালবাসে তা'হলে তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। কি বিপদ! বাবা রেগে বললে: এই এতদিনে একটা গো-মূর্খকে উনি

খুঁজে বার করেছেন! ফিঙ্গির মত কালো রঙ! না, ওসব হবে না! ওকে আমি জামাই করতে পারবো না!

নাতালিয়া কান্না শুরু ক'রে সলজ্জ কম্পিত স্বরে বললে—আমি আর কাউকেই চাই না বাবা। তা'হলে আমায় আপনি মঠে রেখে আসুন।

—জানিস্ রাস্তায় রাস্তায় টো টো ক'রে বেড়ান আর যে সব মেয়েদের স্বামী বিদেশে আছে তাদের পেছু নেওয়াই ওর কাজ?

—তা হোক্!

নাতালিয়া মিরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সন্তানের মধ্যে মিরণ ওকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসে। এতদিন শুধু এই কারণেই নাতালিয়ার বিয়ে হয়ে যায় নি। না হলে বহুদূর থেকে বেশ ভাল ঘরের ছেলেদের জন্য ওর সম্বন্ধ এসেছে; সবাই তারা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ধনেদী এবং নিষ্ঠাবান কজাক্। কিন্তু হ'লে কি হবে, দুলালী মেয়ের তার কোনটাই পছন্দসই হয় নি। প্রাণে প্রাণে গ্রীগরীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চাষ-আবাদের পর লক্ষ্য, তার কজাক সুলভ পারদর্শিতা মিরণের ভালই লাগত। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যেদিন গ্রীগরী ঘোড়দৌড়ে জিতেছে সেইদিন থেকেই তার পর মিরণের নজর ছিল। কিন্তু হ'লে কি হবে? মেয়েকে একটা গরীবের ঘরে দিতে কিছুতেই মন সরছিল না। তা'ছাড়া পাত্রটিও ইদানীং বেশ সুনাম কেনেন নি তো! রাত্রে শুয়ে স্ত্রী ফিস্‌ফিস্ ক'রে মিরণের তিলভরা লোমশ হাত বুলিয়ে বলেছে: ছেলেটি কঠোর পরিশ্রমী, দেখতে শুন্‌তে ভাল। তাছাড়া ওকে নাতালিয়ার খুব মনে ধরেছে।

শুকবক্ষ স্ত্রীর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে মিরণ বিরক্তির সুরে ধমকে বলেছে—হাঁ হাঁ, হয়েছে যাও! দেখতে শুন্‌তে ভাল! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ভাল লেগে থাকে জামাই করগে। তুর্কীদের কাছে মেয়ে দিয়ে আমি কুল খোয়াতে পারবো না।

আরও কিছুটা কাছে ঘেঁসে এসে স্বামীর রাগ শান্ত করবার জন্য তার হাত বুলাতে বুলাতে মারিয়া ফিস্ ফিস্ করে আবার বললে—ওদের ঘরে সবাই খাটিয়ে; তা'ছাড়া খেয়েপরেও তো বেশ ভালই আছে।

—যাও যাও সরো! গায়ের ওপর আস্‌ছো কি! হাত বুলিও না। আমাকে কি বাছুরওয়ালা গাই ঠাউরেছ নাকি? জানো তোমার নাতালিয়া কি মেয়ে? ব্যাটাছেলে দেখলেই ওর মাথা বিগড়ে যায়।

—রাগ করো না। মাথা ঠিক করে মেয়েটার কথা একবার ভাবো। এবারে একেবারে মিরণের লোমশ কানের কাছে এসে মারিয়া বললে। নিরুপায় হয়ে মিরণ দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে ঘুমের ভাণ করে নাক ডাকাতে আরম্ভ ক'রে দিল।

জবাব নেবার জন্য মেলেখফদের আগমনে কোরশুনফরা বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ল। প্রাতঃ-প্রার্থনার পরই তারা এসে হাজির। ইলিনীচনা গাড়ী থেকে নাম্‌বার বেলা ওয়াগনখানা উলটে যাবার উপক্রম হল; কিন্তু পান্তেলিমন চট ক'রে লাফিয়ে পড়তেই কেলেঙ্কারী হল না। জানালা দিয়ে ওদের দেখে বিরক্তির সুরে মিরণ বললে—ওরা আজ আবার এসেছে কি কলা করতে?

চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পান্তেলিমন ঘরে ঢুকে বললে—ভাল আছেন তো! নিজের স্বরের অশোভন উচ্চতার জন্য পান্তেলিমনের নিজের মনেই সঙ্কোচ হতে লাগল। কাজেই ব্যাপারটা ঢাকবার জন্য গোঁফের আধখানা মুখের মধ্যে নিয়ে মুদিত নয়নে ইকনটার সামনে অকারণ ক্রুশ করল।

—আসুন! বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে মিরণ বললে।

—ভগবানের কৃপায় আবহাওয়াটা বেশ ভালই আছে।

—হাঁ, এ রকম থাকবে কিছুদিন।

—লোকের কিন্তু খুব উপকার হবে।

—ও নিশ্চয়!

—হাঁ...আ।

—হুঁ...ওউ।

—তার পর মিরণ গ্রীগরিয়েভিচ্! কি ঠিক করলেন আপনারা? হবে, না হবে না?

মারিয়া তখন ঘরে ঢুকেছে; ওদের দেখেই এক গাল হেসে বললে—আসুন, আসুন, বসুন!

ইলিনীচনা তার পপলিনের কোটটা খস্‌খস্ ক'রে বসে পড়ল। টেবিলের ভর ক'রে মিরণ নীরবে বসে ছিল। ফ্রেঞ্চ ক্লথখানার এক প্রান্তে জার ও জারিৎসার ছবি; মাঝখানে সাদা টুপীপরা রাজকুমারী এবং জার নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচের ছবি। নীরবতা ভেঙে অবশেষে মিরণ বললে: দেখুন, আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো ঠিক করেছি। যৌতুকের ব্যাপারটা ঠিক ঠাক হয়ে গেলেই এ সম্বন্ধ হয়।

ঠিক এই মুহূর্তে ইলিনীচনা তার জ্যাকেটের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রকাণ্ড একখানা রুটি বার করে গন্ধ শুঁকে টেবিলের 'পর রাখল। নিশ্চয় ওর পিঠের কাছে ছিল। পান্তেলিমন কি ভেবে ক্রুশ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার বিশুষ্ক আঙুলগুলি সুষ্ঠু ভাবে ক্রুশের ভঙ্গী শেষ না করে নীল ওভারকোটের পকেটে ঢুকে বেহায়ার মত একটি লাল মোড়কের বোতল টেনে বার করল। সোৎসাহে চোখে টিপ মেরে পান্তেলিমন মিরণের তিলভরা মুখের পানে চেয়ে সাদরে বোতলটির তলায় কয়েকটি চাপড় দিলে।

—বন্ধুগণ, আসুন এইবারে ভগবানের কাছে আমরা একবার প্রার্থনা জানাই। তারপর ছেলে-মেয়ের মঙ্গলার্থে একটু পান ক'রে পরে দেনা-পাওনার কথা ঠিক ক'রে ফেলবো। কি বলেন?

পান্তেলিমনের এই নির্দোষ প্রস্তাবে অ-রাজী হবার কোনই কারণ ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিরণের কটা সোনালী দাড়ি পান্তেলি-মনের কোঁকড়ান দাড়ির সঙ্গে প্রায় মিশে গেল। এই ভাবে বসে তারা বিয়ের যৌতুকাদির কথা ঠিক করতে লাগল। কর্কশকণ্ঠে পান্তেলিমন বললে: দেখুন আপনি যা চাইছেন, আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন তো বেয়াই, গোলোশ শুদ্ধ গেইটার, ফারকোট, তার পর পশমের পোষাক, রেশমী রুমাল, এত সব দিতে হ'লে আমাকে ফতুর হ'তে হবে!

ভোদকা আর নুন-মাখান শশার র'সে ক্রেপক্লথ খানা ভিজে একশা হয়ে গেল। মিরণ ঘাড় নীচু ক'রে তাকাতেই ছবি ক'খানার শিরোনামার উপর চোখ পড়ল: রুশ স্বৈরশাসকগণ। মিরণ নীচের দিকে তাকাল: 'মহামান্য সম্রাট নিকোলাই' এই কথাটিই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; বাকী লেখাটুকু আলুর খোসায় চাপা। একদৃষ্টে সে ছবিখানির দিকে চেয়ে রইল। শূন্য একটা ভোদকার বোতল চাপা পড়ে সম্রাটের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে মিরণ তার দামী উর্দিটার কোমরের কাছের ষ্টাইল বুঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু শশার বিচিতে বেল্টটা চাপা পড়েছে। কন্যা পরি-বেষ্টিতা সাম্রাজ্ঞীর দৃষ্টিতে এক গর্বিত আত্মতুষ্টিরভাব। এই গর্বিত প্রসন্ন দৃষ্টি দেখে মিরণের রাগ হল—চোখ ফেটে প্রায় জল বেরুবার উপক্রম হল: বড্ড দেমাক তোমার। আচ্ছা, মেয়ে বিয়ে দেবার সময় আসুক—তখন টের পাবে। তখন আমিও অমনি করে তোমার দিকে চেয়ে থাকবো।

—এগুলি আপনার মেয়েকে, এখন তো আমাদেরও বলতে পারি, আমাদের বউকে যদি দিতে হয় তা'হলে হাটে গিয়ে একটা গরু বিক্রী করা ছাড়া আর উপায় দেখি না!—অশ্রুসজল ঝাপসা চোখ তুলে জড়িত কণ্ঠে পান্তেলিমন বললে।

—কেন তাতে কি আপনার আপত্তি আছে নাকি? টেবিল ঠুকে মিরণ বললে।

—না আপত্তির কোন কথা নয় তবে…

—আপত্তি আছে কি না স্পষ্ট বলুন।

—দেখুন……

—যদি আপনি খুঁত খুঁত করেন তো চুলোয় যাক্ সব!

মিরণের উত্তেজিত হস্তের ধাক্কা লেগে গ্লাস ক'টা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

—গোয়াল থেকে একটা গাই বেচতে হবে? নিরুপায়ের মত হতাশ কণ্ঠে পান্তেলিমন বললে।

—কিন্তু বিয়েতে যৌতুক দিতেই হবে তো! নাতালিয়ার নিজের একটা যৌতুকের বাক্স আছে! যদি তাকে নিতে হয় তাহলে আমার কথা মনে রাখবেন। এ কজাকদের প্রথা। আগের কালেও এই প্রথাই ছিল। আর আমরা তা' এখনও মেনে চলি।

—তা ত' বুঝলাম!

—হাঁ মনে রাখবেন!

—আচ্ছা!

আবার হবু-বৈবাহিকদের শ্মশ্রু মিলিত হ'ল। পান্তেলিমন একটা শুঁটকো শশা খেতে খেতে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওপাশে হবু-বৈবাহিকাদ্বয় বাক্সের পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বসে বগ্‌বগ্‌ ক'রে উভয়েই উভয়ের কান ঝালা-পালা ক'রে তুলেছে। আনন্দে ইলিনীচনার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। মাত্রাহীন ভোদকা পানে মারিয়ার মুখ বিবর্ণ, শীতকালের ঘাসপাতির মত পাংশুটে।

—এমন একটি জোড়া সংসারে দেখবেন না আপনি। মেয়ে আমার সব কথা শোনে। যা বলবেন, না করবে না।

—আমিও পাজীটাকে হাজারবার তাই বলেছি। বাধা দিয়ে ইলিনীচনা বললে;—একদিন রবিবার সে বাইরে যাচ্ছিল, ডেকে বললাম, কবে তোর এই বদখেয়াল যাবে? এই বুড়ো বয়সে কতকাল আর আমায় এই কেলেঙ্কারী সইতে হবে? ওই স্তেপান একদিন তোমার ফাজলামি বার ক'রে দেবে।

কবাট ফাঁক ক'রে মিচকা একদৃষ্টে ভেতরে চেয়ে ছিল। নাতালিয়ার ছোট বোন দুটি ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কি যেন বলাবলি করছিল। নাতালিয়া বাবার শোবার ঘরে বসে জ্যাকেটের হাতায় চোখ মুছছে। অজানা নতুন জীবনের শঙ্কিত অনুভূতি তাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে।

বাইরের ঘরে ভোদকার তৃতীয় বোতল শেষ হয়ে ঠিক হ'ল পয়লা আগষ্ট বর-কনের মিলন হবে।

বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনে কোরশুনকের গৃহ গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। কনের অন্তর্বাস কয়েক দিনের মধ্যেই চট ক'রে সেলাই করা হয়ে গেল। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নাতালিয়া রোজ সন্ধ্যায় বসে বরের দস্তানা ও ভেড়ার লোমের রুমাল বুনত। মারিয়া একজন সীবন-নিপুনা স্ত্রীলোক নিয়োগ করে তার সাহায্যে সন্ধ্যে অবধি সেলাইয়ের কলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকত। মাঠ থেকে বাবা এবং মজুরদের সঙ্গে বাড়ী এসে হাত মুখ না ধুয়েই মিচকা ছুটত নাতালিয়ার কাছে। বোনকে ক্ষেপিয়ে কি আনন্দই যে সে পেত!

—বুনছিস্‌? রুমালখানা নাড়া চাড়া ক'রে সংক্ষেপে সে জিজ্ঞাসা করত।

—হাঁ, কেন কি হয়েছে তাতে?

—কেন? আরে বোকা! এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা তো দূরের কথা, দেখবি ও তোর নাক চেপ্টে দেবে।

।

—কেন ?

—হুঁ, গ্রীগরীকে আর আমি চিনিনে ? বহুকাল ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ! সে ঐ রকম রগচটা মেজাজের। কোন কিছু না বলে দেখবি হাঁ ক'রে কাম্‌ড়ে দেবে।

—বাজে মিথ্যে কথা বলবিনি মিচকা ! ভাবছিস্ একা তুইই চিনিস্ আর আমি চিনিনে !

—আমি তোর থেকে ঢের বেশী চিনি। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম।

রাগে নাতালিয়ার গলা বন্ধ হয়ে আসত। কোনমতে অশ্রু সম্বরণ ক'রে সে রুমালখানার ওপর আরও ঝুঁকে বসত।

—ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু কি বিশ্রী রোগ আছে ওর জানিস্ ?—যক্ষ্মা ! যক্ষ্মা ! তোর একেবারেই কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই নাতালিয়া ! এখনও বলি বিয়েতে আপত্তি কর, যদি বাঁচতে চাস। বল, এখুনি ঘোড়ায় চড়ে আমি তাদের বলে আসি গে।

দাদার এই অত্যাচার থেকে সে যাত্রা ঠাকুর্দা গ্রীশকাই তাকে বাঁচালে। লাঠি ভর ক'রে ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে এসে মিচকার পেছনে খোঁচা মেরে বৃদ্ধ বল্লে—এই, তুই এখানে কি চাস্ ?

—আমি নাতালিয়াকে দেখতে এসেছিলাম একবার ! সানুনয়ে অপরাধীর মত মিচ্‌কা উত্তর দেয়।

—দেখতে এসেছিলাম ! যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে পড় ! কুইক্ মার্চ্চ !

গ্রীশকা দাদু আজ পুরো উনসত্তরটি বছর পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ১৮৭৭ সালে তুর্কী অভিযানের সময়ে ইনি জেনারেল গুর্কোর আর্দ্দালী ছিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী। কি কারণে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে তাকে আবার নিজের রেজিমেন্টে ফিরে যেতে হয়। তবু প্লেফ্‌না এবং রোজিৎস অবরোধের সময়ে তার

অসীম বীরত্বের জন্য তাকে দুটো ক্রশ এবং সেণ্টজর্জের মেডেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা, নিষ্কলঙ্ক সাধুতা এবং উদার আতিথেয়তার গুণে গ্রামের সকলেই গ্রীশকাকে সম্মান করত। অতীত স্মৃতির চর্বিত-চর্বণ ক'রে স্বচ্ছন্দে পুত্রের গৃহে বৃদ্ধ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরমায়ুটুকু কাটিয়ে দিচ্ছে। গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধ যখন প্রাঙ্গণে চুপ ক'রে বসে ঝিমুতেন, পেছন থেকে নাতালিয়া এসে জিজ্ঞাসা করত—মরতে কি তোমার ভয় করে দাদু?

—তাকে অভ্যর্থনার করবার জন্য যে আমি উৎসুক হয়ে আছি দিদি! অনেকদিন তো বাঁচলাম! সাধ কামনাও অপূরণ নেই—জারের সেবা করতে পেরেছি, প্রাণভরে ভোদকা খাবার সুযোগও জুটেছে। ম্লান হাসি হেসে বৃদ্ধ উত্তর করত।

নাতালিয়া চলে গেলে তেমনি হেঁট মাথায় বসে বৃদ্ধ নীরবে লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়তেন।

নাতালিয়ার বিয়েব সংবাদে বাইরে কিছু না বললেও ভেতরে বৃদ্ধ রেগে আগুন হয়েছিলেন। খাবার টেবিলে ভাল ভাল খাবারটা নাতালিয়া তাকেই দিত। জামা কাপড় সাফ করে দেওয়া, মোজা পাজামা শার্ট প্রভৃতি বুনে দেওয়া, সবই তো নাতালিয়া ক'রে দিত। কাজেই সংবাদটা যেদিন বৃদ্ধের কানে পৌছাল, তার পর থেকে দিনকয়েক বৃদ্ধ বাঁকা চোখে ছাড়া নাতালিয়ার দিকে তাকান নি।

—মেলেখফ্‌রা বেশ নামকরা কজাক। আমি ঐ প্রকোফীর রেজিমেণ্টেই ছিলাম। কিন্তু তার নাতিগুলো কেমন কে জানে?

—খুব খারাপ নয় বাবা! মিরণ উত্তর দেয়।

—না, ঐ গ্রীগরী ছোকরাটা ভাল না। মানীর মান রাখতে জানে না। সেদিন গীর্জা থেকে ফিরবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ছিল কিন্তু একটা কথা পর্যন্ত না বলে চলে গেল। আজকাল আর বৃদ্ধদের

তেমন সম্মান কেউ করে না! তা হোক গে, নাতালিয়ার যদি তাকে পছন্দ হয়।...

বৃদ্ধ এ সম্বন্ধের মধ্যে একেবারেই ছিলেন না। একদিন রান্নাঘর থেকে এসে টেবিলের পাশে বসলেন, গেলাস দুয়েক ভোদকা শেষ ক'রে নেশা হয়েছে বুঝে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। দিন দুয়েক নাতালিয়ার ভাব গতি লক্ষ্য ক'রে যখন বুঝলেন সত্যিই সে খুশী, তখন কাছে ডেকে বৃদ্ধ আদর করে বললেন: নাতালিয়া, তুই খুব খুশী হয়েছিস, না দিদি?

—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না দাদু! কানে কানে নাতালিয়া বলে।

—ভাল, ভাল, ভগবান তোর মঙ্গল করুন। ভগবান যেন তোকে ...দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পৌত্রীকে কোলের কাছে টেনে, বিষাদ-কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে: আমি ভাবতে পারিনি দিদি, আমি বেঁচে থাকতে তুই আমাকে ছেড়ে যাবি! তোকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে দিদি!

আড়ি পেতে মিচ্‌কা সবই শুনছিল। বৃদ্ধের কথা শুনে বলে উঠল—তুমি ত আরো একশো বছর বাঁচতে পারো। ততদিন ও বিয়ে করবে না! আচ্ছা লোক তো!

ক্রোধে বৃদ্ধের মুখ চোখ প্রায় লাল হয়ে উঠল; হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে বল্লেন: দূর হ' খান্‌কির বাচ্চা! পালা ভাগ পাজী কোথাকার! কে তোকে এসব শুনতে ডেকেছে রে?

এসাম্পসনের দিনে গ্রীগরী ভাবী বধূকে দেখতে এল। সুসজ্জিত একটি কক্ষে একটা গোলটেবিলের পাশে তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে। সহসা মেয়ের একদল বান্ধবী এসে তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের সঙ্গে কিছুকাল সূর্য্যমুখীর বীজ আর বাদাম ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে গ্রীগরী বাড়ী ফিরল।

নাতালিয়া তাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাল। আস্তাবলে ঘোড়াটা

বাঁধা ছিল। বুকের কাছে হাত দিয়ে নাতালিয়া একটি নরম ছোট্ট মোড়ক বার করল। তারপর সলজ্জ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মোড়কটি গ্রীগরীর হাতে দিল। নেতালিয়ার বক্ষের স্পর্শে উষ্ণ মোড়কটি হাতে নিয়ে গ্রীগরী জিজ্ঞেস্ করল : এর মধ্যে কি আছে?

সপ্রতিভ নাতালিয়া বলে—খুলে দেখো···তোমার জন্য একটা ভাল তামাক রাখবার পাউস তৈরী করেছি! চুমু খাবার লোভে গ্রীগরী তাকে বুকের কাছে আনবার জন্য টান দেয়; পিঠ বাঁকিয়ে দুহাতে গ্রীগরীর বুক ঠেলে ধরে কোনমতে নাতালিয়া আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগল। লজ্জায় তার কপোলখানি লাল হয়ে উঠল।

—ও কি?

শঙ্কিত দৃষ্টিতে জানালার দিকে চেয়ে চাপা গলায় নাতালিয়া উত্তর করে—ওরা দেখবে।

—দেখুক না।

—না, আমার লজ্জা করে।

গ্রীগরী ঘোড়ায় চড়বার সময় নাতালিয়া বল্গা ধরেছিল। ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে রেকাবে পা রেখে একলাফে গ্রীগরী ঠিক হয়ে জিনের উপর উঠে বসল। সদর খুলে দিতেই ঠকাঠক্ শব্দে গ্রীগরীর ঘোড়া বালি উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল্। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নাতালিয়া। মনে মনে হিসেব করলে—আর মাত্র এগার দিন। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে তার অধরপ্রান্তে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

—এগারো—

মৃত্তিকার কঠিন কারাগার ভেদ করে সবুজ বর্শা ফলকের মত গমের অঙ্কুর আকাশের তলে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কয়েক হপ্তা পরে ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়কাক উড়ে পড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাটির বক্ষ নিঙ্ড়ে রস পান করে সে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে ; পুষ্ট-পুষ্ট মঞ্জরীর রসাল বুক ক্রমে পরিস্ফীত হয়ে পড়ে—ফুল ফোটে। সোণালী শস্যের কিশলয়ে প্রান্তর ভরে যায়। মাঠে গিয়ে চাষী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে। কিন্তু মনে শান্তি নেই। যেদিকেই তাকায় গরুর পাল ক্ষেতে ঢুকে তার সোণার ফসল দলে মাড়িয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখে গেছে। এখানে কতকগুলি দলিত গাছ মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে ; ওখানে কতকগুলি আধ-ভাঙ্গা ডাঁটা একটা অন্যটার পর কাত হয়ে পড়ে আছে। ক্ষোভে, দুঃখে, অসহায় চাষী হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে।

আকসিনিয়ার মনের অবস্থাও আজকাল অনেকটা ঐ ধাঁচের। গ্রীগরী তার কাঁচা চামড়ার ভারী বুটের কঠিন আঘাতে আকসিনিয়ার সোণার স্বপন নির্মমভাবে দলিত মথিত করে চুরমার করে দিয়ে গেছে। তাকে কলঙ্কিত করে তার স্বপ্নসাধ তচনচ করে অবাধে চলে গেছে। ব্যাস ঐ পর্য্যন্তই।

মেলেখফদের সূর্য্যমুখী-কুঞ্জ থেকে আসিনিয়া সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরেছে। এক অনাদৃত জঙ্গলাকীর্ণ ফার্ম-প্রাঙ্গণের সঙ্গে আজ তার এতটুকু প্রভেদ নেই। রুমালের প্রান্ত দাঁতে চিবোতে চিবোতে বিভ্রান্তের মত সে হেঁটে চলেছে। রুদ্ধ কান্নার আবেগে শ্বাস রোধ হয়ে যাবার উপক্রম। ঘরে ঢুকেই সে মেজেতে সটান লুটিয়ে পড়ল। অবরুদ্ধ অশ্রু বুকফাটা

যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ শূন্যতা একযোগে তার মাথার মধ্যে তীব্র কশাঘাত করছে! কিন্তু এ ঝড়ও স্বল্প স্থায়ী। উদ্বেলিত বুককাটা যন্ত্রণার তরঙ্গ ক্লান্ত হয়ে ক্রমে অন্তরের অন্তস্তলে বাসা বাঁধল।

দলিত শস্য-শীর্ষ আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। রৌদ্র ও শিশিরের সঞ্জীবনী পরশে আবার তার ভাঙা বুক জোড়া লাগে। প্রথমে কাঁধে বোঝা চাপানো মুটের মত বাঁকা হয়ে থাকে; তার পরই আবার মাথা চাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সূর্য্যকিরণে আবার তাদের উন্নত-শির ঝলমল করে। পবনস্পর্শে পুলক রোমাঞ্চে দেহে জাগে শিহরণ।

নিশীথ রাত্রে স্বামীকে সোহাগ করতে গিয়ে আকসিনিয়ার আর একজনকে মনে পড়ে। ঘৃণার সঙ্গে তার অন্তরে এক দুর্বার প্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মনে সে নূতন কল্পনার ছবি আঁকত; কিন্তু সেই অতীত কলঙ্কের কালিমা যে কিছুতেই মোছা যায় না! খোঁচা দিয়ে সেই বিষক্ষতকে জাগিয়ে তোলো। সারা মন টন্‌টন্ করে ওঠে। না, নাতালিয়ার কাছ থেকে গ্রীগরীকে ছিনিয়ে সে নেবেই! সেই সুখ-স্বপ্নে বিভোর অবুঝ বালিকা, প্রেমের আনন্দ বা জ্বালা যে আজো বোঝেনি তার কাছ থেকে?—তা হোক! এ আকসিনিয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প। ডান হাতের উপর স্তেপানের মাথা রেখে, সারা রাত জেগে আকসিনিয়া কি উপায়ে সফলকাম হবে তাই ভাবে। ভাবতে গিয়ে কল্পনার থেই হারিয়ে যায়। কিন্তু একটা জিনিষ তার কাছে ধ্রুবতারার মতই স্থির এবং অচঞ্চল—গ্রীগরীকে সারা দুনিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তার প্রেম দিয়ে সে ঢেকে রাখবে। গ্রীগরী যে-ভাবে তাকে অধিকার করেছিল তা' থেকে কঠিনতর বন্ধনে গ্রীগরীকে সে বেঁধে রাখবেই।

দিনের বেলা সংসারের নানা কাজের মধ্যে আকসিনিয়া আনমনা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গ্রীগরীর সঙ্গে আজকাল দেখাও হয়। চোখাচোখি হতেই আকসিনিয়া বিবর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে গ্রীগরীর

জন্ত লোলুপ কামনা থাকলেও কৃত্রিম তাচ্ছিল্যভরে নির্লজ্জের মত তার কালো চোখের পানে চেয়ে গর্বোন্নত শিরে আকসিনিয়া চলে যায়।

আকসিনিয়ার সঙ্গে প্রতি সাক্ষাতের পরই গ্রীগরীও তাকে পাবার জন্ত অধিকতর উৎসুক হয়ে ওঠে। অকারণে সে চটে-মটে অস্থির হয়। ঝাল ঝাড়ে দুন্যা এবং মায়ের উপর। কিন্তু প্রায়ই সে টুপী হাতে করে পেছনের উঠানের ঝোঁপটার কাছে গিয়ে জঙ্গল কাটতে থাকে যে পর্য্যন্ত না ঘেমে-চুমে অস্থির হয়ে পড়ে।

পুত্রের ভাবসাব দেখে পান্তেলিমন রাগে গড়গড় করে বলে—পাজি বজ্জাত কোথাকার! রোজ উনি ঝোঁপ সাফ করতে যান! দাঁড়া, বিয়েটা হয়ে যাক্, দেখি কত তুই ঝোঁপ সাফ্ করতে পারিস্! তখন, উহুঁ, ও মুখোও হবেন না!

—বারো—

কনে আন্‌বার জন্ত চারিখানা সুসজ্জিত জুড়ী গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়শীরা অনেকেই মেলেখফের প্রাঙ্গণে গাড়ীর চার পাশে ভীড় করে উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। কালো একটা ফ্রককোট এবং নীল সিটের পাজামা পড়ে পিয়োতর ব্যস্ত-সমস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। বাঁ হাতে দুখানা সাদা রুমালও বাঁধা আছে। সে যে আজ বরকর্তা! তার গোধুম রঙের গালপাট্টার তলায় খুসির হাসি কায়েমী ভাবে লেগে আছে।

—লজ্জা করিস নি গ্রীগরী, জোয়ান মোরগের মত মাথা খাড়া করে রাখ! ভাইকে সম্বোধন করে সোৎসাহে পিয়োতর বলে।

উইলো গাছের কচি শাখায় মত তন্বী ও নমনীয় দারিয়া একটা রাজ

বেগ্নী রঙের পশমী স্কার্ট পরেছে। স্বামীকে ঠেলা দিয়ে বল্লে—যাবার সময় হ'ল না!

—হাঁ, হাঁ, বস না গিয়ে তোমরা!—আদেশের সুরে পিয়োতর বললে, আমার গাড়ীতে যাবে বর আর জন পাঁচেক।

সবাই একে একে গাড়ীতে উঠল। ইলিনীচনা বিজয়িনীর মত ফটক খুলে দিতেই গড়গড় শব্দে সারিবদ্ধ গাড়ী ক'খানা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

পিয়োতর গ্রীগরীর পাশেই বসেছে। তাদের সাম্‌নে বসে দারিয়া লেসের রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানাল।

গাড়ীর চাকার দাগ দিয়ে চল্‌তে চলতে ঝাঁকানি লেগে মাঝে মাঝে তাদের সম্মিলিত ঐক্যতানে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে লাগল। প্রতিটি গাড়ীর পেছনে দেখা যাচ্ছে, কস্‌াকদের টুপীর লাল ফিতে, নীল-কালো উর্দ্দি, ফ্রক্‌কোট, এবং আস্তীনে বাঁধা সাদা রুমাল। মেয়েদের রুমালের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, ঝাঁকালো স্কার্ট এবং প্রতি গাড়ীর পশ্চাতে সূক্ষ্ম উর্দ্ধে-উৎক্ষিপ্ত ধূলি-রেখা এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করল।

গ্রীগরীর মেঁজ খুড়োতুতো ভাই আনিখি বরের গাড়ী চালাচ্ছে। আসন থেকে পড় পড় ভাবে ঘোড়ার লেজের উপর ঝুঁকে আনিখি শিস দিচ্ছে আর বন্‌ বন্‌ শব্দে চাবুক ঘুরাচ্ছে। চাবুকের শব্দে কান খাড়া করে স্বেদসিক্ত ঘোড়া ছুটো ছুট্‌ছে আরও জোরে। দ্বিতীয় গাড়ীর চালক গ্রীগরীর মামা ইলিয়া ওজোগিন্‌। সাম্‌নের গাড়ী কাটিয়ে যাবার জন্য ইলিয়া চীৎকার করে বললে—হেই, তাড়াতাড়ি। মামার পেছনে দুনিয়ার উৎফুল্ল মুখখানি গ্রীগরীর চোখে পড়ল। দাঁড়িয়ে তীব্র একটা শিস্‌ দিয়ে আনিখি চীৎকার করে বললে—না, না, এই—পারবে না আগে যেতে। তীর বেগে ঘোড়া ছুটো ছুটে চলল। সন্ত্রস্ত দারিয়া আনিখির পালিশ করা বুট জড়িয়ে ধরে বললে—এই! পড়ে যাবে! 'থামো!'—মামা পাশ থেকে বলে উঠলেন। কিন্তু ওদের

এই চেঁচামেচি চাকার নিরবচ্ছিন্ন তীব্র ঘড়ঘড় শব্দের মধ্যে ডুবে গেল।

মেয়ে-পুরুষ বোঝাই দু'খানি গাড়ী তখন পাশাপাশি চলেছে। লাল-নীল কাগজের ফুল দিয়ে ঘোড়াগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেশরের উপর এবং কপালের সামনে রঙীন কাগজের ফিতে ঝুলছে। পথের খোঁচ-খাঁচের মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ীতে খুব ঝাঁকানি লাগছে। ক্লান্ত ঘোড়াগুলির মুখ থেকে সাবানের মত ফেনা বেরুচ্ছে। আর কাগজের গোলাপগুলি তাদের আর্দ্র পিঠের উপর অবিরত দুলছে।

কোরশুনফের ফটকে বর-যাত্রীদের আগমন প্রতীক্ষায় বহু ফচ্‌কে ছোঁড়া পথের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। রাস্তায় বালি উড়তে দেখেই কয়েকজন ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—এসে গেছে। বর এসেছে!

ফটকের সাম্‌নে গাড়ী থামল। পিয়োতর গ্রীগরীর হাত ধরে সিঁড়ি অবধি নিয়ে গেল। আর সবাই পেছনে পেছনে আসতে লাগল। বারান্দা থেকে রান্নাঘরে যাবার দরজাটা বেশ করে খিল আঁটা ছিল। পিয়োতর কবাটে ধাক্কা মেরে বললে—ভগবান যীশু সদয় হউন। দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এলো—স্বস্তি। ঐ কথা বলে পিয়োতর তিনবার দরজায় ধাক্কা মারল; প্রতিবারেই ওপাশ থেকে একই উত্তর এলো। তখন পিয়োতর জিজ্ঞাসা করল—ভেতরে আস্‌তে পারি?

—নিশ্চয়!

কবাট খুলে গেল। নাতালিয়ার ধর্মমাতা কন্যার পিতামাতার প্রতিনিধি হিসাবে পিয়োতরকে অভ্যর্থনা করলেন। সবিনয়ে এক গ্লাস তীব্র টাট্‌কা ক্ভাস বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন—আসুন।

পিয়োতর মুহূর্ত মধ্যে পান-পাত্রটি শূন্য করে অভ্যাগতদের চাপা হাসির মধ্যে বললে—আপনার অভ্যর্থনা তো হয়ে গেল; দাঁড়ান, আমি আপনাকে অভ্যর্থনা এ ভাবে করব না।

বর-কর্তা এবং ধর্মমাতার এই কথা কাটাকাটির মধ্যে বিবাহের চুক্তি মত বর-যাত্রীদের তিন গ্লাস করে ভোদ্‌কা এনে দেওয়া হ'ল।

বিবাহের পোষাকে সজ্জিতা অবগুণ্ঠাবৃতা নাতালিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটি বোন দুই পাশে তাকে পাহারা দিচ্ছে। মারিয়ার হাতে পিন্ একটা; আর আগ্রিপিনার হাতে পোকার। ভোদ্‌কা পানে প্রমত্ত পিয়োতর তাদের সাম্‌নে গিয়ে অভিবাদন করে একটি পঞ্চাশ কোপেক্ মুদ্রা দিল।

টেবিল ঠুকে মারিয়া বললে—না, এত কমে কনে বিক্রী করা যায় না।

আবার পিয়োতর গ্লাশের মধ্যে একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখল।

নতমুখী নাতালিয়াকে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে ভগিনীদ্বয় সমস্বরে বলে উঠল—না, পাবেন না আপনি ওকে। দেবো না।

প্রত্যুত্তরে আপত্তি জানিয়ে পিয়োতর বললে—এর মানে কি? ওদের যা দেবার দিয়ে দিয়েছি; বেশীই দেওয়া হয়েছে।

—এই, যা সরে যা! মিরণ বললে। হেসে সে টেবিলের দিকে অগ্রসর হতেই কন্যা-যাত্রীরা নবাগতদের আসন করে দেবার জন্য যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

পিয়োতর একখানা আলোয়ানের প্রান্ত গ্রীগরীর হাতে গুঁজে দিয়ে এক লাফে বেঞ্চির উপর উঠে ওকে কনের কাছে নিয়ে গেল। নাতালিয়া ইকনের তলায় বসেছিল। ভীরু-কম্পিত হস্তে সে আলোয়ানের অপর প্রান্ত ধরল। গ্রীগরী তার পাশে বসল।

টেবিলের পাশে অভ্যাগতগণ তখন সকলেই হাত দিয়ে সিদ্ধ মুরগীর মাংস টুকরো করছে। পরে যে যার চুলে হাত মুছে ফেলল! আনিখি গাল ভরে মুরগীর মাংস তুলে চিবোতে শুরু করতেই থুতনি বেয়ে একটা জুড়ে চর্বির ধারা তার গলায় অবধি নামল।

বুভুক্ষ দৃষ্টিতে গ্রীগরী প্রথম নিজের খাবারের প্লেটের দিকে চাইল।

ক্ষিদের পেট গুলাচ্ছে। কিন্তু খাবার উপায় নেই। প্রথা অনুসারে বরফ'নের চামচ একখানা রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। গলা অন্ত করে অভ্যাগতগণ খেল। পুরুষের ঘামের রসুনের মত গন্ধ নারীদেহের সুবাসের সঙ্গে মিশে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে; সঙ্গে আছে স্কার্ট, ফ্রক-কোট এবং আলোয়ানের ন্যাপথালিনের গন্ধ।

আড়চোখে গ্রীগরী চাইল নাতালিয়ার পানে। হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়ল, নাতালিয়ার ওষ্ঠখানি বেশ পুরু এবং অধরের পর ঝুঁকে পড়েছে। ডান গালে ওপরের মাড়ির তলায় কটা একটা আঁচিলও আছে; তার উপর আবার দুগাছি সোনালী লোম। জিনিষটা তার কাছে নিতান্ত বিশ্রী বলে মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আকসিনিয়ার ছবি মানস-পটে ভেসে উঠল। মনে হ'ল কে যেন তার পিঠের উপর কতগুলি খস্‌খসে খড় চাপিয়ে দিয়েছে। সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল। সংযত ক্রোধে নীরবে সে টেবিলের চতুষ্পার্শ্বস্থ অভ্যাগতদের খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল। কেউ মুখে ভরছে—কেউ চিবোচ্ছে—কেউবা ঠোঁট চাটছে।

টেবিল ছেড়ে যখন সে উঠে দাঁড়াল, কন্যাপক্ষের একজন এসে তার মাথার পর রুটির টক গন্ধ ছড়িয়ে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য তার জুতোর ফাঁকে এক মুঠো গম ঢেলে দিল। বাড়ী ফিরবার পথে এর খচ্-খচির জন্য তাকে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করতে হল। তারপর শার্টের আঁট-সাট কলারে দম আটকে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। বিরক্তিতে ক্রোধে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

প্রত্যাবর্তনের পথে বৃদ্ধ মেলেখফ দম্পতি পথিমধ্যে তাদের অভ্যর্থনা করল। পান্তেলিমন ইকনটা উঁচু করে ধরে ছিল। ইলিনীচনা তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। হর্ষ-ধ্বনি এবং গম বর্ষণের মধ্য দিয়ে নবদম্পতি বাপমায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গেল। আশীর্বাদ করতে গিয়ে পান্তেলিমনের চোখ ফেটে জল এল। দুর্বলতা

পাছে অন্ত কারও কাছে ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখল।

বর-কনে কুটীরে প্রবেশ করল। পিয়োতরকে খুঁজে বার করার জন্ত দারিয়া ছুটে বারান্দায় এল। সেখানে না দেখে অমনিই ছুটলো ছুস্তার কাছে!

—পিয়োতর কই?

—দেখি নি তো!

—ছাখো, কোথায় সে পুরুত ডাকতে যাবে, তা'না কোথায় গেছে খোঁজই নেই!

খোঁজ পাওয়া গেল। অতিমাত্রায় ভোদ্কা পানে বিবশ হয়ে সে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে গোঙাচ্ছিল। বাজ যেমন ছোঁ মেরে মেষশাবক ধরে, দারিয়াও তেমনিভাবে ধরলে পিয়োতরকে।

— বেশী মদ খেয়ে ফেলেছো! যাও, শীগ্‌গির উঠে পুরুতকে ডেকে আনো।

—ভাগ্! তুই আদেশ করবার কে?

আঙুল দিয়ে দারিয়া তার মুখ চেপে ধরে অনুনয়-বিনয় করে স্বামীর নেশা ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে এক কলসী জল মাথায় ঢেলে যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তাকে পুরুত-বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

এর পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিবাহের আনুষ্ঠানিক কৃত্য শুরু হ'ল। মোমবাতি হাতে গ্রীগরী গীর্জার মধ্যে নাতালিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ভাবে দেয়ালে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। সমাগত সকলেই নবদম্পতির পানে চেয়ে ফিসফিস করে কি বলছিল। গ্রীগরীর বারে বারেই মনে হ'তে লাগল—গেছি, আমি একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছি। পিয়োতর পেছন থেকে কাশি দিয়ে উঠল। জনতার মধ্যে একবার যেন ছুস্তার উৎফুল্ল চোখ দুটিও তার চোখে পড়ল। মনে হল আর সবাইও

চেনা। সকলেই সমস্বরে ভজন শুরু করে দিলে। মনে হ'ল চারিদিকের একটা বিরূপ মনোভাব তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মন্ত্র-চালিতের মত নীরবে সে ফাদার ভিশারিয়নের পেছন পেছন ধর্মগ্রন্থের মঞ্চটি ঘুরে এলো। পিয়োতর পেছন থেকে তার ফ্রক্‌কোটে টান মারতেই থেমে দাঁড়াল। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার পানে চেয়ে সে অন্তরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগল। একটা নামগোত্রহীন জড়ত্ব সত্যি সত্যিই আজ তাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

—অঙ্গুরী বিনিময় কর!—ফাদার ভিশারিয়নের নির্দেশ কানে এল।

যন্ত্রবৎ তারা আদেশ পালন করল। পিয়োতরকে চোখে পড়তেই নীরবে সে জিজ্ঞাসা করল—কখন শেষ হবে? ঠোঁটে হাসি চেপে পিয়োতর জানাল—এখনিই হয়ে যাবে। তারপর গ্রীগরী স্ত্রীর আর্দ্র নীরস অধর চুম্বন করল। ক্রমে নির্বাপিত আলোকশিখার তীব্র গন্ধে গীর্জা ভরে উঠল। সমবেত জনমণ্ডলী প্রবেশ দ্বারের দিকে ফিরে চলল।

নাতালিয়ার স্থূল কড়া হাতখানা ধরে গ্রীগরীও বারান্দায় এলো। কে যেন মাথার টুপীর উপর কয়েকটি চাপড় মেরে সরে পড়ল। পূবালী উষ্ণ হাওয়া ফুলের সুবাস বয়ে নিয়ে আসছে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা প্রান্তর থেকে ছুটে এল হুহু করে। দনের ওপারে বিজলীর চপল হাসি রেখা ফুটে উঠছে। বর্ষা আসন্ন। গীর্জার সাদা বেড়ার ওপাশ থেকে ঘোড়ার কণ্ঠলগ্ন মৃদু ঘণ্টাধ্বনি জনতার কণ্ঠগুঞ্জন ভেদ করে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একপা দুপা করে গ্রীগরী নেমে এল।

বরকনে গীর্জায় না যাওয়া অবধি কোরশুনফরা মেলেখফদের বাড়ীতে আসেনি। ওরা এলো কিনা দেখবার জন্য অস্থিরভাবে পান্তেলিমন রাস্তা অবধি গিয়ে কয়েকবার দেখে এসেছে। কই, কেউ নেই রাস্তায়! দনের দিকে ফিরে দেখে বনে উজ্জ্বল হরিৎবর্ণের ছোপ লেগে গেছে। পরিণত বেণুবন দনের জলাভূমির মধ্যে নুইয়ে পড়েছে। শারদ গোধূলির

ঘোলাটে রক্তিমচ্ছটা গ্রাম-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাস্তার চৌমাথার পাশে মন্দিরের চূড়াটি আকাশের বুকে কালী দিয়ে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছিল।

সহসা গাড়ীর চাকার ক্ষীণ শব্দ এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক পাস্তেলিমনের কানে এল। গাড়ী দুখানি স্কোয়ার ছেড়ে রাস্তায় পড়ল। প্রথমখানিতে সস্ত্রীক মিরণ বসে ছিল; তাদের সামনেই ছিল গ্রীশ্‌কা—সেণ্ট জর্জের ক্রশ এবং বহু মেডেল তার নতুন উর্দ্দিটার বুকে ঝুলান। মিচ্‌কা কোনরকম তড়াহুড়া না করেই গাড়ী চালাচ্ছে। পাস্তেলিমন ফটক খুলে দিতেই গাড়ী দু'খানি প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল। ব্যস্তভাবে ইলিনীচনাও ছুটে এল।

—আসুন, আসুন! এই গরীবের কুটীরে পদার্পণ করে আমাকে ধন্য করুন।—স্থূল কোমর নীচুকরে ইলিনীচনা কোরশুনফদের অভ্যর্থনা জানাল।

হাত বাড়িয়ে সবিনয়ে পাস্তেলিমন বলল—দয়া করে ভেতরে আসুন!

ঘোড়া কটা খুলবার আদেশ দিয়ে পাস্তেলিমন নবাগত অতিথিদের স্বাগতম্‌ জানালো। অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পর্ব শেষ হলে নবাগতেরা গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রীর পেছন পেছন কুটীরের দিকে চলল। অর্দ্ধমাতাল একদল অভ্যাগত ইতি পূর্বেই টেবিলের চারিপাশে বসে ছিল। এরা আসবার কিছুকাল পরেই নবদম্পতি গীর্জা থেকে ফিরে এল। তারা ঘরে ঢুকতেই এক গ্লাস ভোদ্‌কা ঢেলে সাশ্রুনেত্রে পাস্তেলিমন বললে—দেখুন মিরণ গ্রীগরিয়েভিচ, ওরা দুজন এসেছে। প্রার্থনা করি, ওদের জীবন যেন আমাদের মতই মঙ্গলময় হয়! ওরা যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

গ্রীশকা দাদুকে বেশ বড় এক গ্লাস ভোদকা দেওয়া হ'ল। কিন্তু বৃদ্ধ তার অর্দ্ধেকের বেশী গলাধঃকরণ করতে পারলে না। বাকী অর্দ্ধেকের

প্রায় সবটুকুই তার উর্দির শক্ত কলারের মধ্যে ঢুকে গেল। পানপাত্রে ঠোকাঠুকি হতে লাগল। যে যতদূর পারে পানপাত্র শূন্য করতে কসুর করলে না। ঘরখানি বাজারের মত কলরব মুখর হয়ে উঠল। কোরগুনফদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কালাভিদিন সহসা পানপাত্রটি উঁচু করে ধরে টেবিলের এক প্রান্ত থেকে খেড়ে গলায় বলে উঠল—বড্ড ঝাঁঝালো।

টেবিলে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবর্গও তার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—বড্ড ঝাঁঝালো! বড্ড ঝাঁঝালো!

রান্নাঘরে সমবেত নারীমহল থেকেও প্রতিধ্বনি হ'ল—সত্যি, বড্ড ঝাঁঝালো।

স্ত্রীর নীরস অধর চুম্বন করে গ্রীগরী ক্রুর দৃষ্টিতে অভ্যাগতদের পানে চাইল। চতুর্দিকে শুধু আরক্ত মুখচ্ছবি, ইতর চাহনি, মাতালের হাসি আর বিকট চীৎকার।

কালাভিদিন আবার ফোকলা মুখ হা করে পানপাত্রটি তুলে ধরে বললে—বড্ড ঝাঁঝালো।

আবার সকলে ঝাঁঝালো বলে চীৎকার করে উঠল।

রান্নাঘরে দারিয়া নেশার ঘোরে গান ধরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর সব মেয়েরাও শুরু করল। ক্রমে পুরুষ মহলেও গান সংক্রমিত হ'ল। সকলেই তখন গাইছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের এই বীভৎস জগাখিচুড়ির মধ্যেও খৃস্তোনিয়ার কণ্ঠের স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরিই অক্ষুন্ন ছিল। সকল কণ্ঠের উর্ধে তার বীভৎস রাগিনী জানালার সার্সি কাঁপিয়ে তুলল।

সঙ্গীতান্তে আবার ভোজন শুরু হ'ল।

—এই মাংসটা খাও না।

—হাত সরিয়ে নাও বলছি, দেখছো না আমার স্বামী চেয়ে আছে।

—বড্ড ঝাঁঝালো! বড্ড ঝাঁঝালো!

রান্নাঘরের মেজে কেঁপে উঠল। গোড়ালীর পট্‌পট্‌ শব্দ হতে লাগল। একটা গ্লাস মেজের পড়ে গেল। কিন্তু চেঁচামেচির মধ্যে তার টুনটুনানি ডুবে গেল। গ্রীগরী চেয়ে দেখে—মেয়েরা নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। রুমাল উড়িয়ে স্থূল কোমর দুলিয়ে নাচছে তারা। কোমর সরু থাকেই বা কি করে? পাঁচ ছ'টার কম স্কার্ট কেউ পরে নি তো!

একডিয়নের সংলাপ আরম্ভ হ'ল। বাদক কজাক নৃত্যের গৎ বাজাচ্ছে। জনতার মধ্য থেকে সহসা কে চীৎকার করে বলে উঠল—গোল হয়ে দাঁড়াও, গোল হয়ে দাঁড়াও!

মেয়েদের কিছুটা ঠেলে পিয়োত্তর বললে—একটু সরে দাঁড়াও!

মুহূর্ত মধ্যে গ্রীগরীর জড়তা কেটে গেল; নাতালিয়াকে লক্ষ্য করে বললে—দেখ পিয়োত্তর কজাক নাচ নাচছে।

—কার সঙ্গে?

—দেখতে পাচ্ছো না?—তোমার মার সঙ্গে!

মারিয়া লুকিনীচ্‌না বাঁহাতে রুমাল নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। পিয়োত্তর নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে এল। নৃত্যচ্ছলে কোমর অবধি নীচু হয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর আবার নৃত্যের তালে তালে স্বস্থানে ফিরে এল। লুকিনীচনা এমন ভাবে স্কার্ট তুললে, মনে হ'ল কোন জলাভূমি হেঁটে পার হবে বুঝি। তারপর পায়ে তাল ঠিক করে, পুরুষের মত পা ছুঁড়ে নাচতে সুরু করে দিল। বাদক সঙ্গীতের তাল দ্রুততর করল। পিয়োত্তর ঠিকমত তালে তালে গুটিগুটি পা ফেলে নেচে চলেছে। সহসা একটা অস্পষ্ট শব্দ করে গুঁড়ি মেরে বসে দু হাতে বুট ধরে, মুখ দিয়ে গোঁফের প্রান্ত কামড়ে সে ক্ষিপ্র গতিতে দুই হাঁটু বিস্তার এবং সংকোচ করে নাচতে লাগল। নৃত্যের ভঙ্গীতে তার সামনের ঝাঁকড়া চুলও নাচছে।

দরজায় ভীড় জমেছে বলে গ্রীগরী ও-পাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু মাত্র নেশামত্ত অতিথিবর্গের অস্পষ্ট চীৎকার এবং নাল-লাগান জুতোর গোড়ালীর শব্দই কানে আসছে।

অতঃপর মিরণ নাচলে ইলিনীচ্না্র সঙ্গে।· কিন্তু সে নৃত্য নিতান্তই নিয়মরক্ষা মাত্র। পান্তেলিমন টুলের পর দাঁড়িয়ে ওদের নাচ নিরীক্ষণ করছিল। নৃত্যের তালে তালে তার খোঁড়া পা' খানা মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পায়ের পরিবর্তে নাচলে তার ঠোঁট দু-খানি এবং কানের অর্ধচন্দ্র দুটি।

আনাড়ী আরও দু'চার জন নাচবার চেষ্টা করল, কিন্তু জনতা চীৎকার করে বললে—এই, সব মাটি করিবি না!

—গুটি গুটি পা ফেল। হায় হায়···

—পা' ফেলে মন্দ না, কিন্তু ওর পাছাই যত গোল বাঁধিয়েছে!

—চালাও! চালাও! হায় হায়!

এ সবের বহু পূর্বেই গ্রীশকা দাদু নেশায় চুর হয়ে পার্শ্বস্থ পড়শীর পিঠ জড়িয়ে ধরে মাছির মত তার কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছিলেন—কোন বছরে আপনি প্রথম সার্ভিসে যোগ দেন?

প্রতিবেশী উত্তর করলেন—১৮৩৯ সালে খোকা!

গ্রীশকা চমকিত হয়ে কান খাড়া করে বললেন—কোন সালে বললেন?

—বললাম না ১৮৩৯ সালে!

—মশাইর নাম? কোন রেজিমেণ্টে ছিলেন?

—মাকসিম বোগাতিরিয়ফ্। বাকলানফ্ রেজিমেণ্টে একজন কর্পোরাল ছিলাম আমি।

—আপনি কি মেলেখফ্ পরিবারের লোক?

—কি?

—জিজ্ঞেস্ করছি আপনি কোন পরিবারের···

—আঃ! আমি [illegible]।

—কি বললেন বেন? আপনি বাক্লানক-রেজিমেণ্টে ছিলেন?

বৃদ্ধ গ্রীশকার পানে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তা হ'লে ককেশাসের যুদ্ধের সময় আপনি নিশ্চয়ি ছিলেন।

—আমি বাকলানকের অধীনেই ছিলাম। ককেশাসের যুদ্ধে জয়লাভ করতে আমি তাকে সাহায্য করেছি। আমাদের রেজিমেণ্টে কয়েকজন কজাক যা ছিল অমন আর হবে না। মস্ত লম্বা, ইয়া চওড়া বুক, লম্বা লম্বা হাত, তবে একটু কুঁজো হয়ে চলত। একবার একখানা কার্পেট আনবার জন্ম সেনাপতি খুব শাস্তি দিয়েছিলেন আমাকে।

গ্রীশকা বুক উঁচু করে তার পদকগুলি দেখিয়ে বললে—আমি তুরস্ক-অভিযানের সময়ে ছিলাম। অ্যাঁ? হাঁ, আমি ছিলাম!

কিন্তু গ্রীশকার কথা লক্ষ্য না করে বৃদ্ধ বলে যেতে লাগলেন—ভোর বেলা আমরা একটা গ্রাম অধিকার করলাম; দুপুর বেলা বিপদসূচক তূর্যধ্বনি হ'ল।

গ্রীশকা বললে—আমরা রোজিৎসের চার পাশে যুদ্ধ কচ্ছিলাম। আমাদের দ্বাদশ দন কজাক্ রেজিমেণ্ট তুর্কী গোলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল।

—তূর্যবাদক যখন সঙ্কেত করলে আমি তখন একখানি কুটীরের মধ্যে…

—হাঁ, তুর্কী গোলন্দাজদের মাথায় সাদা…গ্রীশকা বলে যেতে লাগল…

—তূর্যবাদক সঙ্কেত করলে আমি আমার সাথীকে বললাম—তিমাফি আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হবে। কিন্তু তার আগে দেয়াল থেকে কার্পেটখানা খুলে নিই।

—আমি বীরত্বের জন্ম দু'খানা জর্জের পদক পুরস্কার পেয়েছি; গ্রীশকা বললে—আমি একজন তুর্কী মেজরকে জীবন্ত ধরে এনেছিলাম।

—বেশ, শয়তান আমাকে কেমন ভুলিয়ে নিয়ে গেল। একখণ্ড মাংসের টুকুরো হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বললে—জীবনে পরের জিনিষ ছুঁই নি। কিন্তু কার্পেটখানা দেখে ভাবলাম, ঘোড়ার পিঠের একখানা…

—আমি সমুদ্র পারেও গেছি, গ্রীশকা প্রতিবেশীর চোখে চোখে চাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কোটরাগত চক্ষু দাড়ি আর ভুরুর লোমে ঢাকা পড়ে গেছে গ্রীশকা অবশেষে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করল। ভূমিকা না করেই সে গল্পের মাঝখান থেকে বলতে শুরু করে দিল—কাপ্টেন আমাকে আদেশ দিলেন—ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চল। ফরোয়ার্ড মার্চ।

তূর্য ধ্বনিতে চকিত আক্রমনোদ্যত অশ্বারোহীর ভঙ্গীতে পেছনে ঘাড় সরিয়ে, টেবিলের পর মুষ্টি চেপে বাকুলানফের রেজিমেণ্টের কজাকটি বললে—বল্লম ঠিকভাবে ধরো। বাকুলানফের দল, অসি কোষমুক্ত কর! বৃদ্ধের স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—বাকুলানফের দল, আক্রমণ কর! ফরোয়ার্ড! সহসা তার মুখে তারুণ্যের আভা ফুটে উঠল। ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে শুভ্র শ্মশ্রু ভিজে গেল।

গ্রীশকাও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন: আমাদের আদেশ দিয়ে তিনি অসি তুলে ইঙ্গিত করলেন। ক্ষিপ্রগতিতে আমরা অগ্রসর হলাম, তুর্কী গোলন্দাজেরা এই ভাবে ব্যূহ গঠন করেছিল—টেবিলের পর একটি স্কোয়ার এঁকে দেখালে—তাদের কামান নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি উদ্গিরণ করে যাচ্ছে। তিন তিন বার আমরা তাদের আক্রমণ করলাম। কিন্তু প্রতিবারেই তারা হটিয়ে দিলে। যখনই আমরা এগুতাম, তাদের অশ্বারোহী দল পার্শ্বস্থ বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করত। সেনাপতি আদেশ দিতেই আমরা সেই

বনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিছুকালের মধ্যেই তাদের বিধ্বস্ত করে আমরা ফিরে এলাম। কজাকদের জুড়ী অশ্বারোহী সৈন্য দুনিয়ায় কোথায় আছে? তারা গভীর অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে গেল। হঠাৎ তাদের একজন সুদর্শন অফিসারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমাকে দেখেই সে কোমর থেকে পিস্তল তুলে গুলী করল; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। তাকে কেটে দুভাগ করতে গিয়ে মনে একটা নতুন কথা জাগল। শত্রু হোলেও, সেও তো মানুষ! আমি ডান হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরতেই সে তার আসন থেকে পড়ে গেল। এক হাতে তাকে ঝুলিয়ে আমি ঘোড়া ছুটালাম। লোকটা আমার হাত কামড়ে ধরেছিল তবু ছাড়িনি! গ্রীশকা বিজয়ীর মত প্রতিবেশীর পানে চাইলে; কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে নিশ্চিন্ত আরামে নাক ডাকছে।

—তেরো—

মোখফ-পরিবার এ অঞ্চলের অনেক-পুরুষের বাসিন্দা। প্রথম পেত্তরের রাজত্বকালে একখানি সরকারী বজরা বিস্কুট এবং বারুদ বোঝাই করে দনের ভাঁটির দিকে যাচ্ছিল। চিগনাকের দুর্দান্ত কজাকরা দনের উজানে বজরাখানি লুঠ করে। রাত্রে বজরার উপর উঠে নিদ্রালু প্রহরীদের খুন করে সমস্ত মাল লুণ্ঠন করে তারা বজরাখানি ডুবিয়ে দেয়।

জারের কাছে সংবাদ পৌঁছুতেই ভরোনিশ্ থেকে সরকারী ফৌজ এসে চিগনাক সহরটি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেল। অপরাধী সমস্ত কজাকদেরই শিরশ্ছেদ করা হয়। এ ছাড়া অন্য চল্লিশেক

ঞকাককে ভাসমান যূপকাষ্ঠে লট্‌কে দনের ভাঁটির দিকে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। আশা, এই সঙ্কেত হয়ত অবাধ্য গ্রামবাসীদের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুল্‌বে।

বছর দশেক পরে চিগনাকের ভস্মস্তূপের মধ্যে আবার বসতি স্থাপিত হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জারের আদেশে মোথক নামে এক রুশ কৃষকও গুপ্তচর হিসাবে এসে সেখানে বসতি স্থাপন করল। কজাক সংসারে দৈনন্দিন যা প্রয়োজন—ছোরার বাঁট, তামাক, চকমকি-পাথর প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে মোথক এক ব্যবসা ফেঁদে বসল। সঙ্গে চলল চোরাই মালের ব্যবসা। বছরে মাল কিনবার অছিলায় মোথব একবার কি দু'বার ভরোনিশ্‌ যেত। আসল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তাদের ওয়াকেফ্‌হাল রাখা।

এই রুশীয় কিষাণ নিকিৎকা মোথক থেকেই বেনিয়া মোথক পরিবারের গোড়াপত্তন। ক্রমে এরা কজাক জমিতে বেশ ভাল করে শিকড় গেড়ে. ভূঁইফোড় আগাছার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ভরোনিশের শাসনকর্তা তাদের একখানি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এরা সশ্রদ্ধভাবে সেই জরাজীর্ণ অভিজ্ঞানখানি গোপন গর্বে রক্ষা করে এসেছে। যদি প্রাতোনোভিচের পিতামহের আমলে সেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড না হ'ত তবে আজও হয়ত সেখানি দেখা যেত। মোথক তাসের জুয়াতে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিল। কায়ক্লেশে আবার পায়ে ভর করে দাঁড়াবার পূর্বেই বৈশ্বানরের শুভদৃষ্টি তাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। দুই পুরুষেও সে চোট সাম্‌লান যায়নি।

সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচকে সব কিছুই নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। পক্ষাবাতগ্রস্থ পিতাকে সমাধিস্থ করে সেরগেয়িকে পাঁচ পাঁচটি বছর নিতান্ত অবজ্ঞভাবে জীবন যাপন করতে হয়েছে। পয়সা আর

হ'লে জুয়াচুরি, বাটপাড়ি কোনটাতেই তার আপত্তি ছিল না। এইভাবে পাঁচটি বছর স্থানীয় কজাকদের নিঙড়ে দু'চার কোপেক জমিয়ে গরু বেচা সিরিওজকা সহসা একদিন সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচ হয়ে বসল এবং ছোট্ট একটি শূঁচ, ফিতা প্রভৃতির দোকান খুলল। কিন্তু আধ-পাগলা এক পুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করেই তার কপাল ফেটে পড়ল। যৌতুক পেয়েছিল যথেষ্ট। তাই দিয়েই এক কাপড়ের দোকান খুলে দিলে। বরাত জোরে সময়টাও খুব অনুকূল হয়ে উঠল। সমর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্রামশুদ্ধ কজাকরা তখন দনের বাম তীর থেকে দক্ষিণ তীরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ওপারের জমিটা ছিল বেলে আর অনুর্বর, তেমন ফসল ফলত না। বেসাতির জন্য মাইল ত্রিশেক না গিয়ে, কজাকরা হাতের কাছের দোকান থেকেই জিনিষ-পত্র কিনতে শুরু করল। তা ছাড়া গ্রাম্য লোকদের প্রলুব্ধ করবার জন্য যা প্রয়োজন সেরগেয়ির দোকানে তার কোনটার অভাব ছিল না। কারবার বাড়িয়ে মোখফ এই সরল গ্রামবাসীদের ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় সব মালই দোকানে রাখতে আরম্ভ করল। এমন কি চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত সে রাখত। কাজেই সুচতুর সেরগেয়ির লাভের অঙ্ক সহজেই বেড়ে যেতে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যেই সেরগেয়ি একটা ফসল মাপার যন্ত্র বসালে এবং প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যেই বাষ্পচালিত একটা ময়দার কল তৈরী ক'রে ফেলল।

কৃকলাসের মত সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচ মোখফ তাতরস্কায়া এবং সন্নিহিত গ্রামগুলির রক্ত চুষে খাচ্ছে। সমস্ত ক'টি গ্রাম তার মুঠোর মধ্যে। মোখফের কাছে না ধারে এমন একটা লোকও গ্রামে খুঁজে পাওয়া যেত না। নয় জন লোক তার ময়দার কলে কাজ করে। সাতজন ছিল দোকানে; আর চারটে দারোয়ান। এক কুড়ি লোক উদরান্নের জন্য এই ব্যবসায়ীর মুখের পানে হা করে চেয়ে থাকত।—সে দিলে তবে

ছুটবে। প্রথম পক্ষে মোথকের সন্তান দুটি, মেয়ে ইয়েলিজাবেতা আর ছেলে ঐ গলগণ্ডওয়ালা বেহদ্দ কুড়ে ভ্লাদিমির। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আমার কোন সন্তানসন্ততি হয়নি। স্বামীর প্রথম পক্ষের ঐ সন্তান দুটির পরই আন্না তার সমস্ত মাতৃস্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু আন্নার দুর্বল চিত্ত তাদের মনের উপর বেশ একটি অপ-প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাবা এদের দিকে বড় বেশী ফিরে চাইত না। আস্তাবলের চাকর কি রাঁধুনীর উপর মোথক যতটা নজর দিত সন্তানদের পর তার বেশী নজর দেবার অবসর তার ছিল না। সত্যিই তো, অবসরই বা কোথায়? সারাদিনরাত্রি তো ব্যবসা নিয়েই তাকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হ'ত। ফলে যা হবার তাই হ'ল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাগে আনা দুষ্কর হয়ে উঠল। তাছাড়া আন্নার বুদ্ধিও এত প্রখর ছিল না যে সে শিশুমনের রহস্যভেদ করতে পারে। কাজেই বাপমায়ে এত মিল থাকা সত্ত্বেও সন্তান দুটি হ'ল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। কারও সঙ্গে কারও এতটুকু মিল ছিল না। যেন অপরিচিত কেউ। ভ্লাদিমির ছিল মনমরা আর বেহদ্দ কুড়ে। ওরই মধ্যে ডেঁপোমি করে গম্ভীর হবার চেষ্টা করত। লিজার সঙ্গী ছিল পাড়ার যত সব অনূঢ়া যুবতী স্ত্রীলোক আর রাঁধুনী। বহু ঘাটের ঘোল খেয়েছে এই ব্যাভিচারিনী স্ত্রীলোকটি। কাজেই এই অসম নারী-সংসর্গে লিজা ছোট বেলাই জীবনের গোপন রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। সঙ্গিনীরা তার মনে এক অশোভন কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে তার ক্ষত মানস কৌমার্য বয়সের গণ্ডী অতিক্রম করে স্বয়ংপুষ্ট গুল্মের মত অকালে তার তন্বীদেহ মুকুলিত করে তুলেছিল।

বৎসর চলে যায়। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, মুকুল হয় প্রস্ফুটিত। ছিপছিপে রোগশীর্ণ ভ্লাদিমির মোথক হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী এসে অন্যান্য বারের মত এবারেও সে কারখানা

দেখতে গেল। কজাক গাড়ী চালকদের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা এবং মন্তব্য শুনে তার অর্ধ চেতন অহমিকা কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

"কর্তার ছেলে। পরে ইনিই তো মালিক…"

গাড়ী এবং গোবরের স্তূপের মধ্য দিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে ভ্লাদিমির কারখানার ফটকে উপস্থিত হ'ল। পাওয়ার প্লাণ্টটা দেখা হয়নি মনে পড়তেই সে আবার ফিরল। মেশিন ঘরের প্রবেশ দ্বারের সন্নিহিত লাল তেলের ট্যাঙ্কটার পাশে কলের-মজুর তিমাফি, ভালেৎ এবং দাভিদ্ হাঁটু অবধি পাজামা গুটিয়ে কাদা ছান্‌ছিল।

—এই, ঐ দেখ্ কর্তা এসেছে!—কৌতুকচ্ছলে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভালেৎ বল্লে।

—শুভদিন। কি কচ্ছ তোমরা?

চটচটে কাদার মধ্য থেকে পা টেনে দাভিদ্ অসন্তুষ্টভাবে বল্লে—কাদা ছান্‌ছি। আপনার বাবা যে ক'জন মেয়ে রেখে কাজটি করাবেন—উহুঁ! পয়সার বেলা ঠিক আছেন। বড্ড মাছের প্রাণ যাই বলুন।

এই সদাপ্রফুল্ল শ্রমিকটির টিট্‌কিরিতে মনে মনে বিষম চটে গিয়ে ভ্লাদিমির জিজ্ঞাসা করল—মাছের প্রাণ মানে?

হেসে দাভিদ্ বল্লে—বড্ড ছোট নজর।

আর সবাইও উক্তির সমর্থনে হেসে উঠল। এই অপমানের খোঁচা সরাসরি ভ্লাদিমিরকে আঘাত করলে। দাভিদের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে তোমরা সন্তুষ্ট নও?

—আমাদের সঙ্গে নেমে কাজ করুন এসে, বুঝতে পারবেন কোন্ শালা এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। বাবা যদি কোনদিন নিজে একাজ করতেন তাহলে টের পেতেন! একদিনেই পেটে ব্যথা ধরে চিৎ হ'তে হ'ত।

দাভিদ্ সোৎসাহে আপন কাজ করে যেতে লাগল। যথোচিত শোধ তুলবার পরিকল্পনা করে ভ্লাদিমির মনে মনে চোখা একটি উত্তর ঠাওরাল: বেশ, তাহলে বাবাকে বলব আমি যে তোমরা এ কাজে সন্তুষ্ট নও।

আড় চোখে দাভিদের পানে চেয়েই তার মুখে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখে ভ্লাদিমির স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিতান্ত জোর করেই সে হাসছিল। আর সবাইর মুখও কালো হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ তিনজনেই নীরবে কাজ করতে লাগল। তারপর সহসা দাভিদ্ মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বল্লে—আমি রহস্য করেছি, ভলোদিয়া।

—বেশ তো, যা বল্লে বাবাকে আমি তাই জানাবো। পিতার অপমানে ভ্লাদিমিরের চোখ ফেটে জল এল। মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে পড়ল।

—ভলোদিয়া! ভ্লাদিমির সেরগেয়েভিচ!—কাদা ছেড়ে দাভিদ্ সন্ত্রস্তভাবে তার পেছন পেছন ছুটল। ভ্লাদিমির দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে দাভিদ্ হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতিকরুণস্বরে বল্লে—আপনার বাবাকে বল্‌বেন না! না বুঝে আমি বোকার মত কাজ করে বসেছি, আমায় মাফ করুন! দোহাই ভগবানের, না বুঝে আমি চট্ করে বলে বসেছি।

—আচ্ছা, বল্‌ব না।—ভ্রূকুঞ্চিত করে উত্তর দিয়ে ভ্লাদিমির কারখানার ফটকের সাম্‌নে গেল। শুন্‌লে কর্কশকণ্ঠে দাভিদকে শাসিয়ে ভালেৎ বল্‌ছে—কেন বল্‌তে গেলি, না খোঁচালে কোন অনিষ্ট ওরা করবে না। ক্রুদ্ধভাবে ভ্লাদিমির বলে উঠল—বদমাইস্ কোথাকার! ভাবলে—বলে দেবো বাবাকে? পেছনে ঘাড় ফিরাতেই দাভিদের সদাপ্রফুল্ল মুখ চোখে পড়ল। ঠিক করল—হাঁ, বোলবোই।

বাড়ী ফিরে সোজা সে বাবার নিভৃত কক্ষের সাম্‌নে গিয়ে

দরজায় আঘাত করল। সেরগেয়ি গ্রাভোনোস্কি একটা চামড়ার কৌচের পর দেহভার এলিয়ে জুন মাসের একখানি মাসিকের পাতা উল্টাচ্ছিল। হাতের বাঁটওয়ালা একখানা কাগজ-কাটা ছুরি তার পায়ের কাছে।

—কি, কি চাই?

—কারখানা থেকে যখন ফিরছিলাম···ভূমিকা না করেই দ্বিধা-জড়িতভাবে ভ্লাদিমির বলতে আরম্ভ করে দিল, কিন্তু দোভিয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখের কথা মনে পড়তেই মুহূর্ত মধ্যে দ্বিধা কেটে গেল। অসঙ্কোচে ভ্লাদিমির শুনাল: শুনলাম দোভিয় বলছে···

নির্বিষ্টভাবে পুত্রের রিপোর্ট শুনে সেরগেয়ি বল্লে—ওকে বরখাস্ত করে দেবো! স্থূল দেহভার আনত করে কোনক্রমে সেরগেয়ি পায়ের কাছ থেকে ছুরিখানা তুলে নিল।

সন্ধ্যার পর গ্রামের বুদ্ধিজীবীরা মোখফের বাড়ীতে আসর জমায়। দলের মধ্যে থাকত মস্কোভার শিল্প-শিক্ষায়তনের ছাত্র বয়ারিশ্‌কিন, বন্ধ্যা এবং আহমিকায় অন্তঃসারশূন্য মাষ্টারমশাই বালান্দা আর তারই সহকারিণী এবং সহবাসিনী স্থিরযৌবনা মার্কা পেরাশিমোভ্‌না; মেয়েটার আত্মবাসে সব সময়ের জন্য একটা অভদ্র ইঙ্গিত থাকত। এ'দলে আর ছিলেন চিরকুমার পোষ্টমাষ্টার মশাই। সব সময় তার গা থেকে সস্তা গন্ধদ্রব্য এবং গালার গন্ধ আসত। এরা ক'জন নিয়মিত সভ্য। সৈন্যদলের অধিনায়ক ইয়েভগেনি লিস্তনিতস্‌কি মাঝে মাঝে এষ্টেট্ থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসে এদের দলে যোগ দিত। কাজের মধ্যে এদের বারান্দায় বসে চা-পান আর অর্থহীন তর্কের কসরৎ। কিন্তু এ তর্কেও যখন ভাঁটা পড়ে আসত, হয়ত কোন অভ্যাগত গিয়ে মোখফের দামী গ্রামোফোনটা খুলে বসতেন।

প্রধান প্রধান ছুটির সময়ে কখনও কখনও হয়ত মোখফ বন্ধু-

বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করত। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। স্বভাবতঃ সে বেশ ব্যয়কুণ্ঠ। শুধু একটা ব্যাপারেই তার কঞ্জুস ভাব ছিল না। পড়াশুনার ঝোঁক ছিল খুব; কাজেই বইও কিনত দেদার। কিন্তু বই কেনা মোথকের শুধু সখ নয়। যা পড়ত তা বুঝবার মত এবং তা থেকে সুসংবদ্ধ একটা ধারণা গঠন করবার মত মানসিক তীক্ষ্ণতা তার ছিল। গ্রামের পাদ্রীদ্বয়, ফাদার ভিশারিয়ন এবং ফাদার পাংক্রাচির সঙ্গে মোথকের একেবারেই কোন বনিবনা ছিল না। বহুদিন ধরে এদের মধ্যে মন কষাকষি চ'লছে। তাই বলে পাদরী দুজনের পরস্পরের মধ্যেও তেমন সম্প্রীতি ছিল একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। জনসাধারণের মন বিপথগামী করবার মত তীক্ষ্ণ চাতুর্য্যে ফাদার পাংক্রাচি সিদ্ধহস্ত। আর সিফিলিস্ রোগাক্রান্ত বিপত্নীক ফাদার ভিশারিয়ন অনেকটা অমায়িক হলেও তেমন মিশুক নন। উক্রাইনস্কি এক বাড়ীওয়ালার সঙ্গে তিনি থাকতেন। তাছাড়া ফাদার পাংক্রাচির গগনস্পর্শী অহমিকা এবং লাগানে স্বভাব তার আদৌ ভাল লাগত না।

বালাম্বার ছাড়া আর সকলেরই নিজের বাড়ী ছিল। মোথকের নীল রঙের বাড়ী স্কোয়ারের উপরেই। তারই সামনে স্কোয়ারের মাঝা-মাঝি তার কাচের দরজা এবং অস্পষ্ট সাইনবোর্ড ঝুলান দোকান। দোকানের সংলগ্ন একখানা লম্বা নীচু চালার মধ্যে একটি পানশালা। এরই শ'খানেক গজ দূরে গীর্জার বাগানের দেওয়াল। গীর্জার ওপাশেই স্কুলের দেওয়াল; তারপাশে কায়দাদুরস্ত ফাদার ভিশারিয়ন এবং ফাদার পাংক্রাচির বাড়ী। দুটি বাড়ীই সৌসাদৃশ্যহীন। নীলরঙের খাড়া গোঁজের বেড়া দেওয়া বাড়ীটি পাংক্রাচির। আর বাদামী রঙের বেড়া দেওয়া প্রশস্ত ঝুল বারান্দাওয়ালা বাড়ীটি ফাদার ভিশারিয়নের।

এর পেছনে দোতলা বাড়ী একটা। তার পেছনে পোষ্টঅফিস্। পোষ্টঅফিসের গায়ে আবার দোতলা বাড়ী একটা। এই সব কিছুর ওধারে কল্লাকদের শ্রেণীবদ্ধ টিনের বস্তি ক্রমে চালু হয়ে কারখানার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। কারখানার চালে ছুটো মরচে ধরা টিনের যোরগ। অধিবাসীরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে অন্তরীনের মত নিজ নিজ বাড়ীতে বসবাস করে। সন্ধ্যার পরেই গ্রামে একটা নিথর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। পড়শীর বাড়ী গেলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, তাছাড়া সূর্য্যাস্তের পরেই যে যার ঘরের খিল আট্‌কে কুকুরগুলি প্রাঙ্গণে ছেড়ে দিত। শুধু টহলদার প্রহরীর হাঁকডাকই কেবলমাত্র এই পল্লীব্যাপী শুব্ধতার অপহ্নব ঘটাত! এ ছাড়া টু শব্দটি শুন্‌বার জো ছিল্ না।

—চৌদ্দ—

আগষ্টের শেষাশেষি একদিন দিমিত্রি কোরশুনফের সঙ্গে নদীতীরে ইয়েলিজাবেতার দেখা হয়। সবে মাত্র ওপার থেকে এসে সে ঘাটে নৌকা বাঁধছে এমনি সময়ে সুসজ্জিত একখানি ডিঙ্গি চোখে পড়ল। তরুণ ছাত্র বয়ারিশকিন ডিঙ্গিখানি বাইছে। ক্লান্তিতে তার স্বেদসিক্ত নগ্ন মস্তক চকচক করছিল এবং কপালের শিরা সব ক'টা গোনা যাচ্ছিল। প্রথমে ডিঙ্গির মধ্যে ইয়েলিজাবেতাকে মিচ্‌কা ঠিক চিন্‌তে পারেনি; তার খড়ের টুপীটা এমনিভাবে মুখের ওপর টানা ছিল যে দূর থেকে ঠাহর করা দুঃসাধ্য। রোদে পোড়া হাতখানি দিয়ে লিজা কতগুলি হলদে কুমুদ বুকের কাছে চেপে রেখেছে। মিচকাকে দেখেই ডেকে বল্লে—কোরশুনফ তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করেছ।

—চালাকি করেছি!

—মনে পড়ে আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে বলেছিলে।

বয়ারিশকিন্ দাঁড় ছেড়ে পিঠ সোজা করে বসতেই ডিঙিখানির গলুই নদীর পাড়ে আটকে গেল। নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে লিজা হেসে বল্লে—মনে পড়ে না?

—সময় করেই উঠতে পারি নি, অনেক কাজ করতে হয়। সপ্রতিভ মিচকা বল্লে। লিজা তার কাছে এগিয়ে এল।

—বেশ তাহ'লে কবে নিয়ে যাবে বল।

—কালকেই যেতে পার।

—এবার ভুল হবে না তো?

—না।

—তাহলে তোমার জন্য আমি বসে থাকবো কিন্তু। সেই জানালার কথা ভোলোনি নিশ্চয়। কালকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া চাই।

লিজা একটু চুপ করে থেকে আবার হেসে জিজ্ঞাসা করল—তোমাদের বাড়ীতে ত' বিয়ে গেল একটা, না?

—হাঁ, আমার বোনের।

—কার সঙ্গে?—উত্তরের অপেক্ষা না করেই লিজা আবার রহস্য চপল হাসি হাসলে: তাহলে ঠিক আসবে তো? না আসবে না? আর একবার তার চপল হাসি মিচকার মনে ছুঁচ বিঁধালো।

আবার তারা ডিঙিতে উঠল। বয়ারিশকিন অধৈর্য হয়ে ঠেলে ডিঙি জলে ভাসাল। লিজা তার মাথার ওপর দিয়ে চেয়ে মিচকাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাল। কিছুদূর নৌকা এগুতেই মিচকা শুনতে পেল বয়ারিশকিন জিজ্ঞেস করছে—ছেলেটা কে?

—ও আমার পরিচিত এই গাঁয়েরই ছেলে।—লিজা উত্তর করল।

—প্রণয়ের ব্যাপার নয় তো!

দাঁড়ের শিকলের শব্দে আর লিজার জবাবটা মিচকা শুনতে পেল

না। দেখলে বয়ারিশকিন হেসে লুটিয়ে পড়ল। তবু লিজার মুখ দেখা গেল না; তার টুপীর গোলাপী ফিতাটি বায়ুভরে পিঠের ওপর নিশ্চিন্ত আরামে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

বড়শীতে মাছ ধরবার মত সখ মিচকার আদৌ ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল হ'লে যেত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা অপরিসীম ব্যস্ততা এবং ব্যগ্রতা নিয়েই সে পরদিবসের অভিযানের উদ্যোগ আয়োজন করতে লেগে গেল। সবকিছু গোছ-গাছ করে সে সামনের ঘরে এসে হাজির। গ্রীশকা দাদু জানালায় বসে তামার ফ্রেমওয়ালা চশমা চোখে বাইবেল পড়ছিলেন। দুয়ারের চৌকাঠে হেলান দিয়ে বিনীত ভাবে মিচকা ডাকল—দাদু!

বৃদ্ধ চশমার ওপর দিয়ে চাইলেন তার পানে।

—কি?

—মোরগ ডাকলেই আমাকে তুলে দিও।

—কেন অত সকালে কোথায় যাবি?

—মাছ ধরতে।

মৎস্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের কিছু দুর্বলতা ছিল; তবু মিচকার প্রস্তাবে বাধা দেবার ভান করে তিনি বল্লেন—তোর বাবা বলেছে কালকেই শণ পাকাতে হবে। বাজে কাজ করবার সময় কি আছে?

দরজার পাশ থেকে সরে মিচকা চালাকি করে বল্ল—বেশ, তাই হবে! ভেবেছিলাম, তোমাকে বেশ বড় দু-চারটে মাছ এনে দেবো; তা শণ যখন পাকাতেই হবে তখন আর কি করা যায়, নাই গেলাম!

—দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস্? সন্ত্রস্তভাবে বৃদ্ধ ডাকলেন; তারপর চশমাটা খুলে আবার বল্লেন—আচ্ছা, আমি বোলবো তোর বাবাকে। তুই যাস্। আমি ডেকে দেবো।

দুপুর রাতে একহাতে পাজামা টেনে ধরে, অপর হাতে লাঠি ঠক্‌ঠক্‌

করে সিঁড়ি বেয়ে বৃদ্ধ মিচকার কাছে হাজির হলেন। গোলাঘরে একখানা কম্বলের পর শুয়েছিল মিচকা। বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে কয়েক বার খোঁচা মারলেন কিন্তু তথাপি তার ঘুম ভাঙল না। প্রথমে আস্তে খোঁচা মেরে চাপা স্বরে বৃদ্ধ ডাকছিলেন—মিচকা মিচকা, এই মিচকা!

প্রত্যুত্তরে একটা হাই তুলে মিচকা পা টান করে শুলো। রেগে বৃদ্ধ তখন সজোরে তার পেটের পর খোঁচা মারতে লাগলেন। ধড়মড় করে উঠে মিচকা লাঠির মাথা টেনে ধরল।

রেগে বৃদ্ধ বল্লেন—কি ঘুম রে বাপু!

মিচকা নিঃশব্দে উঠে উঠান পার হয়ে স্কোয়ারের কাছে হাজির হ'ল। মোখফের বাড়ীর কাছে পৌঁছে সে ছিপটা রেখে, চোরের মত পা টিপে টিপে, কুকুরগুলি টের না পায় এমনিভাবে আঙুলে ভর করে বারান্দায় উঠল। প্রথমে দরজার তালা খুলবার চেষ্টা করল কিন্তু কবাট ভেতর থেকে বেশ ভাল করে খিল দেওয়া। তারপর বারান্দার রেলিং ধরে ধরে সে সেই জানালাটার কাছে এল। জানালার একখানা কবাট ভেজান ছিল। ফাঁকের মধ্য দিয়ে নারীদেহের সুবাস এবং অপরিচিত অঙ্গরাগের গন্ধ ভেসে আসছে।

—ইয়েলিজাবেতা সেরগেয়িভ্না!

মিচকা ভাবলে ডাকটা খুব জোরে হয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে লাগল। কোনও সাড়া নেই। তাহ'লে সে কি জানালা ভুল করেছে? যদি মোখফই এই ঘরে শুয়ে থাকে? সে কি ··যদি সে বন্দুক ছোড়ে?

—ইয়েলিজাবেতা সেরগেয়িভ্না, মাছ ধরতে যাবে না?

যদি সে জানালা ভুল করে থাকে তাহ'লে একটা মাছ আজ ধরা পড়বেই!

জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে চটে মিচকা জিজ্ঞাসা করল—উঠবে, না কি?

অন্ধকারের মধ্য থেকে শঙ্কিত একটি স্বর আস্তে জিজ্ঞাসা করল—কে ?

—আমি, কোরগুনক ! মাছ ধরতে যাবে না !

—ও ! হাঁ যাচ্ছি, দাঁড়াও !

ভিতরে নড়াচড়ার শব্দ হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে নিদ্রাতুর জড়িত কণ্ঠের চাপা কথা শোনা যাচ্ছিল। মিচকা দেখলে অস্পষ্ট সাদা একটা ছায়ার মত ঘরের এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করছে। কিছুক্ষণ পরেই জানালার মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা লিজার হাস্যোজ্জল মুখখানি দেখা গেল।

—এই পথেই বেরুতে হবে। তোমার হাতখানা বাড়াও। মিচকার হাতখানা চেপে ধরে লিজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে তার চোখের পানে।

সটান হেঁটে উভয়েই নদের পাড়ে উপস্থিত হল। সন্ধ্যাবেলা নৌকাখানা ডাঙ্গায় বাঁধা ছিল কিন্তু জোয়ারের জলে তখন তা সামান্য দূরে ভাসছে।

—জুতো খুলতে হবে ?

—এসো কোলে করে পার করে দিচ্ছি।

—না না থাক, তার চেয়ে আমি জুতোই খুলছি।

—কেন, কোলে উঠে যাওয়া তো আরও ভাল !

—না, থাক্ !—সলজ্জকণ্ঠে লিজা জানাল।

কিন্তু মিচকা কথা কাটাকাটি না করে সোজা হাঁটুর ওপরে তার পা দুখানি বাঁ-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সহজেই তাকে তুলে ফেলল। লিজা সসঙ্কোচে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে নীরবে হাসতে লাগল! মেয়েদের কাপড় কাচবার পাথরে মিচকা যদি হোঁচট না খেত তাহলে হঠাৎ এই সংক্ষিপ্ত চুম্বনটি সংঘটিত হ'ত না। অস্ফুট শব্দ করে লিজা মিচকার

ঠোঁটে গাল ঠেসে ধরল। নৌকা থেকে দু'এক পা দূরে মিচকা থমকে দাঁড়াল। ঠাণ্ডাজলে পা শিরশির করছে। নোঙর খুলে ডিঙিতে ঠেলা মেরে মিচকা লাফিয়ে উঠল। দাঁড়িয়েই সে বাইছিল। নদী পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকাখানি ওপারের দিকে চলল। হঠাৎ বালুতটে ধাক্কা লেগে নৌকার দাঁড় কেঁপে উঠল। কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই মিচকা মেয়েটিকে পাঁজা কোলে তুলে একটা হৃষর্ণ ঝোঁপের ওপাশে নিয়ে গেল। মেয়েটি অসহায়ের মত তার মুখ কামড়ে-আঁচড়ে দিতে লাগল। দু'একবার অস্ফুট আর্তনাদও করেছিল। সব কিছুই নিষ্ফল বুঝে রুদ্ধ কান্নায় তার বুক ভরে এলো। চোখে কিন্তু অশ্রুর কণামাত্র ছিল না।

গোটা নয়েকের সময় তারা বাড়ী ফেরে। প্রভাতের অরুণ আভায় তখন আকাশের বুক ছেয়ে গেছে। নদীর বক্ষে শুরু হয়েছে পবনের লীলায়িত নৃত্য। মিচকা সেই ফেনিল তরঙ্গমালায় উজানে পাড়ি ধরেছে। লিজার পাণ্ডুর মুখে চোখের পাতায় এবং আলুলায়িত কুন্তল-গুচ্ছে হিমশীতল জলকণা জড়িয়ে ঝলমল করছে। অর্ধ নিমীলিত নয়নে তন্ময়ভাবে সে হাতের ফুলটির বোঁটা খুঁটছিল। মিচকাও অন্যদিকে চেয়ে নীরবে দাঁড় টান্‌ছিল। মুখে শঙ্কা সন্তুষ্টি এবং অপরাধীর ভাব। পায়ের কাছে ছোট ছোট দুটি মাছ। অবশেষে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে মিচকা বল্লে : সেমিওনভের ঘাটে তোমায় নামিয়ে দোব, সেইটেই কাছে হবে।

নদীতীরে ওয়াটল্ গাছের ধুলোমাখা বেড়া গরম হাওয়ায় শুকিয়ে গেছে। চড়াইপাখী ঠুক্‌রে সূর্যমুখীকে পাপড়িহীন করে ফেলেছে; তার পরিপক্ব বীজ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে। নবীন তৃণের শোভায় প্রান্তর অপূর্ব শ্যামলশ্রীমণ্ডিত। দূরে অশ্বখুরে বালি উড়ছে। দক্ষিণা পবনে নদীর বক্ষ কল্লোলমুখর।

ইয়েলিজাবেতা নৌকা থেকে নামবার সময় মিচকা একটা মাছ তা হাতে দিল।

—তোমার আগ নাও।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাইল লিজা। মাছটাও হাত বাড়িয়ে নিলে।

—আচ্ছা, যাচ্ছি তাহোলে।

একখানি ছোট্ট শাখায় মাছটা ঝুলিয়ে মলিনমুখে চল্ল লিজা। হর্ষ যেঁাপেই তার সমস্ত উৎসাহ এবং আনন্দের সমাধি হয়েছে।

—ইয়েলিজাবেতা।

বিস্ময় ও বিরক্তি চেপে লিজা ফিরল। কাছে এলে মিচকা সসঙ্কোচে জানাল—তোমার জামার পেছনে একটা ফুটো! খুবই ছোট তবু…

লজ্জা অপমান ও শঙ্কায় লিজার মুখ চোখ আরক্ত হয়ে উঠল। খানিক পরে মিচকা বুদ্ধি বাতলে বল্ল—পেছনের পথটা দিয়ে যাও।

—কিন্তু স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে তো আমাকে যেতেই হবে। ভেবেছিলাম কালো জামাটা পড়ে আস্‌ব। লিজার ঠোঁটে একটা ক্ষোভ ও অপ্রত্যাশিত অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল।

—পাতা লাগিয়ে সবজে করে দোব?—সরল ভাবে মিচকা প্রস্তাব করল। কিন্তু চোখাচোখি হতেই দেখে লিজার চোখের কোণ চিক্‌চিক করে উঠেছে।

পরদিনই পবনের মৃদু মর্মরের মত কথাটি পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ল—মিমিত্রি কোরশুনক সারারাত সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচের মেয়েকে নিয়ে বাইরে কাটিয়েছে। মেয়েমহলের সর্বত্র ঐ এক কথা,—ভোরবেলা মাঠে গরু নিয়ে গিয়ে এ নিয়ে গুলতানি করে; কূয়োয় জল আন্‌তে গিয়ে জটলা করে, এমন কি নদীর পাড়ে কাপড় কাচবার সময় পর্য্যন্ত ঐ এক কথা।

—নিজের মা নেই তো!

—তাছাড়া বাপ তো সারা দিনরাত কাজে ব্যস্ত, সৎমাও তেমন নজর দেয় না।

—দোকানের দারোয়ান বল্লে, দুপুর রাত্তে একটা লোককে সে জানালা বেয়ে উঠতে দেখেছে। প্রথম ভেবেছিল চোর, জানালা ভাঙবে হয়ত। দৌড়ে গিয়ে দেখে মিচকা।

—আজকালকার মেয়েরা পাপে ডুবে আছে। কোন কাজেরই নয়!

—মিচকা আর্থার মিখাইলকে বলেছে, সে নাকি বিয়ে করবে ওকে।

—মিচকা শুনলাম জোর করে ·····

—থাক্, আর দোষ ঢাকতে আসিস্‌নে। অরাজী কেটিকে কুত্তা কখনও উত্যক্ত করে না।

কথাটা ক্রমে মোথফের কানেও পৌছাল। দালানের কড়ি মাথায় ভেঙে পড়বার মত সংবাদটি মোথফকে স্তম্ভিত এবং মুহ্যমান করে ফেল্ল। দু'দিন ধরে না গেল দোকানে, না এল কারখানায়। তৃতীয় দিবসে দ্রোশকীতে বলিষ্ঠ একটা ঘোড়া জুড়ে মোথফ জিলায় চল্ল। পশ্চাতে সুন্দর সুসজ্জিত একখানি জুড়ী গাড়ী, ইয়েলিজাবেতা নীরবে তার মধ্যে বসে। তার মুখ শুকিয়ে মৃতের মত বিবর্ণ এবং পাণ্ডুর হয়ে গেছে। কোলের উপর পাতলা একটা সুটকেশ রেখে নিতান্ত মুখরক্ষার জন্তই জোর করে হাসছিল সে। ফটকের সামনে সে ভ্লাদিমির এবং সৎমাকে বিদায়সম্ভাষণ জানাল। পান্তেলিমন প্রকোফিয়েভিচ তখন সবে দোকান থেকে বেরিয়েছে। এদের দেখে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল—কর্তার মেয়ে কোথায় যাচ্ছে?

মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার বশে নিকিতা আসল কথা চেপে সসঙ্কোচে জানাল—মস্কোতায় পড়তে যাচ্ছে।

এর পরদিনকার ঘটনা নদীর ধারে কূয়ার পাশে এবং মাঠে বহুকাল ধরে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে রইল। সন্ধ্যার ঠিক আগেই, গোধূলির সময়ে, মিচকা সেরগেঈ প্লাতোনোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যায়। সেরগেঈ নিরালা হবার জন্ত অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করে। ঘোড়াবার

জন্ত মোটেই সে যায়নি! উদ্দেশ্য মোখফের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করবে। বার চারেকের বেশী তাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। শেষবার সাক্ষাতের সময়ে মিচ্‌কা কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিল : ইয়েলিজাবেতা, আমায় বিয়ে করবে ?

—দূর বোকা!

—আমি তোমায় আদর করব, তোমায় ভালবাসব। কাজকর্ম করবার জন্ত আমাদের মাইনে করা লোক রয়েছে ; তুমি শুধু জানালায় বসে বই পড়বে।

—তুমি আস্ত একটি গাধা!

মিচ্‌কা চুপ করল। সেদিনকার মত কথাবার্তা এই পর্য্যন্তই। সন্ধ্যাবেলা মিচ্‌কা একটু সকাল করে বাড়ী ফিরল। পরদিন সরাসরি বাবার কাছে প্রস্তাব করল : আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর বাবা!

মিরণতো শুনে অবাক্।

—সত্যি বল্‌ছিস্!

—হাঁ সত্যি!

—খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ না? মাথাটি এমন করে বিগড়ে দিলে কে?

—সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচের কাছে ঘটক পাঠাও।

উচ্চহাস্ত করে মিরণ বল্লে—বেশ, আজ তো দেখছি বেশ খোস্ মেজাজেই আছ।

মিচকা নাছোড়। মিরণ তখন চটেমটে বল্লে—দূর গাধা! সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচ লাখপতি। সে ব্যবসাদার। আর তুমি? যা আমার সুমুখ থেকে। ভাগ, না হয় চাব্‌কে সোজা করব।

—আমাদের বার জোড়া বলদ আছে। জমিজমাও বিস্তর। তাছাড়া সে কৃষক—আমরা কজাক্।

—সরে যা' বল্‌ছি।—সরাসরি মিরণ জবাব দিল।

একমাত্র পিতামহই যা একটু মিচকার প্রতি সহানুভূতিশীল; তাছাড়া আর শ্রোতাই তো জুটল না। মিরণকে রাজী করাবার জন্য বৃদ্ধ বহু চেষ্টা করলেন।

—কেন তুই রাজী হচ্ছিস্ না মিরণ? ছেলেটার মাথায় যখন ধরেছে……

—আপনিও তো দেখছি আস্ত একটি খোকা! সত্যি, মিচকাটা তো একেবারেই বোকা; আর আপনি ·····

—মুখ সাম্‌লে কথা কইবি। সক্রোধে মাটিতে লাঠি ঠুকে বৃদ্ধ বল্লে: আমরা তাদের সমান নই? কজাকের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে, এ তার পরম ভাগ্যের কথা। এ অঞ্চলের সবাই চেনে আমাদের। আমরা চাষী নই—আমরা মালিক। যা, গিয়ে প্রস্তাব করে আয়। ঐ কারখানাটা তাকে যৌতুক দিতে হবে।

মিরণ আবার চটে উঠল। কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে মিচকা নিজেই মোখফের কাছে যাবে স্থির করল। সে বেশ ভাল করেই জানত যে, বাবা যখন গোঁ ধরেছে কিছুতেই তার একচুল নড়চড় হবে না। সে ভাঙ্‌বে তবু মচকাবে না। তার কাছে মিনতি জানান নিস্ফল। উৎসাহ ভরে শিস্ দিতে দিতে মিচকা মোখফের বাড়ী পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু সদরের কাছে এসেই যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু এ ক্ষীণ দুর্বলতা ক্ষণিকের। আঙ্গিনা পার হয়ে মিচকা মোখফের ঘরে ঢুকল। সিঁড়িতে ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে—কর্ত্তা বাড়ী আছেন?

—চা খাচ্ছেন, একটু বসুন!

মিচকা বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সিগ্রেট ধরালে একটা, তাও পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে হাত দিয়ে মোখফ

ঘ.রে এল। মিচকাকে দেখেই ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লে—ভিতরে এস।

মোখফের ঠাণ্ডা প্রাইভেট ঘরে ঢুকে মিচকার মনে হ'ল, সঞ্চিত সাহসটুকু বুঝি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

টেবিলের পাশে গিয়েই মোখফ নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে: বল! পশ্চাতে তার আঙুলগুলি টেবিলের পর আঁচড় কাটতে লাগল।

—আমি আমার···মোখফের রূঢ় দৃষ্টির পানে চেয়েই মিচকা চমকিত হয়ে থাম্‌লে।—ইয়েলিজাবেতাকে হয়ত আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন! হতাশা, ক্রোধ এবং শঙ্কা সব কিছু মিলে তার কপালে ঘাম দেখা দিল। মোখফের বাম চক্ষুটি ঈষৎ কেঁপে উঠল। ঠোঁট কামড়ে নীরবে সে দাঁড়িয়ে মিচকাকে লক্ষ্য করতে লাগল; তারপর ঘাড় প্রসারিত করে সামনে ঝুঁকে বলে উঠল—কি বল্লি? কি? বেরো, বেরো পাজী! বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমি তোর নামে আতামানের কাছে আর্জি দেব।

মোখফের চীৎকারে মিচকার সাহসও দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

—একে অপমান মনে করবেন না। আমি শুধু আমার অপরাধ শোধরাতে চাই।

রক্তচক্ষু পাকিয়ে মোখফ ভারী একটা লোহার য়্যাশট্রে মিচকার দিকে ছুড়ে মারল। লাফিয়ে উঠে ট্রে-টা ঠক্ করে মিচকার হাঁটুর উপর লাগল। নির্লিপ্তের মত যন্ত্রণা সহ্য করে মিচকা দরজা খুলে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে বল্লে: বেশ, তাই হবে প্রাক্তোনোভিচ। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি···কে চায় তাকে এখন? ভেবেছিলাম তার কলঙ্ক ঘোচাবো···কিন্তু চিবানো হাড় কুকুরেও ছোঁবে না।

রুমালখানা ঠোঁটে চেপে প্রাক্তোনোভিচ দৌড়ে এসে সদর আটকে দাঁড়াল। মিচকা উঠোনে লাফিয়ে পড়ে ফটক খুলে বেরোবার চেষ্টা

করল। কিন্তু সেরগেয়্রির ইঙ্গিতে ইতিমধ্যে কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান কুকুর চারটে খুলে দিয়েছে। মুহূর্ত মধ্যে ঘেউ ঘেউ শব্দে তারা মিচকার উপর লাফিয়ে পড়ে কামড়ে আঁচড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে লাগল। কিল লাথি চড় মেরে সেগুলি তাড়িয়ে মিচকা কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল। পাইপ মুখে ইয়েমেলিয়ান ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিল।

যোথক একটা রেনওয়াটার পাইপে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কোনমতে ফটক খুলে মিচকা দৌড়ে বাইরে এলো। কুকুরগুলিও তার পেছন পেছন তাড়া করল। গলাটিপে মিচকা একটাকে সাবাড় করল। কজাকদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে সে অপর তিনটার হাত থেকেও বহু কষ্টে রক্ষা পেল।

—পনেরো—

দুদিনেই মেলেখফ-পরিবারে নাতালিয়ার কদর বেড়ে গেল। ঘরে-বাইরের সব কাজেই নববধূ সিদ্ধহস্ত। মিরণ নিজে যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ এবং লোক রেখেই কাজকর্ম করাত, তবু সন্তানসন্ততি যাতে অলস না হয়ে পড়ে সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। কাজেই পিত্রালয়েও নাতালিয়াকে সব কিছুই নিজের হাতে করতে হয়েছে। এ শিক্ষা এবং অভ্যাস ব্যর্থ হ'ল না। স্বামীর ঘরে তার সুফল ফলল। শ্বশুর-শাশুড়ী দু'চার দিনের মধ্যেই নববধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ইলিনীচনা মনে মনে বড় বউয়ের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু নাতালিয়াকে দেখা অবধি কেমন যেন ভাল লেগেছে।

—এত সকালে উঠেছ কিসের জন্য বউমা? ঘুমোওগে যাও।

রয়েছে, বলত ইলিনীচনা।—তুমি ঘুমোওগে, যা কাজকর্ম আমরাই করে নেব।

সাংসারিক ব্যাপারে প্যান্তেলিমন নিজেও অত্যন্ত কড়া। কিন্তু ছোট বধূর বেলা তার কড়া শাসনও যথেষ্ট শিথিল হয়েছে। স্ত্রীকে ডেকে প্যান্তেলিমন বলত: ওগো শুনছো, নাতালিয়াকে জাগিও না, ঘুম ভাঙলেই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে। আজকে সে গ্রীশকার সঙ্গে চাষ করতে যাচ্ছে। দারিয়াটাকে চাবকে তোলো। অমন আঁটকুড়ে মেয়ে লোক···কুড়ের বাদশা। কাজের মধ্যে তো সারাদিন বসে বসে মুখে রঙ মাখবে আর ভুরু আঁকবে!

গ্রীগরী কিন্তু কিছুতেই এই নতুন বিবাহিত জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। বিবাহের দুই-তিন সপ্তাহ পরেই অন্তরে যে রূঢ় সত্য সে উপলব্ধি করল, তাতে শঙ্কিত এবং বিরক্তই হ'ল। মুখে আকসিনিয়াকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে এলেও অন্তরের আসন থেকে এখনও সে অণুমাত্র বিচ্যুত হয় নি। বিবাহিত জীবনের মোহলুব্ধ উত্তেজনার আতিশয্যে যে কল্পনাকে সে তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে সে চিন্তা যে অন্তরের অন্তঃস্থলে মূল বিস্তার করে আছে! ভেবেছিল ভুলতে পারবে। কিন্তু সে যে বিস্মৃত হতে চায় না! মনে এলেই ক্ষত স্থান টন্ টন্ করে ওঠে। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত পিয়োতর তাকে জিজ্ঞাসা করেছে—গ্রীশকা, আকসিনিয়ার কি হবে?

—কি আর হবে?

—ছেড়ে দিতে দুঃখু করচে না?

—আমি ছেড়ে দিই আর কেউ কুড়িয়ে নেবে!—হেসে গ্রীগরী উত্তর করছে।

মুখে বললে কি হবে, কার্যত দাঁড়াল অন্য রকম। উদ্বেল যৌবনের লোলুপ আলিঙ্গনের বিনিময়ে গ্রীগরী স্ত্রীর কাছ থেকে পেত সলজ্জ দ্বিধা।

নাতালিয়ার শীত প্রকৃতি প্রায় অনিচ্ছায়ই বাধাস্বরূপ। গ্রীগরীর উদগ্র পিপাসা মাখানো আলিঙ্গন নিষ্প্রাণ বাহুবেষ্টনে অতৃপ্ত হয়ে নিষ্ফল হতাশায় তাকেই নিষ্করুণ আঘাত হানে। আকসিনিয়াকে ভুলবার অঙ্গীকার বানচাল হয়ে যায়। দৈহিক ভোগলিপ্সার পর নাতালিয়ার কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল। মায়ের কাছ থেকে অন্য কোন কিছু না পেলেও তার অচঞ্চল শিথিল রক্ত-প্রবাহটুকু পুরোপুরিই লাভ করেছে। আকসিনিয়ার উদ্দাম কামনার কথা মনে পড়তেই গ্রীগরী সন্তর্পণে দীর্ঘশ্বাস চেপে যেত।

—বাবা বোধ হয় তোমায় বরফ দিয়েই তৈরী করেছিলেন নাতালিয়া!

হঠাৎ একদিন আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই সে জিজ্ঞাসা করল: এই গ্রীশকা, নতুন বউ নিয়ে ঘর ক'রে কেমন লাগছে?

—ভালই!—সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে গ্রীশকা আকসিনিয়াকে এড়িয়ে যাবার জন্য দ্রুতবেগে তার সোহাগী দৃষ্টির সম্মুখ থেকে খসে পড়ল।

এদিকে স্তেপানও জোড়াতালি দিয়ে দাম্পত্য-বিরোধের একটা রফা করে নিয়েছে। পানশালায় আজকাল সে খুব কমই যাতায়াত করে। একদিন সন্ধ্যাবেলা জাঁতাকলে বসে ফসল মলবার সময়ে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে স্তেপান বল্লে: আকসিনিয়া, এসো গান গাই একটা! গোলযোগ সুরু হবার পর থেকে স্তেপানের মুখে এরকম কথা আকসিনিয়া শোনেনি। দুজনেই একটা গমের খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে পাশাপাশি বসল। স্তেপান একটা রণসঙ্গীত ধরল; একটু পরেই আকসিনিয়া ভরা গলায় তার সঙ্গে যোগ দিল। পাশের জাঁতাকলেই গ্রীগরী কাজ করছিল। দুটোই পাশাপাশি। আত্তাখভদের দ্বৈতস্বর কানে পৌঁছুতেই গ্রীগরী চোখ ফেরাল। আকসিনিয়াকে দেখা যায়। বাহ্যতঃ তাকে সুখী বলেই মনে হয়।

মেলেখভদের সঙ্গে বহুদিন ধরেই স্তেপানের কথাবার্তা বন্ধ। আপন

মনে সে তাঁতাকলে বসে কাজ করে যেত, মাঝে হয়ত কখনও আকসিনিয়াকে দু-একটা টিটকিরি দিলে। প্রত্যুত্তরে আকসিনিয়ার কালো চোখ দুটি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠত। তার সবজে সায়া গ্রীগরীর চোখের সামনে বৃষ্টির মত লহরী তুলত। এক অজানা শক্তি তার ঘাড় বাঁকিয়ে স্তেপানের উঠানে চোখ টেনে নিয়ে যেত। খেয়ালই থাকত না যে নাতালিয়া পাণ্ডেলিমনের সঙ্গে বেড়া সারতে সারতে তার প্রতিটি বাঁকা চাহনি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে। সহোদরের ভাব গতি লক্ষ্য করে পিয়োতরের কুঞ্চিত ঠোঁটে সঙ্গোপনে হাসিরেখা ফুটে উঠত। এ সব লক্ষ্য করবার মত সজাগ দৃষ্টি গ্রীগরী হারিয়ে ফেলেছিল।

দূর ও নিকটের ফসল-মাড়াইর শব্দ নিয়ত ভেসে আসছে। চালকের কর্কশ চীৎকার, চাবুকের সাঁ সাঁ এবং মেশিনের ঘর্ঘর শব্দে পল্লী মুখর হয়ে উঠছে। ফসল সে-বার বেশ ভালই হয়েছে; তাই সেপ্টেম্বরের গরমের মধ্যেও সবাই শস্য ঝাড়ছে। প্রতিটি কজাক পরিবার সে-বারে নিশ্চিন্ত আরামে নিজ নিজ গৃহকোণে দিন গুলজার করছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই কারও।

বৃদ্ধ গ্রীশকা দাঁতের যন্ত্রণায় কিছুটা কাতর হয়ে পড়েছেন। মোখফ কিছুতেই অপমান ভুলতে পারছে না। রুদ্ধরোষে শুধু ফুঁসে বেড়াচ্ছে। গ্রীগরীর'পর ক্রোধ ও ঘৃণা স্তেপানের এতটুকু কমে নি। এখনও ঘুমের ঘোরে সে কম্বল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নাতালিয়া অন্তরালে মাটিতে লুটিয়ে হৃত সুখের শোকে কেঁদে ভাসায়; গ্রীগরীর মনেও শান্তি নেই। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। স্বামীকে সোহাগ করতে গিয়ে আকসিনিয়া চোখের জলে ঘৃণা গোপন করে। দাভিদকে কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যন্ত্রণায় ভরে রাতের পর রাত সে ভালেৎের সঙ্গে কাটায়। কুটিল কটাক্ষ হেনে ভালেৎ বলে: তুই আস্ত একটি গাধা দাভিদ্! দেখ্ না

শীগ্গিরই ব্যাটাদের মুণ্ডু কাটা যাবে। একটা বিপ্লবে ওদের কিছু হবার নয়। ১৯০৫ সালের মত আর একটা আসুক, কড়ায় গণ্ডায় আমরা হিসাব নিকাশ করে নেবো। দেখিস তুই!

এমনি করেই দিন যায় রাত আসে, সপ্তাহ শেষ হয়ে যায়। ধীরমন্থর গতিতে নতুন মাস এগিয়ে আসে। পবনের পিশাচনৃত্যে পল্লী-প্রকৃতি ত্রাসে কেঁপে ওঠে। শরতের সুনির্মল ছবি বুকে ধ'রে ধীর কলোল্লাসে দন ধেয়ে চলে সমুদ্রের পানে।

—ষোল—

অক্টোবর মাসের শেষাশেষি এক রবিবারে ফেদোৎ বদতস্কক কার্য্যোপলক্ষে একবার জিলায় গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল জোড়া চারেক হৃষ্টপুষ্ট হাঁস। বাজারে সেগুলি বিক্রী করে ফেদোৎ বেশ দু-পয়সা কামাই করে গিন্নীর জন্ত ছিট কিনে বাড়ী ফিরবে এমন সময়ে এক আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বলা বাহুল্য, আগন্তুক সে অঞ্চলেরই বাসিন্দা নয়।

—নমস্কার! কালো টুপীতে আঙুল ঠেকিয়ে আগন্তুক ফেদোতকে অভিনন্দন জানাল।

—নমস্কার! জিজ্ঞাসুভাবে ফেদোৎ জবাব দিলে।

—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—পাড়াগাঁ থেকে।

—কোন্ গ্রাম?

—তাতারস্কায়া থেকে।

পকেট থেকে রূপার সিগ্রেট কেস্ বার করে আগন্তুক ফেদোতকে একটি সিগারেট দিলে।

—আপনাদের গ্রামটা কি খুব বড়?

—বড় নয়! প্রায় তিন-শ পরিবার বাস করে।

—মিস্ত্রী আছে?

—আছে।—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আগন্তুকের কালো টুপী এবং প্রশস্ত দাড়া মুখের দিকে চেয়ে ফেদোৎ ঘোড়ায় জিন আটকে দিলে। —এ সব কথা জেনে আপনার লাভ?

—আপনাদের গ্রামে বাস করব বলেই এসেছি। একটু আগেই এই জিলার আতামানের কাছ থেকে এলাম। দয়া করে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন না। সঙ্গে মাত্র আমার স্ত্রী আর কয়েকটা বাক্স আছে।

—বেশ, চলুন।

স্ত্রী এবং বাক্স কয়টি জোগাড় করে তারা রওনা হ'ল। ফেদোতের স্ত্রীদ্বয় নীরবে পেছনে বসে ছিল। একটা সিগ্রেট চেয়ে ফেদোৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, কোত্থেকে আসছেন আপনি?

—রস্তভ্ থেকে।

—সেখানেই থাকেন?

—হাঁ।

ঘাড় বাঁকিয়ে ফেদোৎ আগন্তুককে আরও ভাল ভাবে লক্ষ্য করে নিলে। লোকটি মাঝারি লম্বা, দোহারা চেহারা, কিন্তু তার ঘনসন্নিবিষ্ট চোখ দুটি দেখলে বেশ চতুর বলেই মনে হয়। কথা বলতে গিয়ে লোকটি প্রায়ই হাসছিল। হাসতে গিয়ে ওষ্ঠখানি বাঁকা ভাবে অধর চেপে ধরে। স্ত্রীটি শাল মুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

—আচ্ছা, আমাদের গ্রামে এলেন কেন?

—আমি চাবিওয়ালা। ভেবেছি আপনাদের গ্রামে একটা কারখানা খুলব। ছুতোরের কাজও জানি কিছু কিছু।

ফেদোৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আগন্তুকের সুগোল হাত দু'খানার দিকে চাইল; চোখাচোখি হ'তেই জিজ্ঞাসা করল— মশাইর নাম?

—শুক্‌মান্।

—তা হ'লে আপনি রুশ নন।

—হাঁ রুশ; তবে আমার পিতামহ ছিলেন জার্মান।

অল্পকালের মধ্যেই কেদোৎ জান্‌লে যে অশীপ দাভিদোভিচ শুকমান পূর্বে এক কারখানায় কাজ করত। কিছু দিন সাউথ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ের কারখানা কাজ করেছে। কিছুকাল পরে আলাপ থেমে গেল। কেদোৎ পথিপার্শ্বস্থ একটা ঝরণা থেকে ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে নিলে। ভূরি-ভোজন এবং পথশ্রমে বেশ একটু ঘুমের আমেজ আসছে। রাশটা গাড়ীতে আটকে সে আরাম করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোবার জো রইল না।

—আচ্ছা আপনাদের অঞ্চলে লোকের অবস্থা কেমন? শুক্‌মান জিজ্ঞাসা করল।

—তেমন খারাপ নয়, খাওয়া পরার অভাব নেই।

—কজাকদের মধ্যে তাহ'লে মোটের ওপর অসন্তোষ নেই!

—কেউ কেউ অসন্তুষ্ট আছে বই কি। সবাইকে আর কি করে সন্তুষ্ট করা যায় বলুন।

—তা তো বটেই!—লোকটি জবাব দিল। আবার প্রশ্ন হল—তাহলে আপনার মতে আপনারা ভালই আছেন?

—হাঁ।

—বছর বছর পল্টনে যাওয়া নিয়ে যা কিছু গোলমাল বাঁধে, কি বলেন?

—না, ও আমাদের সয়ে গেছে।

—অফিসারগুলো তেমন সুবিধের নয়, না?

—যা বলেছেন! কেদোৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে উঠল।—খানকির ছেলেরা একেবারেই যাচ্ছে তাই।...সার্ভিসে যাবার বেলা, আমার

ষাঁড়কটা বিক্রী করে ঘোড়া কিনলাম একটা, কর্তাদের সেটা পছন্দ হ'ল না!

—বাতিল করে দিলে?—কৌতূহলী বিস্ময়ে শুকমান বললে।

—একদম সরাসরি। বললে, তার পা'গুলি নাকি কোন কাজেরই নয়। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। কিছুতেই তারা পাশ করতে রাজী হ'ল না! কি অন্যায় বলুন তো!

আলাপ ক্রমেই জমে উঠল। ফেদোৎ গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে খোলাখুলি ভাবে গ্রামের কথা বলতে লাগল। মাঠের জমি অন্যায় ভাবে বাটরা করবার জন্য সে আতামানের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করলে; এবং পোলাণ্ডের যেখানে তাদের রেজিমেণ্ট ছিল সেখানকার বিধিব্যবস্থার প্রশংসা করল। শুকমান ধূমপান করতে করতে ফেদোতের কথা শুনে অনবরত হাসছিল। তার ললাট-রেখার স্পন্দন দেখে মনে হয়, বুঝি কোন আভ্যন্তরীণ চিন্তার তাড়নাতেই অমন হচ্ছে। খুব ভোরেই তারা গ্রামে পৌঁছুলো। ফেদোতের কথামত শুকমান বিধবা লুকিয়েশকার কাছে গিয়ে তার দু-খানা ঘর ভাড়া নিল।

—তোমার সঙ্গে গাড়ীতে কে এলো?—গাড়ী চালিয়ে যাবার বেলা পড়শী একজন ফেদোতকে জিজ্ঞাসা করল।

—একজন এজেন্ট।

—কি রকম 'এজেল?'

—'এজেল' না তোমার মাথা। এজেন্ট, এজেন্ট্ গো! মেশিন বিক্রী করে। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সে দান করে, আর তোমার মত বোকা যারা তাদের কাছে বিক্রী করে, বুঝলে মারিয়া!

পরদিন শুকমান গ্রাম্য আতামানের কাছে গেল। ফিওদর মানিতস্কফের এবার আতামানগিরির তৃতীয় বছর। নবাগতের ছাড়পত্রখানির এপিঠ-ওপিঠ বারবার দেখে তিনি সেখানা সেক্রটারীর

হাতে দিলেন। সেও দেখলে যার কতক নাড়াচাড়া করে। উভয়ে দৃষ্টি বিনিময় করে, আতামান অতঃপর গম্ভীর ভাবে বললেন—আচ্ছা, থাকতে পার।

নবাগত অভিবাদন করে কক্ষ পরিত্যাগ করল। দিন সাতেক লুকিয়েশকার ঘরের বাইরে তার টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। কেবল মাত্র ভেতরে ঠুকঠাক্ শব্দ শোনা যেত। কুড়াল দিয়ে সে দোকানের আসবাবপত্র তৈয়ারী করছিল। নারী মহলের কৌতুহল দু'দিনেই কমে গেল। তখন শুধু ছেলেপিলেরাই দিনভর পরম আগ্রহে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারত।

ভার্জিনের ইন্টারসেশান্ পর্বের দিন তিনেক পূর্বে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রীগরী মাঠে জমি চাষ করতে গেল। পান্তেলিমন অসুস্থ ছিল। কোন মতে লাঠিতে ভর করে ওদের রওনা করিয়ে দেবার জন্য সে উঠানে এল। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। নাতালিয়াকে জ্যাকেটটা পরিয়ে দেবার বেলা ইলিনীচনা কানে কানে বলে দিলেন: বেশীক্ষণ বাইরে থেকো না বৌমা, তাড়াতাড়িই এসো কিন্তু!

মাড় দেবার জন্য কতকগুলি কাচা ভিজা কাপড় নিয়ে দুন্যা দনের দিকে যাচ্ছিল। কাপড়ের ভারে তার কোমর বেঁকে গেছে। পাশ দিয়ে যাবার বেলা নাতালিয়াকে ডেকে বললে: বৌদি মাঠে অনেক টক পালং শাক আছে, আসবার বেলা কিছু তুলে এনো।

তিন জোড়া ষাঁড় লাঙলটা টেনে প্রাঙ্গণের বাইরে নিয়ে এল। মাছ ধরতে গিয়ে সর্দি লেগেছে বলে গ্রীগরী গলায় রুমাল জড়িয়ে নিয়েছে একখানা। মাঝে মাঝে খুক্‌খুক্ ক'রে কাশছে। নাতালিয়া তার পাশে হেঁটে চলছে। থলে ভর্তি খাবার পিঠে ঝুলছে তার।

একটা স্বচ্ছ নীরবতা প্রান্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনাবাদী জমির ওধারে লাঙলের ফলকে ধরিত্রীর বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

যাত্রীরা শিস্ দিচ্ছে। রাস্তার দু-ধারে জন্মেছে শুধু আগাছার ঝোঁপ।

ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে পিয়োতর এবং দারিয়া কারখানায় যাবার জন্য গোছগাছ করতে লাগল।

পিয়োতর গোলা থেকে গম তুলে দিচ্ছে, আর দারিয়া সেগুলি থলে ভরতি করে গাড়ীতে নিয়ে আসছিল। পান্তেলিমন ঘোড়ায় জিন লাগাচ্ছিল।

পিয়োতর কারখানার সাম্‌নে এসে দেখে উঠানে গাড়ী বোঝাই। কাঁটার চারিপাশে বহু লোক ভীড় করে রয়েছে। দারিয়ার হাতে রাশ দিয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পিয়োতর ভালেতকে জিজ্ঞাসা করল—আমার পালা কখন আস্‌বে? মাপ সাপ ভালেতই করছিল।

—সাইত্রিশ জনের পর।

পিয়োতর থলে আনতে গাড়ীতে ফিরল। সহসা একটা গালাগাল কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষ স্বরে ইয়াকভ বলছে শুনল—আগে ঘুমুচ্ছিলে? এখন এসেছ পালা আস্‌বার আগেই মাপাতে। ভাগ হো খোল! (উক্রাইনা-বাসীদের ডাকনাম)। ভাগ বলছি, না হ'লে আচ্ছা করে দেবো দুধা।

পিয়োতর ফিরে দাঁড়াল। মাপবার ঘর থেকে একটা চীৎকার কানে এল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুষির শব্দ। বেশ তাক করেই ঘুষিটা মারা হয়েছে। প্রৌঢ় দাড়িওয়ালা একজন উক্রাইনেৎসি হুমড়ি খেয়ে দরজার বাইরে ছিটকে পড়ল। একহাতে গাল চেপে ধরে তারস্বরে বললে—এর মানে?

—তোর ঘাড় মটকে দেবো শালা শুয়ারকা বাচ্চা!

—মিকিকর আয় তো!—উক্রাইনেৎসি চীৎকার করে ডাকল।

কাঠ খোট্টা চেহারার রগচটা গোলন্দাজ ইয়াকব ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জোয়ান বলে এ অঞ্চলে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। ইয়াকবের গালে ঘোড়ার চাটির একটা দাগ ছিল। সেই জন্ত এই অঞ্চলে সবাই তাকে 'ঘোড়ার নাল' বলে ডাকে। বাইরে এসে আস্তীন গুটিয়ে দাঁড়াতেই গোলাপী শার্ট পরা একজন উক্রাইনেৎসি পেছন থেকে মারলে তাকে এক ঘা। ইয়াকব টাল সামলে নিল।

—ভাই সব, ওরা কজাকদের আক্রমণ করছে।

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে হুড়মুড় করে কজাক এবং উক্রাইনেৎসিরা সেদিকে এগুতে লাগল। কারখানার ফটকের চতুর্দিকে তখন তুমুল হট্টগোল এবং মারামারি শুরু হয়ে গেছে। হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলির চাপে ফটক কড়মড় করতে লাগল। বস্তাটা ফেলে দিয়ে পিয়োতর সেই হট্টগোলের মধ্যে ছুটে এগুল। গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে দারিয়া দেখলে সে ঠেলেঠুলে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঠেলাঠেলির চোটে পিয়োতর কারখানার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতেই দারিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

একটা লোহার ডাণ্ডা উঁচু ক'রে মিমিত্রি কোরশুনফ মেশিন ঘরের কোণ থেকে ছুটে এলো। যে উক্রাইনেৎসিটি পেছন থেকে ইয়াকব্‌কে এক ঘা লাগিয়েছিল মিচকার মারমুখো মূর্তি দেখে সে ভীড়ের মধ্য থেকে সটকে পড়ল। তার ছেঁড়া আস্তীনটা পেছনে পাখীর ভাঙা ডানার মত বাতাসে উড়ছিল। নীচু হয়ে নিকটের গাড়ী থেকে একটা লাঠি নিয়ে আবার সে ছুটল ভীড়ের দিকে। শামিল ভ্রাতৃত্রয় সোরগোল শুনে ছুটে আসছে। ফটকের সামনে একটা মাটিতে-পড়া বস্তায় পা জড়িয়ে বাহুহীন আলেক্সি হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই উঠে সে বাহুহীন হস্তের আস্তীনটা বুকে চেপে গাড়ী-ঘোড়া লাফিয়ে এগিয়ে পড়ল। ছোট ভাই মার্তিনের পান্নামাটা

থলে নীচু হয়ে পড়েছিল। সেটা ঠিক করতে না করতেই কারখানার কাছে এক বিরাট চেঁচামেচি শোনা গেল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে দাদার পেছন পেছন ছুটল। দারিয়া গাড়ীতে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে অসহায়ের মত সব দেখছিল। সেরগেয়ি মোখক ঠোঁট কামড়ে রুষ্টভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছিল। দারিয়া দেখলে, ছেঁড়া সার্টপরা উক্রাইনেৎসিটি মিচকাকে মারবার জন্য লাঠিটা তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাহুহীন আলেক্সির লৌহমুষ্টি তাকে ধরাশায়ী করল। মিচকা উপুড় হয়ে লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে মোখকের পায়ে এক ঘা বসালে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মোখক চার হাত পায়ে কাঁকড়ার মত হামাগুড়ি দিয়ে ওজন করবার ঘরের মধ্যে ঢুকতেই জনতার পায়ের তলায় পড়ে গেল। দারিয়া হো হো করে হেসে উঠল। হাসির আবেগে তার সযত্ন-অঙ্কিত বঙ্কিম ভ্রূযুগল ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল। পিয়োতরের চেহারা দেখে তার হাসি শুকিয়ে গেল। কোনমতে সে হুড়াহুড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দেহ অবসন্নপ্রায়। গাড়ীর তলায় শুয়ে সে রক্ত বমি করতে লাগল। এ কি হলো! এ কি হলো!—বলে আর্তচীৎকার করে দারিয়া তার কাছে এলো। গ্রাম থেকে তখন দলে দলে কজাক লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসছে। ওজন করবার ঘরের কবাটের পাশে একজন তরুণ উক্রাইনেৎসি মাথা ভেঙে পড়ে আছে। সারা মুখ রক্তাপ্লুত। তার রক্তমাখা চুলগুলি মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। দেখে মনে হয়, এবারেই বুঝি তার কৃষক জীবনের অবসান হবে।

কজাকরা ভেড়ার পালের মত উক্রাইনেৎসিদের ঠেলে বয়লার-ঘরের দিকে নিয়ে গেল। বেশ বাড়াবাড়ি হয়েই দাঙ্গা শেষ হবার উপক্রম হল। এক উক্রাইনেৎস্কি বৃদ্ধের চোট তখনও কমে নি। বয়লার-ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে বাইরে

এসেই সে গোলাঘরের দিকে ছুটল। কারখানার সব শস্য সেখানে গোলাজাত। তা কম হবে না। শ' পাঁচেক মণ তো হবেই, বেশীও হ'তে পারে। খড়ের চালের দিকে সেই জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তুলে ধরে বীভৎস চীৎকার করে বৃদ্ধ বললে—এখুনি আগুন ধরিয়ে দেব!

কজাকরা থমকে দাঁড়াল। পূবালী বাতাসে চালের উপর দিয়ে ধূম্রকুণ্ডলী উক্রাইনেৎসিদের মাথার উপর আস্‌ছিল। এই শুক্‌নো খড়ের চালে একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ সারাগ্রাম ছারখার করে দেবে।

ক্ষণিকের জন্য কজাকদের মধ্যে রুদ্ধ রোষের লহরী খেলে গেল। অনেকে ইতিমধ্যেই কারখানার দিকে পেছন হটতে আরম্ভ করেছে; আর উক্রাইনেস্কি বৃদ্ধ মাথার ওপর কাষ্ঠখণ্ড ঘুরিয়ে চীৎকার করে বলছে—জ্বালিয়ে দেবো—জ্বালিয়ে দেবো। এখনও সরে যা বলছি! জ্বালিয়ে দেবো।

সংগ্রামের জন্য ইয়াকফই সর্বপ্রথম বেরিয়ে এল। অন্যান্য সকলে হুটপাট করে তার অনুসরণ করল। বস্তাগুলি তাড়াহুড়া করে গাড়ীতে ভরে উক্রাইনেৎসিরা মাথার উপর কশা ঘুঁরাতে ঘুরাতে ত্রস্ত ভাবে প্রাঙ্গনের বাইরে এসে তীর বেগে গাড়ী ছুটিয়ে গ্রাম সীমান্ত পার হয়ে গেল।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখমুখ পাকিয়ে বাহুহীন আলেকসি তারস্বরে বললে—কজাক ভাই সব, শীগ্‌গির ঘোড়ায় জিন লাগাও।

—ওদের ধাওয়া কর। জনতা চীৎকার করে উঠল।

দিমিত্রি কোরশুনফ প্রাঙ্গনের বাইরে ছুটে বেরুবে এবং অন্যান্য সব তার অনুসরণ করবে ঠিক এমনি সময়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। হাত তুলে সে বললে—থামো!

—কে তুই?—ইয়াকফ জিজ্ঞাসা করল।

—কোন্ গগন থেকে এসেছ চাঁদ!—পাশ থেকে আর একজন বললে।

—গ্রামবাসিগণ। শান্ত হও!

—গ্রামবাসীদের ডাকবার তুই কে?

—কৃষক! দাগা ভু-মা ইয়াকফ!

—হাঁ, যে ওর রা বন্ধ করে!

লোকটি উৎকণ্ঠিত ভাবে হাসল। কিন্তু মুখে আতঙ্কের লেশমাত্র ছিল না। কালো টুপীটা খুলে লোকটি কপালের ঘাম মুছে নিল। অবশেষে তার হাসিরই জয় হল। ওজন করবার ঘরের কবাটের পাশে রক্ত দেখে আগন্তুক টুপী দিয়ে দেখিয়ে বললে—এ সব কি?

—আমরা হোখোলদের সঙ্গে লড়াই করছি।—শান্তভাবে আলেক্সি জবাব দিলে।

—কেন?

—তারা পালা আসবার আগেই মাপাতে চেয়ে ছিল।

ইয়াকফ বুঝিয়ে বললে।

—এক ব্যাটা তো ভয়ে শেষমেশ ঘর জ্বালিয়ে দিতে চাইলে!—অফোয়েস্কা ওজিরক হেসে বললে;—হোখোল শালার ভারী বদমেজাজী।

লোকটি ওজিরভকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কে?

ওজিরক তাচ্ছিল্যের ভাবে জবাব দিলে—আমি তো কজাক্! আপনিও তো কজাক্, আপনি নিশ্চয়ই বেদে নন।

—দুজনেই আমরা রুশ।

—মিথ্যা কথা!—আফোয়েস্কা দৃঢ়ভাবে বললে।

—জানেন, কজাকরা রুশদেরই বংশধর?

—আমি বলছি, কজাকরা কজাকদের বংশধর!

লোকটি তখন বললে: বহুদিন আগেকার কথা, জমিদারদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে এসে সার্ভরা দনের পাড়ে বসতি স্থাপন করে। কজাকরা তাদেরই বংশধর।

—যান, যান নিজের পথ দেখুন! ক্রোধ চেপে আলেকসি বললে।

—শালা আমাদের কৃষক বানাতে চায়! কে এ?

—ও একজন নবাগত। লুকিয়েশকার ওখানে আছে।

উক্রাইনেৎসিদের পশ্চাদ্ধাবন করবার সময় তখন চলে গেছে। উত্তেজিত ভাবে লড়াইয়ের আলোচনা করতে করতে কজাকরা যে যার বাড়ী ফিরল।

—সতেরো—

গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে গ্রীগরী সস্ত্রীক সে রাত্রি যাপন করে। ফুটফুটে ওভারকোটটা গায়ে জড়াতে জড়াতে খগড়াটে গলায় সে নাতালিয়াকে বললে: দেখ নাতালিয়া, না বলে আর পারলাম না! আমার কাছে তুমি এখনও নিতান্ত অপরিচিতার মত। ওই যে চাঁদ দেখছো—তোমার সঙ্গে ওর কোন প্রভেদ নেই। কোন লোককে ত'তান কি ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া, তোমায় দিয়ে কোনটাই হয় না। রাগ কোরো না নাতাশকা, সত্যিই তোমায় আমার ভাল লাগে না। ভেবেছিলাম কিছু বোলব না। কিন্তু যা সত্য, তা লুকিয়েই বা কি লাভ? সত্যি কথা বলতে গেলে এ জীবনের কোন মানে হয় না। তোমার জন্ম আমার দুঃখ্ হয়! কিন্তু কি কোরবো বলো! বিয়ে তো আমাদের কম দিন হয় নি। কিন্তু আজ পর্যন্তও প্রাণে কোন কিছুই টের পেলাম না। আজকের এই প্রান্তরের মতই তা শূন্য, খালি!

নাতালিয়া নীরবে নক্ষত্রখচিত নৈসর্গিক প্রান্তরের পানে এবং তারই দিগন্তে ভাসমান স্বচ্ছ মেঘমালার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অদূরের ওই বনের মধ্যে সারসদল একে অপরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। তাদের তীব্র

কণ্ঠস্বর কাঁসার ঘণ্টা ধ্বনির মত প্রান্তর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

ভোর হবার পূর্বেই গ্রীগরীর ঘুম ভাঙল। প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু হয়ে তার কোটের ওপর বরফ জমে রয়েছে। সারা প্রান্তর সদ্য পতিত তুষার-কণার অবগুণ্ঠনে আবৃত। গ্রীগরীর পাশেই বরফের বুকে একটি খরগোশের পদচিহ্ন স্পষ্ট ভাবে আঁকা রয়েছে।

মিল্লেরোভা যাবার পথে একাকী কোন কজাকের সঙ্গে যদি হোখোলদের কারও সঙ্গে দেখা হ'ত, তাহ'লে কজাককে পথ ছেড়ে দিতে হ'ত। না হ'লেই হোখোলরা তার পেছু নেবে। ইয়াব্লোনস্কায়া থেকে মিল্লেরোভা পর্য্যন্ত পঞ্চাশ মাইল জোড়া উক্রাইনার গ্রামবাসীদের হোখোল বলা হত। কাজেই কজাকরা দল বেঁধেই জিলায় যেত। দল থাকলে আর মারামারি বাঁধলেও ভয় করবার কিছু নেই। হয়ত খোঁচা দিয়ে কজাকরা বললে—এই হোখোল, পথ ছেড়ে দে। শালা, কজাকদের দেশে বাস করবি আর তাদের যেতে দিবি না!

ব্যাপারটা উক্রাইনেৎসিদের মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। দনের পাড়ে পারামনভের কেন্দ্রীয় গোলাতে তাদের শস্য নিয়ে আসতে হবেই! অকারণে লড়াই শুরু হয়ে যেত। অপরাধ তারা হোখোল। আর হোখোল বলেই কজাকদের সঙ্গে লড়াই তাদের করতেই হবে। শত শত বৎসর পূর্বে সে নিপুণ হস্ত কজাকদের দেশে জাতীয় বিরোধের বীজ বপন করে গেছে, কালে তা ভাল ফসলই দিচ্ছিল। এই অন্তর্বিরোধের ফলে কজাকদের নীল রক্ত এবং প্রবাসী মস্কো-উক্রাইনেৎসিদের তাজা রক্ত প্রবাহে দন-অঞ্চল প্রায়ই সরস হয়ে উঠত।

কারখানার লড়াইয়ের হপ্তা কয়েক পরে জিলা থেকে একজন পুলিশ কর্মচারী এবং একজন তদন্তকারী অফিসার গ্রামে উপস্থিত হ'ল। সবাইর আগে স্তকমানের পরেই জেরা আরম্ভ হ'ল। কজাক অভিজাত

বংশের তরুণ তদন্তকারী অফিসারটি জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে আসবার আগে কোথায় থাকতে ?

—রস্তকে।

—১৯০৭ সালে জেল খেটেছিলে কেন ?

—শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে।

—হুঁ ! কোথায় কাজ করতে তখন ?

—রেলওয়ে কারখানায়।

—কি কাজ করতে ?

—মিস্ত্রীর কাজ।

—তুমি তো ইহুদী নও, না ?

—না। আমার মনে হয়…

—তোমার কি মনে বা না হয় তা দিয়ে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। নির্বাসনে ছিলে ?

—ছিলাম।

তদন্তকারী অফিসার মাথা তুলে একটু থেমে ঠোঁট কামড়ে আবার জিজ্ঞাসা করল—আমি বলছি তুমি এ জিলা থেকে ভালয় ভালয় চলে যাও। থেমেই আবার অনুচ্চ স্বরে বললে—না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।

—কেন ?

—মারামারির দিনে কজাকদের কি বলেছিলে তুমি ?

—আমি…

—আচ্ছা যাও এখন।

কোন সরকারী কর্মচারী গ্রামে এলে এই ব্যবসাদরের বাড়ীতেই তাদের কাছারি বসত।

শুকমান মোখভের বারান্দায় বেরিয়ে এসে ভ্রূকুটি গোপন করবার জন্য হেসে চাইলে পশ্চাতের দরজার পানে।

—আঠারো—

ধীরমন্থর গতিতে শীত এগিয়ে এল। কিন্তু দিন কয়েক পরেই হঠাৎ আবার বরফ গলে যায়। গোহালটে দেখা দেয় গরুঘোড়া। হপ্তাখানেক ধরে দক্ষিণাবাতাসে মাটির আদ্রবুক উষ্ণ হয়ে উঠল। প্রান্তরের এখানে-ওখানে দেখা দিল সবুজ ঘাসের অঙ্কুর। সেন্ট মিখাইল দিবস পর্যন্ত বরফ গলল। এর পরই কুয়াসার সাথে সাথে সুরু হ'ল তুষারপাত। দনের তীরে বেড়া-দেওয়া বাগানের মধ্যে এখানে-সেখানে খরগোশের আঁকাবাঁকা পায়ের দাগ পাওয়া যেতে লাগল। রাস্তা পথচারীহীন।

তুষারপাত শুরু হবার পরেই ঝোঁপ ভাগাভাগি এবং পরিষ্কার করবার জন্ত একটা গ্রাম্য বৈঠক বসে। বৈঠকের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ভেড়ার চামড়া এবং দীর্ঘ কোট পরে কজাকরা সভাগৃহদ্বারে জমায়েৎ হতে লাগল। শীতের তাড়নায় বাইরে দাঁড়াবার জো নেই। আতামান এবং সেক্রেটারীর পাশে মাতব্বরেরা আসন নিয়েছেন। তরুণ বা অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠেরা কোট মুড়ি দিয়ে চাপাচাপি করে বসে মৃদুগুঞ্জন সুরু করে দিল।

সেক্রেটারী একমনে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছে; আতামান ঝুঁকে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে নিবিষ্ট মনে তাই লক্ষ্য করছিলেন। উপস্থিত কজাকেরা ততক্ষণ সংযত গুঞ্জনে সভাগৃহ মুখর করে তুলেছে।

—এ বছরের খড়…

—ঠিক বলেছ, মাঠের খড় বেশ ভালই আছে; কিন্তু স্তেপের খড় একেবারেই বাজে!

—কাঠ কাটার কি হবে?

—আচ্ছে!

সভার কাজ আরম্ভ হল। যে যে পরিবারকে যতটা জায়গায় কাঠ কাটতে হবে দাড়িতে হাত দিয়ে আতামান তাই পড়ে শোনালেন

—বললে কি হবে, বৃহস্পতিবার কাঠ কাটা যাবে না!—আতামানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে তোমিলিন তারস্বরে বলবার চেষ্টা করল।

—কেন?

—গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক সেদিন খড় কুড়াতে যাবে।

—তা হ'লে রবিবারেই এসো।

—দিনটা বড়…। কজাক-মহলে মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উত্থিত হ'ল।

বৃদ্ধ মাত্‌ভেই কাশুলিন দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে তোমিলিনকে দেখিয়ে বললে—তুই একেবারেই বোকা নাকি? খড় তো পরে কাটলেও কিছু এসে যাবে না।

—দেমাক করবার মত মাথা তোমারও নয়!

পেছন থেকে বাহুহীন আলেকসি বলে উঠল। আজ ছ-বছর ধরে বৃদ্ধ কাশুলিনের সঙ্গে একখণ্ড জমি নিয়ে আলেকসির বিরোধ চলছে। প্রতি বারেই আলেকসি জমির স্বত্ব দাবী করেছে। কিন্তু বৃদ্ধের তাতে লাঙল দেবার ভুল কোন বছরেই হ'ত না।

—চুপ কর্‌, পাজী।

—দূরে না বললে আজ তোমাকে এমন কিছু দিতাম যা চিরকাল মনে থাকত।—সক্রোধে আলেক্‌সি বললে।

আতামান টেবিলের পর কয়েকটি চাপড় দিয়ে শাসিয়ে বললেন—গণ্ডগোল না থামালে এখুনি আমি পুলিশ ডাকবো। সবাই কিছুটা শান্ত হ'লে আবার বললেন: বৃহস্পতিবার ভোরেই কাঠ কাটা শুরু হবে।

—ভগবানের কৃপায় দিনটা বা সাব্যস্ত হয়েছে।—কজাক মহলে চাপা শ্লেষ শুরু হ'ল।

—আর এক কথা, জিলার আতামানের কাছ থেকে আমি একটা একটা নির্দেশ পেয়েছি। স্বর উঁচু ক'রে আতামান বললেন: যুবকদের শপথ গ্রহণ করবার সময় আসছে। শনিবার জিলার আতামানের কাছে যেতে হবে। বিকেল বেলা তাদের অফিসে হাজির থাকা চাই।

পান্তেলিমন দোরের পাশে একটা জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; মিরণ তারই পাশে জানলার উপর বসে গোঁপ বাঁকিয়ে মৃদু হাসছিল। এরই পাশে তরুণ কজাকরা বসে হাসাহাসি করছিল। সেই দলের মধ্যে আবজেইচ সিনিলিন তার টেকো মাথার পেছনে আতমান রেজিমেন্টের ফার-টুপীটা ঠেলে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্কোচনম্র চিরতরুণ মুখখানি শীতকালের আপেলের মতই টুকটুকে।

আবজেইচ আতামান লেফগার্ড দলে কাজ করেছে। গ্রাম থেকে প্রথমে যারা সেদলে যোগদান করেছে সিনিলিন তাদের অন্যতম। পেতরবুর্গেও কিছু দিন সে ছিল। কিন্তু বাড়ী ফিরে নিজের এমন সব অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুরু করলে যে পড়শীরা শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তাকে "গুলবাজ" উপাধি দিলে। প্রথমে অবশ্য সবাই অবাক হয়ে সিনিলিনের কীর্তিকাহিনী শুনেছে। অনেকে বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল যে সিনিলিনের মত গুলবাজ এ অঞ্চলে জন্মায় নি। তখন তার মুখের উপর শ্লেষ করতেও কেউ বড় দ্বিধা করত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিনিলিন যখন বুঝলে যে, তার কপালে মিথ্যাবাদীর টীকা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মাঝে মাঝে সে ঘুষির আশ্রয়ও গ্রহণ করত। কিন্তু শ্রোতারা যদি কোন মন্তব্য না ক'রে শুধু নীরবে হাসত তা হলে গল্প বলবার উৎসাহ তার দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পেত।

উপস্থিত কজাকদের মুখ নিরীক্ষণ করে সিনিলিন গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করল: সার্ভিসের কথা যদি বলো তাহলে বলবো আজকালকার কজাকরা সেকালের কজাকদের তুলনায় কিছুই না! একেবারেই কোন কাজের নয়। অবজ্ঞার হাসি হেসে সে বললে: কিন্তু একবার আমি ক-খানা হাড় দেখেছিলাম! হাঁ, প্রকৃত সেকেলে কজাক তারাই ছিল।

—হাড় ক-খানা কোথায় কবর দিলে আবজেইচ্?—পাশের কজাককে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে আনিকুশকা জিজ্ঞাসা করল।

—তোমার ঐসব গুল এখন জমা করে রাখো সিনিলিন!—নাসা কুঞ্চিত করে পান্তেলিমন বললে: সামনেই পরবের দিন। আবজেইচের বাক্যবাগিশী স্বভাব পান্তেলিমনের আদৌ ভাল লাগত না।

—মিথ্যে কথা বলা আমার কুষ্ঠিতে নেই।—ধীরভাবে সিনিলিন বললে; কিন্তু আনিকুশকার দিকে চোখ পড়তেই তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। চাপাহাসিতে বেচারী জ্বরের মত কাঁপছে।

—আমার শালার ঘর তুলে দেবার সময় হাড় ক-খানা দেখেছিলাম। মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটা কবর বেরিয়ে পড়ল। হাড় ক'খানা ঠিক এত বড় লম্বা। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে—মাথাটা যেন একটা হাঁড়ি।

জানালা থেকে নেমে মিরণ বললে: এ থেকে কি কোরো পেতরবুর্গে তুমি একটা ডাকাত ধরেছিলে' ছেলেমেয়েদের তাই শোনাও।

—সত্যি কথা বলতে গেলে, বলবার মত কিছুই নেই!—সহসা বিনয়নম্র স্বরে সিনিলিন বললে: তবে শোন বলি! গলায় দু-চারটে খাকাড় দিয়ে আবজেইচ পাজামার পকেট থেকে তামাকের নলটা টেনে বার করল। হাতের তেলোয় কিছুটা তামাক ঢেলে শ্রোতৃমণ্ডলীর পানে হর্ষোৎফুল্ল চোখে চেয়ে সে আরম্ভ করল:

একবার জেল থেকে একটা চোর পালিয়েছিল। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। ধরতে পারবে কেন? কিছুই করতে পারলে না তার।

সব ব্যাটা নাকাল হয়ে গেল। তারপর, একদিন গার্ডদের অফিসার আমাকে ডেকে বললেন—ঘরের মধ্যে যাও, মহামান্য সম্রাট ভেতরে আছেন। তোমার সঙ্গে তিনি স্বয়ং দেখা করতে চান। আমি প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। তবু গেলাম। গিয়ে এটেন্‌শন হয়ে দাঁড়ালাম। আমার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে তিনি বললেন: শোনো আবজেইচ সিনিলিন, আমার রাজ্যের সব চেয়ে বড় চোর পালিয়েছে। খোঁজ করে তাকে ধরে আনো। না পারো আমায় আর মুখ দেখিও না। আমি বললাম: আচ্ছা হুজুর তাই হবে। তার পর জারের আস্তাবলের বাছা তিনটে ঘোড়া নিয়ে তো রওনা হলাম। দিনরাত ছুটছি। দু'দিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন রাতে মস্কোভার কাছে চোরের সঙ্গে দেখা। ধরলাম। বেঁধে গাড়ীতে করে নিয়ে এলাম পেতরবুর্গে। পৌঁছুলাম যখন তখন রাত দুপুর। সারা গায়ে কাদা। সেই ভাবেই সম্রাটের কাছে হাজির হলাম। অনেক কাউণ্ট প্রিন্স আমাকে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমি বুকটান করে চলে গেলাম। কবাটে ধাক্কা মারতেই সাড়া এল। 'ভিতরে আসতে পারি হুজুর!' 'কে তুমি?' 'আমি, ইভান আবজেইচ সিনিলিন।' ভেতরে একটা শব্দ শুনলাম, তার পরই সম্রাট ব্যস্ত হয়ে বললেন: মারিয়া ফিওদরোভনা! মারিয়া ফিওদরোভনা, শীগ্‌গির উঠে একটা স্যামোভার ধরাও, সিনিলিন এসেছে!

পেছন থেকে একদল কজাক হৈ হৈ করে হেসে উঠল। সেক্রেটারী একটি নিখোঁজ পশু সম্পর্কে এজাহার দেখতে দেখতে সহসা থেমে গেলেন। আতামান সারসের মত গলা উঁচু করে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন। সিনিলিন থতমত খেয়ে ক্যাল ক্যাল করে সকলের দিকে তাকাতে লাগল।

—থামো! হলো কি?—সে বললে।

—হো—হো—হো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হি হি হি—

—পেটে খিল ধরে গেছে রে বাবা! ওর জন্যই আজ প্রাণটা যাবে।

—স্তাখোভার ধরাও সিনিলিন এসেছে! হাঃ হাঃ হাঃ—হি হি হি!

বৈঠক ভঙ্গ হ'ল। কজাকরা যে যার বাড়ী চলেছে। স্তেপান আস্তাখফ এবং একজন দীর্ঘকায় কজাক সিঁড়ির উপর পা ঠুকে শরীর গরম করছিল।

সভা থেকে ফিরে পান্তেলিমন সটান ইলিনীচনা ও সে যে-ঘরে থাকে সেই দিকে গেল। ক'দিন ধরে ইলিনীচনার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তার ফুলা মুখ দেখলেই আভ্যন্তরীণ অস্বস্তি এবং যন্ত্রণার আভাষ পাওয়া যায়। খাটের উপর সে উপুড় হয়ে ছিল। পান্তেলিমনের পদধ্বনি শুনেই মুখ ফিরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সে বৃদ্ধের ভিজা দাড়ির পানে চেয়ে রইল। কিন্তু বৃদ্ধের গা থেকে শুধু তুষার কণা ও ভেড়ার চামড়ার তীব্র গন্ধ আসছে।

—গম্ভীর হয়েছে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে আজ!—ইলিনীচনা ভাবল। স্থির ভাবে হাতের সুঁচ-সুতা রেখে জিজ্ঞাসা করল—কাঠ কাটার কি হ'ল?

—বৃহস্পতিবার তারা আরম্ভ করবে ঠিক করেছে। দাড়ি চুলকে বৃদ্ধ জবাব দিল: বৃহস্পতিবাব ভোরেই। তার পর ইলিনীচনার পাশে একটা বাক্সের পর বসে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল—আজ ভাল আছ?

—একই রকম! সারা সংযোগে ভয়ঙ্কর বেদনা।

—বারণ করেছিলাম না জল অনেতে যেও না! সক্ষোভে বৃদ্ধ বললে: দড়ি পাকাতে তো আর যারা ছিল তারাও পারতো!...নাতালিয়া আছে কেমন?—বিছানার দিকে ঝুঁকে সহসা বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।

—আমি কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছি না! এই স্রো গত

গরুও আবার কেঁদেছে! উঠোনে গিয়ে দেখি কে যেন গোলাঘরের দরজা হাঁ করে খুলে রেখে গেছে। ভেতরে গিয়ে দেখি নাতালিয়া দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? বললে, ভারী মাথা ধরেছে। একটি কথা মুখ থেকে বার করবার জো নেই।

—কোন অসুখ করেছে নাকি?

—অসুখ না ছাই! হয় কেউ গুন্ করেছে, না হয় ঐ গ্রীশকাটা···

—আবার যাতাযাত শুরু করেছে নাকি সেই মাগীটার কাছে? শুনেছ নাকি কিছু?

—কি মাথামুণ্ডু যে বলো! সন্ত্রস্ত ভাবে ইলিনীচনা বললে: ক্ষেপার হয়েছে কি করতে? সে গোবরগণেশ নয়! না বাপু, আমি কিছুই শুনি নি।

পান্তেলিমন আরও কিছুকাল স্ত্রীর পাশে বসে রইল। বেরিয়ে এসেই দেখে গ্রীগরী কাস্তে শান্ দিচ্ছে; আর নাতালিয়া পাশে বসে তাতে চর্বি মাখাচ্ছে। পান্তেলিমন পাশ দিয়ে খুঁড়িয়ে যাবার বেলা উৎসুক নয়নে চাইল তাদের পানে। তাকে দেখে নাতালিয়া আরও ঘাড় নীচু করল। তার পীতাভ গাল দুখানি হেমন্তের পাতার মত শ্রীহীন বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাস কয়েক ধরে চেহারা এত শুকিয়ে গেছে যে লক্ষ্য পড়ে। দৃষ্টিতে নতুনতর এক অশান্তির ইঙ্গিত। বৃদ্ধ দরজার সামনে এলো।

—মেয়েটাকে হারামজাদা মেরে ফেলছে। মনে মনে ভাবল। আবার ফিরে চাইতেই নাতালিয়া ঘাড় নীচু করে হাতের কাজ বন্ধ করে চুপ করে রইল।

হঠাৎ চটে বৃদ্ধ ভারস্বরে বললে: চুলোয় যাক্, রেখে দাও ওসব! গ্রীগরী বিমূঢ়ভাবে ঘাড় উঁচু করল।

—দু-দিকেই ধার দেবো বাবা?

—আবার বলছি রেখে দে! কাঠ কাটবার জোগাড় কর! স্লেগা খারাপ হয়ে পড়ে আছে, আর উনি দু'দিকে ধার দিচ্ছেন!—অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বৃদ্ধ বলল। কি বলবার জন্ত ইতস্ততঃ করে বৃদ্ধ দাঁড়াল, কিন্তু কোন কথা না বলে পরক্ষণেই চলে গেল। গ্রীগরী শুনতে পেল বাকী খালটা পিয়োতরের পর দিয়েই যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ভোর হবার ঘণ্টা দুয়েক আগেই ইলিনীচনা শয্যা ত্যাগ করে দারিয়াকে ডাকল: শীগ্‌গির উঠে উনোনে আগুনে রাওগে। দারিয়া সেমিজ না ছেড়েই ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। সিগ্রেট ধরিয়ে পিয়োতর স্ত্রীকে বললে: একটু হাত চালিয়ে কাজ করো!

—নাতাশকাকে ডেকে তুলতে পারো না! কাজের জ্বালায় আমি মরবো নাকি?—কোন্দল করে দারিয়া বলে।

—তুমি গিয়ে ডাকলেই পারো!—পিয়োতর পরামর্শ দিলে। কিন্তু পরামর্শের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিজেই নাতালিয়া উঠেছে। জ্যাকেট ছেড়েই সে জ্বালানি কাঠ আনতে গেল। রান্নাঘর থেকে টাটকা কভাসের গন্ধ আসছে। দারিয়া জুতা মচ্‌মচ্‌ করে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। তার গোলাপী সেমিজের অন্তরালে ঋজু স্তনদ্বয় কাঁপছে। দাম্পত্য জীবনে দারিয়া মোটেই অসুখী নয়; বা তার মাদকতা আজিও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তার উইলো গাছের মত নমনীয় দেহবল্লরী আজিও তরুণীর মতই অম্লান।

খাবার তৈয়ারী হ'তে না হ'তেই ভোর হয়ে গেল। পান্তেলিমন ছুটে এসে ঘোলে চুমুক দিল। গ্রীগরী বিষণ্ণ মুখে আস্তে খাচ্ছিল। দুন্যা দাঁতের ব্যথায় মুখ বেঁধে রেখেছে। পিয়োতর বেচারীকে ক্ষেপিয়ে রহস্য করছিল।

রাস্তা স্লেগীর ঘর্ঘর শব্দে মুখর হয়ে উঠল। এই পাণ্ডুর উষার একখানির পর আরেকখানি বলদেটানা স্লেগা বনের দিকে যাচ্ছে।

গ্রীগরী ও পিয়োতর তাদের স্লেগা ঠিকঠাক করতে গেল। স্ত্রীর দেওয়া রুমালখানা যাবার পথে গ্রীগরী গলায় বেঁধে নিলে। তারস্বরে চীৎকার করে একটা দাঁড়কাক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পাখীটাকে লক্ষ্য করে পিয়োতর বললে—দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে গরমের খোঁজে!

একথণ্ড তামাটে মেঘের অন্তরালে তরুণীর হাসির মত ম্লান একফালি চাঁদ লেগে আছে! চিম্‌নী থেকে ধূম্রকুণ্ডলী স্তম্ভাকারে ঊর্ধ্বে উঠে সেই ক্ষীণ চন্দ্রকলাটুকু মলিনতর করে রেখেছে। মেলেখফ বাড়ীর সোজাসুজি বিপরীত দিকের দনের জল তখনও ভালভাবে জমে নি। কিনারায় বরফ জমে শক্ত হয়েছে। কিন্তু মাঝ-গাঙের ওধারে কালো পাহাড়ের গায়ে বরফের গহ্বর দেখলে গা শিউরে ওঠে। মনে হয় কোনও বিরাট দানব হাঁ করে আছে।

পান্তেলিমন নিজেই জরাজীর্ণ ষাঁড় দুটোকে নিয়ে আগে চলল। ছেলেরা রইল পিছনে। নদী পার হবার ঢালু জায়গায় আনিকুশকার সঙ্গে গ্রীগরী ও পিয়োতরের দেখা। আনিকুশকার রুগ্না স্ত্রী রাশ ধরে আছে; আর নিজে সে হেঁটে চলেছে ষাঁড়ের সঙ্গে। পিয়োতর ডেকে বলল—এই পড়শী, তোমার বউও তোমার সঙ্গে যাবে নাকি?

আনিকুশকা হেসে ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ফিরল।

—হাঁ, একটু গরম হওয়া দরকার তো!

—ও বউ দিয়ে আর গরম হ'তে হবে না; বড্ড রোগা!

—তা বটে! এত করে ওট্ খাওয়াচ্ছি কিন্তু কিছুতেই একটুও মোটা হ'ল না।

তিনজনেই একসঙ্গে চলল।

নীহারকণার একটি অম্লান শুভ্ররেখা ফিতার মত বনটি ঘিরে রেখেছে। আনিকুশকা মাথার উপরকার ডালে চাবুক মারতে মারতে

সামনে এগিয়ে গেল। ঝিরঝির করে তুষারকণা তার স্ত্রীর মাথার ওপর ঝড়ে পড়তে লাগল। তুষারকণা ঝেড়ে সে ধমক্ দিয়ে বললে: বেশ, ও কোন্ অসভ্য ইয়ার্কি?

—বরফের মধ্যে ওটাকে ফেলে দে'।—পিয়োত্তর বললে।

রাস্তার মোড়ে স্তেপান আস্তাখভের সঙ্গে দেখা। গরুর গাড়ী নিয়ে স্তেপান গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ফারের টুপীর তলায় তার কোঁকড়ানো চুল সাদা আঙুরের থোকার মত ঝুলছে। পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা আনিকুশকা জিজ্ঞাসা করল: পথ হারিয়েছো নাকি স্তেপান?

—পথ হারিয়েছি না তোমার মাথা! একটা ঢিবিতে ধাক্কা লেগে স্লেগা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে আবার গ্রামে যেতে হবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে স্তেপান পিয়োত্তরের পাশ কাটিয়ে গেল।

—গাড়ীটা রেখে গেলে?

হাতের ইসারায় সমর্থন জানিয়ে স্তেপান ষাঁড়টার পিঠে চাবুক লাগাল। গ্রীগরীর দিকে চোখ পড়তেই এক তীব্র কটাক্ষ হেনে স্তেপান পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিছুটা সামনে এসেই দেখে পথের মাঝখানে একখানা স্লেগা পড়ে আছে। আকসিনিয়া পাশে দাঁড়ান। এক হাতে গায়ের ভেড়ার চামড়ার প্রান্ত টেনে ধরে সে পথবরাবর তাদেরই পানে চেয়েছিল।

—এই, পথ ছাড়ো না-হয় গায়ের ওপর দিয়েই গাড়ী চালিয়ে দেবো; তুমি তো আর আমার গিন্নী নও!—আনিকুশকা বললে। আকসিনিয়া হেসে একটু সরে উলটানো স্লেগাখানার ওপর বসল। পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় আনিকুশকা বললে—বউ না থাকলে তোমাকেই নিয়ে যেতাম!

পিয়োত্তর আকসিনিয়ার কাছে এসেই চটকরে মুখ ফিরিয়ে চাইলে গ্রীগরীর পানে। গ্রীগরী কিছুটা পেছনে পড়ে গেছল। অর্থহীন ভাবে হাসছিল সে। মুখে চোখে উদ্বেগ এবং আগ্রহের আভাষ।

—একি! লেগাখানা ভেঙে গেছে নাকি?—পিয়োতর জিজ্ঞাসা করল। আকসিনিয়া সংক্ষেপে জানাল—হাঁ।

উঠে দাঁড়িয়ে পিয়োতরের দিকে পেছন দিয়ে গ্রীগরীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে আকসিনিয়া বললে—গ্রীগরী পান্তেলিয়েভিচ একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

পিয়োতরকে ষাঁড় দুটোর দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে গ্রীগরী ফিরলে আকসিনিয়ার দিকে। পিয়োতর মুচকি হেসে গাড়ী চালিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ দু-জনেই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে আকসিনিয়া তার টলটলে চোখদুটি ফেরাল গ্রীগরীর দিকে। সঙ্কোচ ও পুলকে তার গাল দুখানি লাল হয়ে উঠল; ঠোঁট শুকিয়ে এল। ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগল।

রাস্তার মোড়ে আনিকুশকা এবং পিয়োতর ওক গাছের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—শোন গ্রীশ্‌কা! যা ভাল বোঝ করতে পার, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে জীবন বইবার মত এতটুকু শক্তিও আমার নেই। দৃঢ়ভাবে আকসিনিয়া বললে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎসুক নয়নে সে গ্রীশকার পানে চেয়ে রইল।

গ্রীগরী কোন জবাবই দিলে না। একটা নিবিড় স্তব্ধতা মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই শূন্য হাহাকার গ্রীগরীর কানে বাজতে লাগল। সমতল পথ-রেখা, পাণ্ডুর আকাশ, সেই মুহ্যমান শুষ্ক কাননে টুঁশব্দনেই; হঠাৎ কা-কা রবে মাথার ওপর দিয়ে একটা দাঁড়কাক উড়ে গেল। স্বপ্নোত্থিতের মত চমক ভেঙে গ্রীগরী নীরবে চাইল উড়ন্ত দাঁড়কাকটার পানে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মনে মনে বলল: গরম পড়তে দেরী নেই। দাঁড়কাকটা গরমের দিকেই উড়ে যাচ্ছে। চমকিত হয়ে সে

হোহো করে হেসে উঠল। কি ভেবে ফিরে সহসা থেমে বুড়ো বৃষ্টিতে আকসিনিয়ার পানে চেয়েই ছোঁ মেরে তাকে বুকের মধ্যে টেনে আনল।

—উনিশ—

শীতকালে প্রতি সন্ধ্যায় লুকিয়েশকার বাড়ীতে স্তকমানের ঘরে বেশ একটি আড্ডা জমত'। খৃস্তোনিয়া, ভালেৎ, সদাহাস্যময় দাভিদ্ (আজ মাসতিনেক যাবৎ ভবঘুরে) এবং ইঞ্জিন-চালক ইভান আলেক্সিয়েভিচ কোৎলারফের হাজিরায় বাধা ছিলো না; মাঝে মাঝে মুচি ফিলকাও আসত। মিশা কোশিভয়ও নিয়মিত সভ্য। 'তার পল্টনের ট্রেনিং এখনও হয় নি।

প্রথমে শুধু তাস খেলা চলত; মাঝে মাঝে স্তকমান নেক্রাশভের কবিতার বই বার করত। কবিতা আবৃত্তি করবার সময় সকলের ভালই লাগত। বড়দিনের সময় স্তকমান একখানা জরাজীর্ণ তেল-চিরকুট বাইবেল বার করে দিলে। কোশিভয় কিছুদিন চার্চ স্কুলে পাঠ নিয়েছে। নিতান্ত অবজ্ঞারভাবে সেই 'তেলচিরকুট পাতা উলটে তা থেকে সে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পড়ে শোনাল।

—পাতাগুলি এমনি তেলো যে এ দিয়ে ভার্মিসিলি তৈরী করা যায়। বিরক্তভাবে সে বললে।

বিকট হাসি হেসে খৃস্তোনিয়া লুটিয়ে পড়ল। দাভিদের সদাহাস্যময় মুখখানি আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। এই আনন্দ-কলরোল না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্তকমান বললে: এইখানা পড় মিশা। খুব ভাল লাগবে; কজাকদের সম্বন্ধেই লেখা।

টেবিলের পর ঝুঁকে বানান করে কোনমতে কোশিভয় পড়ল:

হ'ল কজাকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শিশা উৎসুকভাবে চারিদিকে চাইতেই পাশ থেকে গম্ভীরভাবে ইঞ্জিন-ম্যান কোৎলারক্ বললে—পড়।

কজাকদের অতীত মুক্ত জীবনের কাহিনী, পুগাচক্, স্তেঙ্কা রাজেন এবং ভাশিলি বুলোভিনের জীবনকথা তাদের উদ্দীপিত করে তুলল। তিনটি সন্ধ্যা তারা অতি কষ্টে বইখানি পড়ল। তারপর এল বর্তমান কালের ইতিহাস। অজানা লেখক তীব্র ভাষায় কজাকদের ক্লেশবহুল জীবনযাত্রার কঠোর সমালোচনা করেছেন। চতুর এবং বলিষ্ঠ ভাষায় শাসকমণ্ডলী এবং শাসন-পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। জারের গভর্ণমেণ্ট এবং জারের দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হওয়াই যে আধুনিক কজাক-বৃত্তির চরিতার্থতা—তাও তার সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায় নি।

শ্রোতৃমণ্ডলী উষ্ণ হয়ে বাদানুবাদ শুরু করল। পাইপ মুখে দরজায় বসে স্তক্‌মান্ হাসছিল।

—ঠিক লিখেছে। সবই সত্যি কথা!—খৃস্তোনিয়া জোরগলায় বললে।

কোৎলারক নিষ্ঠাবান্ কজাক্। কজাক-ঐতিহ্য তার অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে আছে। কজাকদের সমর্থনকল্পে সে-ই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। গোল গোল চোখ পাকিয়ে সে বললে: তুমি একটি আস্ত কৃষক খৃস্তান। তোমার মধ্যে কজাক-রক্ত মাত্র ফোঁটা দুয়েক। ভরোনিশের এক কৃষকের সঙ্গে তোমার মা'র বিয়ে হয়েছিল।

—গাধা একেবারেই গাধা তুই!—খৃস্তোনিয়া উত্তর করল।

—চুপ কর চাষা!

—কেন চাষীরা কি তোমাদের মতই মানুষ নয়!

—হুঃ! একটা মাদুরের মধ্যে কিছু আগাছা পুরে চাষীদের তৈরী করা হয়েছে!

—পেত্রবুর্গে কাজ করবার সময় অনেক কিছু দেখেছি, তাছাড়া খুডোনিয়া বললে : একবার আমরা জারের প্রাসাদে পাহারা দিচ্ছিলাম। ঘোড়ায় চড়ে এদিকে দু'জন যেতাম ওদিকে দু'জন যেতাম। এইভাবে পাহারা দেওয়া হত। পরস্পর দেখা হ'লেই জিজ্ঞাসা করতাম—সব ঠিক, না কোন গণ্ডগোল আছে কোথাও? তারপর আবার যে যার দিকে চলে যেতাম। থেমে একটু কথা বলবার হুকুম ছিল না। চেহারা দেখে তারা নিয়েছে আমাদের। দরজার কাছে পাহারা দেবার জন্ম যে দু'জনকে নিত, তাদের চেহারা এবং মুখ এক হওয়া চাই। এজন্ম নাপিত একবার আমার দাড়িতে কলপ দিয়ে দিলে। যে কজাকের সঙ্গে আমার পালা পড়ল, দাড়িতে মিললো না তার সঙ্গে। তার দাড়িটা ছিল পাটকেল রঙের। সারা রেজিমেণ্টটা খুঁজেও অমন দাড়ি পাওয়া গেল না। কাজেই কমাণ্ডার আমাকে দাড়িতে কলপ দেবার জন্ম নাপিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আয়নায় মুখ দেখে বুক ফেটে কান্না এল। রাগে জ্বলতে লাগলাম!

—হোলো, কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের কথার কি সম্পর্ক আছে। কি বলতে চাও তুমি? কোৎলারফ বাধা দিয়ে বললে।

—কজাকদের সম্বন্ধেই বলছিলাম। একবার আমাদের বাইরে পাহারা দেবার পালা পড়ল। আমি এবং আমার সহকর্মী, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময়ে দেখি কয়েকজন ছাত্র দৌড়ে আসছে। আমাদের দেখেই তারা চীৎকার করে বললে—হেই! আবার বললে, হেই! আমরা কোন কিছু বলবার আগেই তারা এসে ঘিরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল—ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছ কেন কজাক ভাই!—একজন আমার তরবারির উপর হাত দিয়ে বলল—আমাকে সন্দেহ কোরো না কজাক ভাই, আমি কামেনস্কায়া জেলার লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমরা যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম; কিন্তু এর মধ্যে একজন একখানা

দশ রুবলের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললে : আমার বাবার মঙ্গলার্থে সরাব খেয়ো ভাই! একখানা ছবি বার করে বললে : এই আমার বাবার ছবি। নোটটা না নিয়ে পারলাম না। ছাত্রদল চলে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে একজন অফিসার ছুটে এসে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল : ওরা কে? আমি বললাম, কয়েকজন ছাত্র এসেছিল। আমি নির্দেশ অনুযায়ী তরবারি কোষমুক্ত করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

—ডিউটি শেষ হ'লে কর্পোরালকে বললাম, আমরা দশ রুবল আয় করেছি। ছবিখানা দেখিয়ে বললাম এর মঙ্গলার্থে আমরা খাবার খেতে চাই। সন্ধ্যাবেলা কর্পোরাল কিছু ভোদকা নিয়ে এলেন। কয়েকদিন ধরে বেশ আরামেই কাটালাম। পরে জানলাম ছাত্রটি আমাকে জার্মানীর প্রধানতম বিদ্রোহীর ছবি দিয়ে গেছে। শিয়রে সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। লোকটা বেশ, কটা-কটা দাড়ি, দেখতে অনেকটা বেনিয়ার মত। কমাণ্ডার একদিন ছবিখানা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছবি কোথায় পেলে? সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি তো হেসে অস্থির : কার ছবি জানো? এ ওদের কার্ল, কি ছাই, ভুলে গেছি নামটা। কি যেন…?

—কার্ল মার্কস?—হেসে শুকমান্ বললে।

—হাঁ হাঁ হাঁ, কার্ল মার্কস। সোৎসাহে খুস্তোনিয়া বলে উঠল। —কিন্তু আমরা সে দশ রুবলেরই মদ খেয়েছিলাম। সেই দাড়িওয়ালা কার্লের মঙ্গলার্থেই আমরা সরাব খেলাম। হাঁ, খেয়েছিলাম!

—লোকটা তার যোগ্য বটে!—সিগ্রেটের পাইপটা আঙুলে নাড়াচাড়া করে হেসে শুকমান বললে।

—কেন, কি করেছে সে?—কোৎলারক জিজ্ঞাসা করল।

—পরে বলব, আজ রাত হয়েছে!

বহুভাবে পরীক্ষিত হবার পর মাত্র বাছা দশটি লোক শুকমানের দোকানে নিয়মিতভাবে সমবেত হ'তে লাগল। শুকমানই এদের প্রাণ, এদের মধ্যমণি। অটুটভাবে সে লক্ষ্য পথে চলেছে। পোকা যেমন কাঠের মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, শুকমানও এদের সরল বিশ্বাসকে নানাভাবে ধ্বংস করে, অন্তরে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার বীজ বপন করে দিল। প্রথমে অবিশ্বাসের কঠিন লৌহবর্ম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু শুকমানকে ব্যর্থ করতে পারে নি।

—বিশ—

দনের বাম তীরে উত্তর দন-অঞ্চলের প্রধান বস্তি ভেশেনস্কায়া পল্লী। ভেশেনস্কায়া ভস্মীভূত চিগনাকেরই নবরূপ। প্রথম পেতরের রাজত্বকালে চিগনাক পল্লী ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়। বর্তমান ভেশেনস্কায়া সেই ধ্বংস-স্তূপেরই নয়া-রূপ। যে প্রধান জলপথ ভরোনিশ এবং আজফ সাগরের যোগসাধন করেছে ভেশেনস্কায়া পূর্বে সে পথে একটি বিশিষ্ট বন্দর ছিল। ভেশেনস্কায়ার সামনে দন তাতারদের ধনুকের মত বেঁকে গেছে। সোজা ডান দিকে বেঁকে বাজ্‌কা গ্রামের পাশ ঘুরে আবার সোজা হয়ে বাম তীরের খড়িমাটির পাহাড়ের পাশ দিয়ে সে আজকের সুনীল জলরাশির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ তীরে ঘনবসতিপূর্ণ কজাক পল্লী। বামতীরে মাঝে মাঝে কোথাও দু'একটা বস্তি কদাচিৎ দেখা যায়। দনের পাটল বালিয়াড়ির বুকে বৈচিত্র্যহীন এই বিরাট কজাক পল্লী ভেশেনস্কায়া দাঁড়িয়ে। সারা গ্রাম খুঁজে একটি ফলের বাগান পাওয়া যাবে না। স্কোয়ারের মধ্যে অতি পুরাতন গীর্জা। তা থেকে দনের সমান্তরালে উত্তর দিকে ছয়টি সোজা রাস্তা চলে গেছে।

ব্যাক্কার কাছে ভেশেনস্কায়ার প্রান্ত দেশে ভাঁটির সমযকার দনের মত স্বল্পপরিসর একটি হ্রদ। ভেশেনস্কায়ার একপ্রান্ত এই হ্রদ পর্যন্ত গেছে। কাঁটাওয়ালা গুল্মবহুল ক্ষুদ্রতর একটি স্কোয়ারের মধ্যে দ্বিতীয় একটি গীর্জার সবুজ গম্বুজ এবং সবজে চাল উইলো গাছের স্নেহছায়া তলে দাঁড়িয়ে। গ্রামের উত্তর দিকে গাঢ় পীতবর্ণের খানিকটা বালুকাময় পতিত জমি; এখানে ওখানে দু-একটি শীর্ণ পাইনের আবাদ; দু-একটি মরচের মত লালচে জলের ডোবা। ওরি মধ্যে কোথাও হয়ত আবার মরুদ্যানের মত দু'একটি পল্লী, মাঠ বা দু-চারটে উইলো-ঝোঁপ।

ডিসেম্বর মাসের এক রবিবারে গ্রাম থেকে প্রায় শ-পনেরো তরুণ কজাক গীর্জার বাইরে স্কোয়ারের মধ্যে জমায়েৎ হ'ল। উপাসনা শেষে প্রৌঢ় কজাক সিনিয়র সার্জেন্টের আদেশে তরুণ কজাক দল দুইটি অসম দীর্ঘ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াল। সার্জেন্টকে দেখে সাহসী বলেই মনে হয়। বুকে তার দীর্ঘ সার্ভিসের প্রতীক বহু পুরস্কার। অনুষ্ঠানোচিত পোষাকে, নতুন একটা অফিসারের ক্লোক পরে' আতামান সদলবলে গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। পশ্চাতে এলো তার কর্ম্মচারিদল।

দু-এক পা পেছনে সরে সিনিয়র সার্জেন্ট জোর গলায় আদেশ দিলেন —ডাইনে ফের! কুইক মার্চ্চ।

একে একে সকলেই উন্মুক্ত দরজা দিয়ে গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গেই গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হ'ল। পাদরী শপথ গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করলেন। গ্রীগরীর সেদিকে অণুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। মিসিত্রি কোরশুনফ গ্রীগরীর পাশে ছিল। কষা নতুন জুতার জন্য বেশ কষ্ট পাচ্ছিল বেচারী। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। গ্রীগরীর তোলা হাতখানি অসাড় হয়ে এল। অলক্ষ্যে জট পাকানো অসংলগ্ন চিন্তাধারা মনের মধ্যে আনাগোনা করছে। ক্রুশের নীচু দিয়ে যাবার

বেলা বহু অধরসিক্ত সেই আম্র রজতখণ্ড চুম্বন করতে গিয়ে আকসিনিয়া এবং স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বন, তার পাটল গাছের গুড়ি ও শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন শাখা-প্রশাখা এবং আকসিনিয়ার কালো চোখের করুণ চাহনির ছবি মানসপটে তড়িৎপ্রবাহে খেলে গেল। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে আবার তাদের স্কোয়ারের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করান হ'ল। সিনিয়র সার্জেণ্ট নাক ঝেড়ে অলক্ষ্যে কোটের প্রান্তে আঙুল মুছে তাদের সম্বোধন করে বললেন :

এখন আর তোমরা ছেলেমানুষ নও। যে শপথ আজ গ্রহণ করেছ তার অর্থ বুঝবার মত বয়স তোমাদের হয়েছে। আজকে তোমরা রীতিমত কজাক ; কাজেই পিতামাতার আদেশ পালন করা এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা তোমাদের অন্যতম কর্তব্য। যখন ছোট ছিলে, রাস্তায় মাঠে খেলাধূলা করে বেড়িয়েছ ; কিন্তু আজ তোমাদের ভবিষ্যৎ সার্ভিসের কথা ভাবতে হবে। এক বছরের মধ্যেই তোমাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করবার জন্য আহ্বান করা হবে। এই পর্যন্ত বলে সার্জেণ্ট আবার নাক ঝাড়লেন এবং হাঁত কচলে দস্তানা বার করে তার বক্তব্য শেষ করলেন : তোমাদের মা-বাপকে আজ তোমাদের সাজসজ্জার বিষয় চিন্তা করতে হবে। একটা ভাল ঘোড়া যাতে তোমাদের দিতে পারেন। তাছাড়া সাধারণ ভাবে…আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই। ভগবান তোমাদের সহায় হউন!

গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে মিচকা এবং গ্রীগরী তাতারস্কায়ার দিকে রওনা হ'ল। গ্রামে পৌছুতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গ্রীগরী জানালা দিয়ে উঁকি মারল। ঝুলান ল্যাম্প থেকে একটা স্তিমিত আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। পিয়োত্তর জানালার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজার পাশ থেকে সম্মার্জনী তুলে গ্রীগরী বুটে জড়ান তুষার কণা ঝেড়ে ফেলে রান্নাঘরে

প্রবেশ করল। গ্রা থেকে বাষ্প-কুণ্ডলী উত্থিত হচ্ছে। ঘরে ঢুকে গ্রীগরী জানাল: আমি এসেছি।

ব্যগ্রভাবে পিয়োত্তর বললে—ওঃ খুব তাড়াতাড়ি এসেছিস তো! শীতে জমে গেছিস, না?

পান্তেলিমন মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। দারিয়া বসে চরকায় সুতা কাটছে। নাতালিয়া গ্রীগরীর দিকে পেছন দিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রীগরী এসেছে টের পেয়েও সে ফিরল না। রান্নাঘরের চারি পাশে চেয়ে গ্রীগরী জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইল পিয়োত্তরের পানে। দাদার উদ্‌গ্রীব ভাব দেখেই বুঝতে বাকী রইল না যে একটা কিছু হয়েছে।

—শপথ নিয়েছিস?—পিয়োত্তর জিজ্ঞাসা করল।

—হাঁ।

গ্রীগরী সময় কাটাবার জন্য কার কোটটা খুলতে লাগল। এই নীরব এবং হৃদয়হীন অভ্যর্থনা সম্পর্কে তার মনে বহু সম্ভাবনার কথাই আনাগোনা করতে লাগল। ইলিনীচনা ভাল ঘরটা থেকে উৎকণ্ঠিত ভাবে বেরিয়ে এল। বাবার পাশে বেঞ্চিতে বসতে বসতে ভাবলে গ্রীগরী, নাতালিয়াই হয়ত এর হেতু।

—ওকে খেতে দাও কিছু বউ! মা গ্রীগরীর দিকে ইঙ্গিত করে দারিয়াকে বললে। দারিয়া সুতাকাটা রেখে স্তোভের কাছে গেল। ছাগল এবং তার নবপ্রসূত শাবকটির শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে অন্য কোন সাড়াশব্দ নেই। সারা ঘরখানি একটা অবাঞ্ছিত স্তব্ধতায় থমথম করছে।

কোলে চুমুক দিতে গিয়ে আড়চোখে চাইলে গ্রীগরী নাতালিয়ার পানে। মুখ দেখা গেল না। গ্রীগরীর দিকে পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে হাতের সূঁচসুতার দিকে ঝুঁকে বসেছিল সে। পান্তেলিমনই আর কথা না বলে থাকতে পারল না। এই অবাঞ্ছিত মৌনতা ভঙ্গ

করে কয়েকবার গলা ঝেড়ে বলল: নাতালিয়া তার বাপের বাড়ী যেতে চায়।

গ্রীগরী কোন জবাব না ক'রে রুটির টুকরাটা দিয়ে প্লেটখানা সাফ করে মুছে নিল।

—সে যেতে চায় কেন? পান্তেলিমনের থুতনি কেঁপে উঠল।

এ লক্ষণ আসন্ন ঝড়েরই পূর্বাভাষ। দাঁড়িয়ে ক্রশ করে গ্রীগরী বললে: তার আমি কি জানি?

—কিন্তু আমি জানি!—কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বৃদ্ধ বললে।

—চেঁচামেচি কোরো না!—ইলিনীচনা বাধা দিয়ে বললে।

—হাঁ চেঁচামেচি করে আর কি লাভ?—জানালার কাছ থেকে পিয়োতর বলে উঠল।—ভালবাসার পরই সবকিছু নির্ভর করে। যদি এক সঙ্গে থাকতে চাও, থাকতে পার! না চাও ভগবান যা করবেন তাই হবে!

—না, আমি নাতালিয়ার কথা বিচার কচ্ছি না। সে যদি লক্ষীছাড়া বা ভগবানের কাছে দোষী হ'ত, তাহলেও আমি তার কথা ধরতাম না। কিন্তু এই শুয়োরটা…গ্রীগরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালে পান্তেলিমন। গ্রীগরী তখন স্তোভের কাছে বসে হাত-পা সেঁকছে।

—কেন আমি কি দোষ করেছি? গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল।

—জানো না কি দোষ করেছ? আর ন্যাকামো করো না!

—না, জানি না।

পান্তেলিমন আসন ছেড়ে লাফিয়ে বেঞ্চিটা কাত করে ফেলে সটান গ্রীগরীর দিকে রুখে গেল।

—শোনো আমার স্পষ্ট কথা।—ধীর শান্তভাবে বৃদ্ধ বললে: যদি নাতালিয়াকে নিয়ে থাকতে না চাও, এ বাড়

যেখানে দু-চোখ যায় যেতে পার। সোজা কথা! যাও, যেখান তোমার খুশী!—সংযত কণ্ঠে বৃদ্ধ আবার বললে।

—আমিও রাগের মাথায় কিছু বলছি না! শ্রীগরীর স্বর কঠিন হয়ে এলো : নিজে পছন্দ করে আমি বিয়ে করি নি। তুমিই জোর করে বিয়ে দিয়েছো। সত্যি কথা বলতে গেলে নাতালিয়ার পর এতটুকু দরদ আমার নেই। যদি তার ভাল লাগে, স্বচ্ছন্দে সে বাপের বাড়ী যেতে পারে।

—বেরিয়ে যাও তুমি!

—হাঁ যাচ্ছি।

—যাও, জাহান্নামে যাও।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, অত ব্যস্ত হয়ো না। হাত বাড়িয়ে শ্রীগরী বিছানা থেকে কার-কোটটা তুলে নিল। ক্রোধে বাপের মতই তার সর্বশরীর কাঁপছে। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। উভয়ের ধমনীতেই এক তুর্কী কজাক রক্ত। সেই মুহূর্তে তাদের দুজনের সৌসাদৃশ্য দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

—কোথায় যাচ্ছিস? মা কেঁদে হাত জড়িয়ে ধরল। কিন্তু শ্রীগরী ঠেলা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে ফার-টুপীটা তুলে নিল।

—যাক্। জাহান্নামে যাক্! যা, যা বেরো!—দরজা খুলে দিয়ে গর্জন করে বৃদ্ধ বল্লে।

শ্রীগরী দ্রুত পদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। যাবার বেলা শেষ যে ধ্বনিটি তার কানে পৌঁছাল, তা নাতালিয়ার করুণ আর্তনাদ।

রাত্রির কুজ্ঝটিকা গ্রামটির গলা টিপে ধরেছে। মসীকৃষ্ণ আকাশের বুক থেকে ঝিরঝির করে তুষার-কণা খসে পড়ছে। দনের বুক থেকে পিস্তলের আওয়াজের মত বরফের ঘর্ষণধ্বনি কানে আসে। শ্রীগরী হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে ফটক পার হয়ে গেল। সুদূর পল্লী থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে আসছে। কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে দু'একটি ক্ষীণ আলোরেখা চোখে পড়ে। আকাশহীনের

মত সে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আস্তাবলের জানালা মাণিকের মত জ্বলজ্বল্ করছে। ফটক থেকে নাতালিয়ার করুণ আহ্বান কানে এল—গ্রীশকা!

—চুলোয় যাও। খামখেয়ালী খান্কি কোথাকার! দাঁত কড়মড় করে গ্রীগরী বললে।

—গ্রীশকা, ফিরে এসো!

গ্রীগরী আরো বেগে ছুটে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। শেষ বারের মত নাতালিয়ার মর্মভেদী আর্তনাদ শুনলে—গ্রীশকা প্রিয়তম …।

দ্রুতপদে স্কোয়ার পার হয়ে রাস্তার মোড়ে এসে গ্রীগরী থমকে দাঁড়াল। কোথায় চলেছি? আজ রাতটাই বা কি করে কাটাই? ঠিক করল, মিশা কোশিভয়'র বাড়ী যাবে। পাহাড়ের গায়ে একখানি জীর্ণ কুটীরে মিশা মা এবং ভগিনীকে নিয়ে বাস করত। গ্রীগরী উঠানে ঢুকে জানালায় ধাক্কা মারল।

—কে?

—মিশা ভেতরে আছে?

—আছে। কে তুমি, কেন ডাক্‌ছ?

—আমি গ্রীগরী মেলেখফ।

একটু পরেই মিশা সদ্য-ঘুম থেকে উঠে কবাট খুলল।

—গ্রীশকা?

—হাঁ ভাই!

—এত রাতে কিসের জন্য?

—চল, ভেতরে গিয়ে বলছি!

বারান্দায় মিশার হাত চেপে ধরে গ্রীগরী বললে—আজ তোদের বাড়ীতেই রাতটা কাটাবো ভাই। বাড়ীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। একটু জায়গা হবে না? যে-কোথাও হ'লেই হবে।

—আচ্ছা সে দেওয়া যাবে'খন। কি নিয়ে এত বড় ঝগড়া হলো?

—পরে ব'লবো ভাই!

বেঞ্চির 'পর গ্রীগরীর বিছানা ক'রে দেওয়া হ'ল। মিশার মায়ের নাক-ডাকার শব্দ যাতে কানে না আসে এ জন্য মাথায় ভেড়ার চামড়াখানা জড়িয়ে গ্রীগরী ভাবতে লাগল: বাড়ীতে এখন কি হচ্ছে? নাতালিয়া কি বাপের বাড়ী যাবে? যাক! জীবনে নতুন স্রোত এসেছে। কিন্তু কোথায় যাই? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর মিলল। কালকেই আকসিনিয়াকে খবর পাঠাবো। তাকে নিয়ে কুবানে—গ্রাম থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাব।

অজানা ভবিষ্যতের চিন্তায় চোখে ঘুমের লেশমাত্র রইল না। শেষ-মেশ ঘুমিয়ে পড়বার আগে গ্রীগরী ভাবলে—কিন্তু খটকা কিসে ছিল? আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় তার চিন্তা সহজ এবং সরল হয়ে আসে। যেন স্রোতের টানে নৌকা পাড়ি দিয়ে চলেছে! তার পর হঠাৎ কিসে ধাক্কা খেয়ে গোল পাকিয়ে যায়, বুঝি নৌকা চড়ায় আটকে গেছে। প্রাণপণে গ্রীগরী কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। কোন প্রতিবন্ধক তার সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়ে যায়? কে তার পথের কাঁটা?

পরদিন ঘুম ভাঙতেই গ্রীগরীর পল্টনের সার্ভিসের কথা মনে পড়ল। ঠিক আছে। কিন্তু কি ক'রে আকসিনিয়াকে বার ক'রে নিয়ে আসা যায়? বসন্তকালেই ট্রেনিংক্যাম্প, তারপর শরৎকাল এলেই সৈন্য দলে যোগদানের আহ্বান আসবে! প্রাতরাশ শেষ হ'লে গ্রীগরী মিশাকে বারান্দায় ডেকে বললে—মিশা, আমার জন্য একবার অস্তাখফদের বাড়ী যাবি ভাই? সন্ধ্যার পর আকসিনিয়াকে উইও-মিলের কাছে যেতে বলবি!

—কিন্তু স্তেপান রয়েছে যে!—দ্বিধাজড়িত ভাবে মিশা বললে।

—এলিস্, একটা কাজের জন্য এসেছি।

—আচ্ছা যাবো!

—তাকে বলিস্, কিছুতেই যেন যেতে ভুল না করে।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই গ্রীগরী উইও-মিলের কাছে প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাতাস শিস্ দিয়ে যাচ্ছে; মনে হ'ল, একটা প্রকাণ্ড পাখী বুঝি উইও-মিলের মায়া কাটাতে না পেরে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা নিতান্তই অস্বস্তিকর। আকসিনিয়া তখনও আসে নি। ম্লানায়মান সূর্য্য ধীরে গোধূলির স্বর্ণাঞ্চলে মুখ লুকাল। হু হু ক'রে পুবালী হাওয়া অস্তাচলের পানে ছুটে যাচ্ছে। উইলো গাছের ফাঁকে লুকান চাঁদের ঘোলাটে আলো আঁধারে মিশে ম্লানতর হয়ে পড়েছে। উইও-মিলের মাথার উপরকার আকাশ নিরন্ধ্র অন্ধকার। মাঝে মাঝে দু'-একটু নীল ফালি দেখা যাচ্ছে। গ্রামের কর্ম্ম-কোলাহল ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এল। অতিষ্ঠ হয়ে গ্রীগরী পর পর তিনটে সিগ্রেট শেষ করল, তবু আকসিনিয়ার দেখা নেই। শেষ-মেশ রাগ ক'রে তৃতীয়টার শেষাংশটুকু দূর ক'রে ফেলে দিয়ে বিরক্ত ভাবে পথের পানে চেয়ে রইল। কই, কেউই তো নেই। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে সে মিশার জানালার আলোর দিকে হাঁটতে লাগল।

খানিকটা এগুতেই আকসিনিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেল। বেশ বুঝা গেল আকসিনিয়া দৌড়াচ্ছে—হাঁপানি তখনও থামে নি। মুখ থেকে শীতের বাতাস কিম্বা প্রান্তরের টাট্‌কা খড়ের মত গন্ধ আসছে।

—আমি এতক্ষণ বসে রইলাম আর তুমি আসতে পারলে না!

—স্তেপানকে এড়িয়ে আসতে হবে তো!

—তোমার জন্য বসে বসে শীতে প্রায় জমে গেছি!

—আমি গরম আছি! আমিই তোমায় গরম ক'রে দেবো!

আকসিনিয়া তার গরম পশমী কোটটা খুলে গ্রীগরীকে জড়িয়ে রইল। মনে হয় বিশাল ওক গাছে একটা মাধবীলতা জড়িয়ে আছে।

—ডেকেছো কেন ?

—বলছি, আমার হাত ধরো। পাশে হয়ত কোন কো থাকতে পারে।

—বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

—আমি তাদের ছেড়ে এসেছি। মিশার বাড়ীতে কালকের রাত্ত কেটেছে। আজ আমি গৃহহীন।

রাস্তার মোড় ঘুরে একটা ওয়ালট গাছের বেড়া থেকে তুষারকণা ঝেড়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল গ্রীগরী।

—নাতালিয়া বাপের বাড়ী চলে গেছে নাকি ? জানো নাকি ?

—বলতে পারি না, মনে হয় গেছে। না গিয়ে থাকলেও যাবে।

আকসিনিয়ার ঠাণ্ডা হাতখানা নিজের কোমরের ওপর তুলে দিয়ে, তার সরু আঙুলগুলি হাতের মধ্যে নিয়ে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল—এখন কি হবে ?

—আমি কি বলবো বলো ! যা ভাল মনে কর তাই হবে !

—স্তেপানকে ছেড়ে আসতে পারবে ?

—স্বচ্ছন্দে ! যদি বলো তো আজ রাতেই আসবো !

—যেখানে হোক্ একটা কাজ জুটিয়ে নেবো। তখন যেভাবে হয় চলে যাবে, কি বলো ?

—তোমাকে পেলে আমি গোয়ালে থাকতেও রাজী। যদি তোমার সঙ্গে থাকতে পাই, যাই কেন হোক না কিছুতেই আপত্তি নেই।

দুজনেই পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রীগরীর মন আকসিনিয়াকে ছেড়ে দিতে চাইছে না। বাতাসের দিকে মুখ ক'রে, চোখ বুজে সে দাঁড়িয়ে রইল। নাসা দুটো কাঁপছে। আকসিনিয়া তার কাঁধে মাথা রেখে পরিচিত ঘামের গন্ধ শুঁকতে লাগল। তার নির্লজ্জ অধরপ্রান্তে গ্রীগরীর অলক্ষ্যে তখন একটি ভীরু হাসিরেখা ফুটে উঠেছে।

—কালকে আমি মোখফের সঙ্গে দেখা করব। সে হয়ত একটা কাজ দিতে পারে।—আকসিনিয়ার আত্র বাহুখানি হাতের ওপর তুলে ধরে' গ্রীগরী বললে। আকসিনিয়া জবাব দিল না। তেমনি মাথা নীচু করে রইল।

সহসা আকসিনিয়ার অধর-প্রান্তের হাসিরেখা লুকিয়ে চোখে-মুখে ভীতা হরিণীর মত একটা শঙ্কা ফুটে উঠল। সে অন্তঃসত্ত্বা একথা মনে পড়তেই ভাবল—বলবো? না না, বলবোই! কিন্তু পরমুহূর্তেই ভয়ে শিউরে উঠে মনে থেকে এই সর্বনাশা চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করতে লাগল। তার নারী-স্বভাব অমনিই বলে দিলে—বলবার সময় এ নয়! গ্রীগরীকে হারাতে পারো। যে অশান্ত শিশু তার জঠরে এসেছে সে যে গ্রীগরের তার নিশ্চয়তা কি?···স্তেপানেরও হ'তে পারে তো! না, বলা যায় না!

—কাঁপলে কেন? শীত লাগছে?—আকসিনিয়াকে নিজের কোটে জড়িয়ে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল।

—আমি একটু···আমি যাই গ্রীশ্‌কা! স্তেপান হয়ত এখুনি বাড়ী ফিরবে।

—কোথায় গেছে?

—আনিখির বাড়ী তাস খেলতে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রীগরী সরে দাঁড়াল। যাবার বেলা আকসিনিয়া গ্রীগরীর ঠোঁটে তার অধরের অধীর গন্ধ রেখে বিদায় নিল। আমেজটা অনেকটা শীতের বাতাস কিম্বা বৃষ্টি ভেজা প্রান্তরের খড়ের মত।

মোড় ঘুরে সে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটল। কুয়ার পাশে খানিক কাদা ছিল। সেই কাদার মধ্যে পা পড়তেই পিছলে আকসিনিয়া বেকায়দায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তীব্র যাতনায় পেটের মধ্যে চিন্‌ চিন্‌ করে উঠল। এক হাতে তলপেট চেপে অপর হাতে পায়ের

বেড়া টেনে ধরল। কিছুক্ষণ পরে ব্যাথা কমে এলে আকসিনিয়া আবার চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু মাঝে মাঝে তখন একটা জীবন্ত কিছু যে তার পেটের মধ্যে ঠেলে উঠে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে এ বিষয়ে আকসিনিয়ার সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রইল না।

পরদিনই গ্রীগরী মোখফের সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রাতোনোভিচ্ তখন সবেমাত্র দোকান থেকে এসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে। পাশের ঘরে টুপী রেখে গ্রীগরী ডাইনিং-হলে প্রবেশ করল।

—আপনার কাছে দু'একটা কথা বলতে চাই প্রাতোনোভিচ্!—সসঙ্কোচে গ্রীগরী জানাল।

—তুমি পান্তেলিমন মেলেখফের ছেলে না? কি চাই?

—এসেছি···আপনি আমাকে একটা চাকুরী দিতে পারেন?

কথাটা বলবার সময়ে কবাটে শব্দ হ'ল। সামরিক অফিসারের পরিচ্ছদে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। দেখেই গ্রীগরী তরুণ লিস্তনিতস্কিকে চিনল। এই তো সেদিন মিচকা তাকে ঘোরদৌড়ে হারিয়ে দিয়েছে। প্রাতোনোভিচ্ অফিসারকে বসতে দিয়ে গ্রীগরীর দিকে ফিরে বললে—কেন, তোমার বাবার কি এমন অবস্থা হয়েছে যে ছেলেকে চাকুরী করিতে পাঠালে।

—আমি আর তাদের সঙ্গে থাকি না!

—পৃথক্ হয়ে গেছো?

গ্রীগরী সংক্ষেপে জানাল, হাঁ!

—তা ভাল! দেখ তোমাকে কাজে দিতে পারলে আমি খুশীই হ'তাম! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখন কোন চাকুরী খালি নেই তো!

—ব্যাপার কি?—চেয়ারে হেলান দিয়ে লিস্তনিতস্কি জিজ্ঞাসা করল!

—ছেলেটি একটি চাকুরী খুঁজছে।

—তুমি ঘোড়া দেখাশুনা করতে পারো? জুড়ীগাড়ী চালাতে পারো? চা নাড়তে নাড়তে অফিসার বললে।

—পারি। আমাদের নিজেদের ছ'টা ঘোড়া তো আমিই দেখতাম।

—আমার একজন কোচোয়ান চাই। কত মাইনে দরকার তোমার!

—বেশী চাই না।

—তা হ'লে আমাদের এস্টেটে গিয়ে আসছে-কাল বাবার সঙ্গে দেখা ক'রো। আমাদের বাড়ী চেনো তো? ইয়াগোদনায়! এখান থেকে মাইল আটেক।

—চিনি।

গ্রীগরী দরজা অবধি গেল। কবাট খুলতে গিয়েই কি ভেবে লিস্তনিতস্‌কির দিকে ফিরে সসঙ্কোচে বললে—স্যার, গোপনে আপনাকে একটা কথা বলব।

অলিন্দের কাছে এসে লিস্তনিতস্‌কি জিজ্ঞাসা করল—বলো!

দরজার ভেনিসিয়ান কাঁচের মধ্য দিয়ে চোয়ানো ম্লান আলোর পানে চেয়ে সপ্রতিভভাবে গ্রীগরী বললে—আমি একা নই স্যার! সঙ্গে একটি মেয়েছেলে আছে। তার একটা কিছু কাজ···

—তোমার স্ত্রী?—ভুরু টান করে সহাস দৃষ্টিতে লিস্তনিতসকি জিজ্ঞাসা করল।

—না স্যার, আর এক জনের স্ত্রী!

—নাকি? আচ্ছা, তা বেশ চাকরদের রান্নাবান্না করে দেবার জন্য তাকে রাখা যাবে! কিন্তু তার স্বামী কোথায় থাকে?

—এই গ্রামেই!

—তা হ'লে তুমি আর এক জনের বউকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ?

—নিজে ইচ্ছে করেই সে আসছে স্যার!

—বটে! এ যে উপন্যাস হয়ে গেল! তা বেশ, যেও কালকে ভোরবেলা! কেমন? এই তো! তাহ'লে এসো এখন!

সারারাত উৎকণ্ঠা এবং অনিদ্রায় কাটিয়ে সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই গ্রীগরী ইয়াগোদনায় এসে হাজির হল। বিস্তৃত এক উপত্যকার মধ্যে প্রাসাদটি অবস্থিত। চতুর্দিকে ইটের দেয়াল। বহির্বাটীর সামনে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের এক পাশে নানারঙের টালি দিয়ে ১৯১০ সাল লেখা। চাকরদের ঘর, স্নানাগার, আস্তাবল, মোরগ প্রভৃতি রাখবার ঘর, গোয়াল, প্রকাণ্ড গোলা একটা, গ্যারাজ সবই এই বহির্বাটীতে। প্রধান দালানটি দেখতে অনেকটা সেকেলে ধরণের; চার পাশে ফুলের বাগান। বাড়ীখানির পশ্চাতে প্রান্তরের পত্রহীন পপলার এবং উইলো গাছের বাগান। শূন্য কাকের বাসাগুলি তাদের মাথায় ঝুলছে।

প্রাঙ্গণে ঢুকতেই কতকগুলি ক্রিমিয়ান বরজাইস্ কুকুর গ্রীগরীকে অভ্যর্থনা জানাল। একটা বুড়ো খোঁড়া কেটি তার পা শুঁকে মাথা নীচু করে তার অনুসরণ করলে। চাকরদের ঘরে পাচকের সঙ্গে একটা ঝগড়াটে সোমত্ত ঝির তুমুল বাদানুবাদ চলছে। তামাকের ধোঁয়ার আবরণে মুখ ঢেকে সিঁড়িতে এক কুঁজো বৃদ্ধ বসেছিল। ঝিটি গ্রীগরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে কুকুর এবং কাঁচা চামড়ার গন্ধ আসছে। টেবিলের পর একটি দোনালা বন্দুকের খাপ্ আর শিকারের থলে একটা।

—ছোট কর্তা ডাকছেন! পাশের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝি বললে।

উৎকণ্ঠিতভাবে নিজের কাদামাখা বুটের পানে চেয়ে গ্রীগরী

খিধাজড়িত পদে ঘরে ঢুকলো। জানালার পাশে একটা বিছানায় লিস্তনিতস্‌কি শুয়ে ছিল। সিগ্রেট ধরিয়ে, সাদা সার্টটার বোতাম আট্‌কে দিয়ে লিস্তনিতসকি বললে—খুব ভাল সময় এসেছ। বস, বাবা এখুনি এঘরে আসবেন।

গ্রীগরী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। দু'এক মিনিট পরেই পাশের ঘরে পদশব্দ শোনা গেল। দরজার ওপাশ থেকে গম্ভীর ভাঙা গলায় কে জিজ্ঞাসা করল—এখনও ঘুমোচ্ছো নাকি ইয়েভগেনি?

—ভেতরে আসুন।—লিস্তনিতস্‌কি উত্তর দিল।

কলো ককেশীয় কোট-পরা এক বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলেন। আড়চোখে গ্রীগরী চাইল তাঁর পানে। বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ বড়শীর মত নাক এবং তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে সাদা গোঁফ দেখে মুহূর্তের জন্য গ্রীগরীর একটা চমক লাগল। বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কি দীর্ঘকায় এবং প্রশস্ত বক্ষ, কিন্তু কৃশ। ওভারকোটের তলায় একটা উটের লোমে তৈরী কোট পরা। চোখ দুটি কটা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

—বাবা, যে কোচোয়ানের কথা আপনাকে বলেছিলাম এই সে!—লিস্তনিতসকি বললে।

—ছেলে কার?

—পান্তেলিমন মেলেখফের!

—প্রকোফিয়েভিচ্‌কে আমি চিনতাম্‌। আমাদের বাহিনীতেই ছিল। পান্তেলিমনকেও দেখেছি, একটু খোঁড়া না?

—হ্যাঁ হুজুর! সবিনয়ে গ্রীগরী উত্তর দিল। সঙ্গে সঙ্গেই রুশ-তুর্কী যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লিস্তনিতসকি সম্পর্কে তার বাবার গল্পের কথা মনে পড়ে গেল।

—তা তুমি চাকরী খুঁজছ কেন?—বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি এখন আর বাবার সঙ্গে নেই, হুজুর!

—পরের চাকুরী করবে তুমি কেমন উজবুক হে! কেন পৃথক হবার সময় বাবা তোমাকে কিছু দেয় নি নাকি?

—না হুজুর!

—যাক সেকথা! তোমার স্ত্রীর জন্যও কাজ চাই?

ছোট্ট লিস্তনিতসকির খাটে কচমচ শব্দ হতেই গ্রীগরী সেদিকে চাইল। দেখে সে উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে আছে।

—হাঁ হুজুর, চাই!

—ও হুজুর হুজুর রেখে দাও! ওসব আমি পছন্দ করি নে। তুমি মাসে আট রুবল পাবে। দুজনের মাইনেই ঐ। তোমার স্ত্রী বাড়ীর চাকর বা মাঝে মাঝে ঠিকা যাদের রাখা হয় তাদের রান্না করে দেবে। কেমন হবে তো?

—হাঁ হবে!

—তাহলে কালকে সকালেই এসো! আগের কোচোয়ানের ঘরটাতেই তোমরা থাকবে। আচ্ছা, তা হোলে এসো গে! কাল আটটার মধ্যেই আসা চাই কিন্তু!

গ্রীগরী বেরিয়ে গেল। গোলাঘরের ওপাশে বরফহীন একটা জায়গায় বুরজাইসগুলো শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। বুড়ী কেটিটা গ্রীগরীর পিছু পিছু খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে গেল।

সেদিন সকালবেলা আকসিনিয়া তাড়াতাড়িই রান্না-বান্নার কাজ সেরে ফেলল। আগুন জেলে ডিসগুলো ধুয়ে নেবার জন্যে জানালা দিয়ে উঠানের দিকে চেয়ে দেখে স্তেপান মেলেখফদের বেড়ার কাছাকাছি একটা কাঠের গাঁজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চালাখানার একটা খুঁটি খারাপ হয়ে চালাটা ভেঙে পড়বার জো হয়েছে—মেরামতের জন্য স্তেপান নিবিষ্টমনে খুঁটি বাছছিল।

আজ আকসিনিয়াকে কেমন যেন একটু বেশী উৎফুল্ল বলে মনে হচ্ছিল।

চাপা হাসির আবেগে গাল দুখানি লালচে হয়ে উঠেছে। চোখে অহেতুক আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি। এই সামান্য পরিবর্তনটুকুও স্তেপানের নজরে পড়েনি এমন নয়। প্রাতরাশের সময়ে সে আর জিজ্ঞাসা না করে পারলে না।

—আজ তোমার কি হয়েছে?

—কি আবার হবে।

—মুখে হাসি আর ধরে না যে! মনে হয় মাখম মাখিয়েছ।

—উনোনের আগুনে হয়েছে হয়ত! মুখ ঘুরিয়ে আকসিনিয়া আড়চোখে দেখলে মিশা কোশিভয়'র বোন আসছে কি না।

কিন্তু বিকেলের আগে সে এলো না। উৎকণ্ঠায় আকসিনিয়া অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। মেয়েটিকে দেখেই ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমার কাছে এসেছ মাশুৎকা?

—একটু বাইরে এসো না! মেয়েটি জবাব দিল।

স্তোভের ওপর ঝুলান একখণ্ড ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তেপান চুল আঁচড়াচ্ছিল। আকসিনিয়া ভীরু-চোখে চাইলে তার পানে।

—তুমি বেরুবে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল না। পাজামার পকেটে চিরুনিখানা রেখে তাস জোড়া তুলে নিয়ে তামাকের নলটা হাতে করে স্তেপান বললে—হাঁ, আনিকুশকার ওখানে যাচ্ছি একবার।

—কখন ফিরবে? তাস খেলে রোজই বড় রাত্তির কর! বাজী রেখে খেলবে না তো?

—খুব হয়েছে আকসিনিয়া! নিজের কাজ দেখো! ঐ মেয়েটি তোমার জন্ত হয়ত দাঁড়িয়ে আছে।

আকসিনিয়া বাইরে এল। মাশুৎকা মৃদু হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

—গ্রীশকা ফিরে এসেছে ?

—হাঁ। আনতদৃষ্টিতে মেয়েটি জবাব দিব।

—অন্ধকার হলেই সে তোমাকে আমাদের বাড়ী যেতে বলেছে।

মেয়েটির হাত ধরে আকসিনিয়া সদর দরজার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

—আস্তে! আর কিছু বলতে বলেছে ?

—তোমার সব জিনিসপত্তর গোছগাছ করে নিয়ে যেতে বলল।

আকসিনিয়া অধীর ঘোড়ার মত চঞ্চল হয়ে উঠল। ভয়ে অস্থিরতায় সে বারে বারে রান্নাঘরের দিকে তাকাতে লাগল।

—কিন্তু এর মধ্যে কি ক'রে গোছাই বলো তো ? তুমি বোলো, সব গোছগাছ করে যত সকালে পারি আমি যাবো, কেমন ?···কোথায় দেখা হবে ?

—তুমি আমাদের বাড়ী যেও।

—নাঃ !

—আচ্ছা, তাহ'লে আমি তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলবো !

আকসিনিয়া ঘরে ঢুকেই দেখে স্তেপান কোট পরছে।

—এসেছিল কেন ?—সিগ্রেটের ফাঁকে স্তেপান জিজ্ঞাসা করল।

—এসেছিল···ওর একটা স্কার্ট কেটে দিতে পারি কি না জানতে। ঢোক গিলে আকসিনিয়া বললে।

সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে স্তেপান দরজার কাছ থেকে যাবার মুখে বলে গেল—আমার জন্য অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

আকসিনিয়া ছুটে গিয়ে বেঞ্চির সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। স্তেপানের পদধ্বনি ক্রমে সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল। বাতাসে একটা সিগ্রেটের ফুলকি জানালা অবধি উড়ে এলো। জানালার তুষার-মুক্ত অংশের ফাঁক দিয়ে চাইতেই শেষবারের মত ফটকের বাইরে স্তেপানের ফার টুপীটা আকসিনিয়ার চোখে পড়ল।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে সিন্দুক থেকে জ্যাকেট, স্কার্ট, রুমাল—তার যা-কিছু ছিল সব টেনে বার করে আকসিনিয়া শাল দিয়ে একটা বিরাট পুঁটুলি বাঁধল। পরিশ্রমে তখন সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। শেষবারের মত রান্নাঘরের দিকে চেয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে সে ত্রস্ত পদে পুঁটুলি হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। যাবার বেলা রান্নাঘরের শিকল টেনে দিয়ে গেল। মেলেখফদের বাড়ীর কে যেন বেড়িয়ে গোয়ালঘরের দিকে গেল। সে চলে যেতেই আকসিনিয়া ছুটল দনের পথ ধরে। রুমাল থেকে কয়েক গোছা চুল খ'সে গালের উপর শুড়শুড়ি দিতে লাগল। অলিগলি দিয়ে যখন সে কোশিভয়'র বাড়ীর কাছে এসেছে, মনে হল আর এতটুকু চলবার মত শক্তি তার নেই। পা দুটো অসম্ভব রকম ভারী মনে হ'তে লাগল। গ্রীগরী ফটকেই অপেক্ষা করছিল। আকসিনিয়াকে আসতে দেখেই সে এগিয়ে ওর হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে প্রান্তরের দিকে চলল।

কুটীরখানি পার হয়েই আকসিনিয়া পা টেনে চলতে আরম্ভ করল। কয়েক পা এগিয়েই গ্রীগরীর জামা টেনে ধরে বলল—থামো একটু।

—কেন, কি হল? চাঁদ উঠতে বিলম্ব আছে। তার আগেই সরে পড়তে হবে।

একটু থামো গ্রীশকা!—এক হাতে পেট চেপে আকসিনিয়া বললে।

—কেন, কি হল?—গ্রীগরী ফিরে দাঁড়াল।

—পেটটায় কেমন খিল ধরেছে। অতিরিক্ত বোঝা আমায় বইতে হয়েছে।—ঠোঁট কামড়ে দু'হাতে পেট চেপে ধ'রে আকসিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই আবার রুমালখানা ঠিক-ঠাক ক'রে বেঁধে নিয়ে গ্রীগরীর হাত ধরল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলে না তো! এখন যদি একটা পাহাড়ের মাথায় তুলে ঠেলে ফেলে দিই?

—যার কাছে এখন সবই সমান! বাড়ী ফিরবার উপায় আর নেই।
ম্লান হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

সেদিনও রাত দুপুরেই স্তেপান বাড়ী ফিরল। আস্তাবলে ঢুকে ছড়ান খড়গুলি কুড়িয়ে গামলার মধ্যে রেখে ঘরে গিয়ে রান্নাঘরের শিকল দেওয়া দেখে ভাবলে, বোধ হয় আকসিনিয়া কোথাও বেড়াতে গেছে। শিকল খুলে ঘরে ঢুকে স্তেপান ভাল করে খিল আটকে দিয়ে দেশলাই জ্বাললে। মেজাজ তখনও জিতের নেশায় মৌতাত হয়ে আছে। আলো জ্বালতেই রান্নাঘরের এলোমেলো ভাব দেখে মনের মধ্যে কেমন ধক্ করে উঠল। কিছুটা অবাক্ হয়ে সে ভা ঘরটায় গেল। এ কি? সিন্দুকের ডালাটা যে হাঁ করে আছে! মেজেতে আকসিনিয়ার একটা পুরানো জ্যাকেট। যাবার বেলার তাড়াহুড়ায় নিয়ে যেতে ভুল করেছে। তাড়াতাড়ি ভেড়ার চামড়াটা খুলে ফেলেই স্তেপান আলো আন্‌বার জন্য রান্নাঘরে গেল। হতবুদ্ধির মত ঘরের চারিদিকে দেখেশুনে অবশেষে ব্যাপারখানা বুঝলে। ধপ ক'রে আলোটা রেখেই দেয়াল থেকে তরবারিখানা এক হেঁচকা টানে খুলে নিয়ে এল। তরবারির মুঠটা এত জোরে চেপে ধরেছিল সে হাতের সবকটা শিরা ফুলে উঠল। ক্রোধে তখন তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। আকসিনিয়ার নীল-হলদে জ্যাকেটটা তরবারির মাথা দিয়ে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে মারল এবং নীচে পড়্‌বার সময় তরবারির এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। তার পর ক্রোধান্ধ হয়ে হিংস্র শ্বাপদের মত বার বার জ্যাকেটের খণ্ডিত টুক্‌রাগুলি শূন্যে ছুঁড়ে কুচি কুচি করে কাট্‌তে লাগল। উড়ন্ত টুক্‌রাগুলি কাটবার বেলা সেই কঠিন ইস্পাত যেন শিস্ দিচ্ছিল। তাতেও যখন শরীরের জ্বাল মিটলো না, দূর করে তরবারিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে নিরুপায়ের মত রান্নাঘরের টেবিলটার পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল। রুদ্ধ রোষে তখন সেই ময়লা টেবিলখানাকেই স্তেপান কম্পিত হাতের মুঠোয় পিষে ফেলতে চাইছে।

বিপদ একা আসে না।

শ্রীগরীর গৃহত্যাগের পরদিনই গেচকার অনবধানতার জন্য মিরণ কোয়ত্তনকের ষাঁড়টা তার সব চেয়ে ভাল ঘুড়ীটার গলা গুঁতিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। গেচকা হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে দৌড়ে এসে থতমত হয়ে মনিবকে জানাল—কর্তা, বড়ই বিপদ! ষাঁড়টা, ঐ শালা ষাঁড়টা……

—কি হয়েছে বল না!—শঙ্কিত মিরণ জিজ্ঞাসা কর

—শালা ঘুড়ীটার দফারফা করে দিয়েছে গুঁতিয়ে।

হয়ে উঠানে ছুটে এল। কুয়ার পাশে মিচকা ষাঁড়টাকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার চালাচ্ছিল। ষাঁড়টাও ল্যাজ বাকিয়ে পা দিয়ে সেই বরফাচ্ছন্ন মাটি ঠেলে নিষ্ফল ক্রোধে গোঙাচ্ছিল। প্রহারে নতি স্বীকার করবার পাত্র সেও নয়। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সেও আক্রমণ করবার জন্য গোঁ মারছে। কিন্তু মিচকা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাশে নাকে যেখানে পারছে পিটছে। পেছন থেকে একটি শ্রমিক যে ষাঁড়টার দড়ি ধরে টানছে সেদিকে পর্যন্ত ভ্রূক্ষেপ নেই।

মিরণ কুয়ার কাছে ছুটে গেল। ঘুড়ীটা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষীণ কম্পনে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। গা ঘামে ভিজা। রক্তধারা বুক পর্যন্ত বেয়ে নেমেছে। গলার পাশে প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর একটা রক্তস্রাবী ক্ষতের মধ্যে শ্বাসনালীটা হাঁ করে রয়েছে। মিরণ কেশর ধরে মাথাটা তুলতেই ঘুড়ীটা জিজ্ঞাসু করুণ দৃষ্টিতে প্রভুর পানে স্থির ভাবে চেয়ে রইল। তার মৌন চাহনি যেন জিজ্ঞাসা করছে—এর পর? এই মৌন জিজ্ঞাসার উত্তরেই যেন মিরণ চীৎকার ক'রে বলল—শীগ্‌গির কিছু ওক গাছের ছাল নিয়ে আয়।

গেচ্‌কা ছাল আনতে ছুটল। মিচকা নীরবে বাবার পাশে দাঁড়াল এসে।

—কেশর ধরে মুখটা তুলে রাখ্‌! আর একজন একটা শক্ত সুতো নিয়ে আয়। যা তাড়াতাড়ি।

ঘুড়ীটা ব্যথা না পায় এমনি ভাবে ওপরের মাড়িতে দড়ি বেঁধে টান ক'রে ক্ষতটা ধুইয়ে দেওয়া হ'ল। মিরণ কম্পিত হস্তে ক্ষতটা সেলাই ক'রে ঘরে ফিরতে না ফিরতেই গিন্নী দৌড়ে এসে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে স্বামীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললে: নাতালিয়া এখানে এসেছে, গ্রীগরিয়েভিচ্‌! হা পোড়া কপাল!

—কেন, ব্যাপার কি?—বিবর্ণ মুখে মিরণ জিজ্ঞাসা করল।

—আর ব্যাপার! গ্রীগরীটা চলে গেছে বাড়ী ছেড়ে!

লুকিনীচনা পলায়নোদ্যত দাঁড়কাকের মত হাত মেলে স্কার্ট চাপড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললে—সারা গ্রামে কেলেঙ্কারী, হা ভগবান্‌! কি অপমান! ও হো হো হো…

রান্নাঘরেই নাতালিয়ার সঙ্গে মিরণের দেখা। দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার। কেঁদে কেঁদে গাল লাল হয়ে উঠেছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস?—ধমক দিয়ে মিরণ বললে: কেন, স্বামী মেরেছে? একটু বনিবনা করে চলতে পারো না?

—সে চলে গেছে বাবা! রুদ্ধকণ্ঠে নতজানু হয়ে নাতালিয়া বললে: আমায় তুমি ফিরিয়ে নাও, আর সয় না!…সেই বউটাকে নিয়ে গ্রীগরী পালিয়েছে।

মিনতিকরুণ চোখে বাপের মুখের পানে চেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি।

—থাম্‌ দেখছি!

—সেখানে আমি আর থাকতে পারবো না। আমায় তুমি ফিরিয়ে নাও! টান হাত পায়ে সিন্দুকের কাছে গিয়ে নাতালিয়া হাতে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। এ সময়কার অশ্রু অনেকটা যে মাঘের পশলা

বুড়ির মত। মা এসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু মিরণ সহসা বারান্দায় ছুটে গিয়েই ডারঘরে ডেকে বলল—এই, এক্ষুণি স্লেগাতে ছুটো ঘোড়া জোড়।

একটা মোরগ সিঁড়ির ওপর মুরগীর পেছনে ঘুরে ঘুরে আপন শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার চেষ্টা করছিল। মিরণের চীৎকার শুনে সচকিত ভাবে প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়েই সে কক্কক্ করতে করতে পাখায় ঝাপটু মেরে গোলাঘরের দিকে ছুটল।

—এক্ষুনি স্লেগায় ঘোড়া জোড়া!—বার বার সিঁড়ির জীর্ণ রেলিংএ কিল মেরে মিরণ বলতে লাগল।

পেচকা আস্তাবল থেকে একজোড়া ঘোড়া নিয়ে স্লেগাতে জুড়েছে দেখে মিরণ রান্নাঘরে ফিরল।

মিচকা গেচকার সঙ্গে নাতালিয়ার জিনিসপত্তর আনবার জন্য মেলেখভদের বাড়ী গেল। আনমনে গাড়ী চালাতে চালাতে গেচ্কা ভাবছিল—এই ব্যাপারের পর হয়ত খুড়ীটার কথা আর কর্তার মনে পড়বে না। মনটা ভারী খুশী হ'য়ে উঠল; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে—না, বুড়ো ভুলবার পাত্র নয়। ঘোড়ার পিঠে সপাসপ্ চাবুক পড়তে লাগল। অপরাধ যেন ওদেরি।

—একুশ—

ইয়েভগেনি নিভনিতস্কি আতামানের লেক্ গার্ড-বাহিনীর কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার। অফিসারদের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে বাঁ হাত মচ্‌কে ইয়েভগেনিকে কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই সে হপ্তাছয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ী আসে।

বৃদ্ধ জেনারেল ইয়াগোদনয়াতে একাকীই বাস করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টমদশকে ভারশাওয়ার সহরতলীতে গাড়ী চড়ে যাবার বেলা তাঁকে বিপত্নীক হ'তে হয়। বিদ্রোহীরা কজাক জেনারেলকে হত্যা করবার জন্যই গুলী ছুঁড়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা কোচোয়ান এবং তার পত্নীকেই বধ করে। দুই বৎসরের শিশুপুত্র ইয়েভগেনি সহ লিস্তনিতস্কি সংসারে তখন নিতান্ত একলা। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধ অবসর গ্রহণ ক'রে ইয়াগোদনয়ায় নিঃসঙ্গ এবং কঠোর জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। ছেলে একটু বড় হলেই তাকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠালেন; নিজে চাষ-আবাদে মন দিলেন। সরকারী আস্তাবল থেকে ঘোড়া কিনে এবং ইংলণ্ড ও প্রোভালস্কির আস্তাবল থেকে বাছা বাছা ঘুড়ী এনে বৃদ্ধ এক চমৎকার নতুন সঙ্কর জাত সৃষ্টি ক'রে তুললেন। খাস এবং পত্তনি জমিতে গবাদি পশু, ও খাদ্য-শস্যের চাষ ক'রে, মজুর রেখে জমি আবাদ ক'রে, শরৎ এবং শীতকালে বরজাইস্ কুকুর নিয়ে শিকার ক'রে, মাঝে মাঝে কখনও বা ঘরে খিল আটকে সারা সপ্তাহ মদ্য পান করে বৃদ্ধ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। পাকস্থলীর এক কঠিন পীড়ার জন্য ডাক্তার তাকে

কোন শক্ত জিনিষ খেতে নিষেধ করেছিল। বৃদ্ধ ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী সুবোধ বালকের মত আহার্যের রসটুকু খেয়ে অবশিষ্ট চিবানো অংশটুকু সামনে একটা রুপার ট্রে'র ওপর ফেলতেন। জেনারেলের নিজস্ব ভৃত্য বেঞ্জামিন ট্রেখানি তার মুখের কাছে ধরে রাখত।

বেঞ্জামিন আজ বছর কয়েক ধরে লিত্তনিতস্কির কাজ করছে। এই নির্বোধ কৃষ্ণকায় যুবকটি ট্রেখানা ধরে জেনারেলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে চিবান আহার্য ফেলে দিতে দেখে প্রথম প্রথম লোভ সামলাতে পারতো না। কিছুকাল পরেই সয়ে গেল। কয়েক মাস পরে বৃদ্ধকে মোরগের মাংস চিবোতে দেখে তার মনে হ'ত: উঃ কি অপচয়! ভাল ভাল খাবার কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আমি বেটা পেটের জ্বালায় ছটফট করছি। আচ্ছা খাওয়া শেষ হোক্, একবার চেষ্টা না করে ছাড়ছি না।

এর পর থেকে কর্তার খাওয়া শেষ হলেই বেঞ্জামিন ট্রেখানি নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দুয়ার দিত। তারপর বুভুক্ষুর মত তাড়াতাড়ি করে কোনমতে সেগুলি গিলে বেরিয়ে পড়ত। হয়ত এই কারণেই কিছুদিনের মধ্যে বেঞ্জামিন বেশ নধরকান্তি হয়ে উঠল।

ফার্মের অন্যান্য পরিজনের মধ্যে ছিল রাঁধুনী লুকেরিয়া, বৃদ্ধ আস্তাবল-রক্ষক ছাশ্‌কা এবং মেষপালক তিখন।

লুকেরিয়া কিছুতেই আকসিনিয়াকে কর্তার জন্য রান্না করতে দিতে চাইত না। সপ্তাহে তিনবার করে বাড়ী ধোয়াবার এবং অসংখ্য মোরগের দেখাশুনা করবার ভার তাকে দেওয়া হ'ল। প্রাগরী বৃদ্ধ ছাশ্‌কার সঙ্গেই আস্তাবলে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিত। চুল দাড়ির একগাছিও কাঁচা না থাকলেও সবাই তাকে ছাশ্‌কা বলেই ডাকত। এমন কি বৃদ্ধ লিত্তনিতস্কি পর্যন্ত তার পদবী ভুলে গেছেন। বয়সকালে ছাশ্‌কা কোচোয়ানই ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি

এবং দৃষ্টিশক্তি উভয়ই যখন ক্ষীণ হয়ে এল লিস্তনিতস্কি তাকে আস্তাবল দেখাশুনা করবার কাজে নিয়োগ করলেন। কম সময়ত! আজ প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশী ছাশ্‌কা তার ওখানে কাজ করছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাশ্‌কার তোষকা-প্রীতি ক্রমেই বেড়ে চলল। মত্ত অবস্থায় যখন সে প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াত মনে হত সেই বুঝি খোদ কর্তা। বৃদ্ধ লিস্তনিতসকির শয়নকক্ষের পাশে গিয়ে পা ঠুকে ছাশ্‌কা জোর গলায় ডাকত: নিকোলাই লেক্‌সিয়েভিচ্‌! নিকোলাই লেক্‌সিয়েভিচ্‌!

বৃদ্ধ লিস্তনিতসকি ঘরে থাকলে জানালায় এসে ধমক দিয়ে বলতেন— মাতলামি করছিস্‌ কেন?

ছাশ্‌কা দাঁত বার করে হি হি করে তার মুখের ওপর হেসে উঠত।

—নিকোলাই লেক্‌সিয়েভিচ্‌, আমি তোমাকে খুব চিনি!—অঙ্গুলি নির্দেশ করে বৃদ্ধ বলত।

—যা ঘুমোগে! শান্তভাবে হেসে বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কি বলতেন।

—ছাশ্‌কাকে ধরে নিতে পারে এমন সাধ্য তোমার নেই।—হি হি করে হেসে সে বলত: তুমিও আমারই মত। দুজনেই আমরা এক জলের মাছ। দুজনেই ধনী কি বলো? হাত মেলে ছাশ্‌কা দেখিয়ে দিত' সে কতবড় ধনী।—দন অঞ্চলে সবাই আমাদের চেনে…ভালও বাসে। তবে দুজনের নাকটাই যা-কিছু বেয়াড়া!

—কেন এমন হ'ল? হাসির আবেগে লিস্তনিতস্কির মুখচোখ লাল হয়ে উঠত।

—তোষকায়! আর খেও না নিকোলাই লেকসিয়েভিচ! মারা পড়বে! কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ছাশ্‌কা বলত': সবই তো আমরা ঐ করে খোয়ালাম।

—এই নে' যা গে' যা! বৃদ্ধ কুড়ি কোপেকের একটি মুদ্রা

দিতেই খপ্ করে ধরে ছাশ্‌কা সেটি টুপীর মধ্যে গুঁজে রেখে বলত' : আচ্ছা, আসি জেনারেল।

—ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়েছিস ? হেসে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করতেন।

—শোনো শোনো বলে কি শোনো। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে বিড় বিড় করে বৃদ্ধ বলত'—ছাশ্‌কা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে ভুল করেছে! হুঁ! ওরে মরবার সময়ও ছাশ্‌কা হামাগুড়ি দিয়ে জলের বালতি খুঁজবে!

বৃদ্ধ এই অশোভন উক্তিতে রাগে গড় গড় করে ঘরের মধ্যে চলে যেতেন।

টাকাকড়িই এখন ছাশ্‌কার জীবনে সব কিছু। এমন কি মদ্যপান এবং প্রভুর সঙ্গে এই আলাপ পর্যন্ত সে পর্যায়ে পড়ে। আস্তাবল দেখাশুনা করতে তার জুড়ি মেলে না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব সময়েই সে আস্তাবলে শুয়ে কাটায়। তাছাড়া অশ্বপালক হিসাবে তার দক্ষতাও প্রচুর। নিজে সে আস্তাবল সাফ করত,—নিজেই নাল লাগাতে পারতো ; বসন্তকালে নিজেই ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটত' এবং নিজের হাতে উপত্যকা ও প্রান্তরের এখানে ওখানে ঘোড়ার সব রকম রোগের ওষধির গাছগাছড়া পুঁতে রাখত'। আস্তাবলের দেয়ালময় সেই ওষধির শুকনো গাছগাছড়া ঝুলানো থাকত'। সম্পত্তির মধ্যে বৃদ্ধের একখানা তক্তাপোষ, কোট একটা, আর ভেড়ার চামড়া একখানা। কোটটা আবার মাঝে মাঝে তার খড়ের গদিতে তোষকের কাজে লাগত। লুকেরিয়ার প্রেম-পাগল তিখন অকারণ ছাশ্‌কাকে সন্দেহের চোখে দেখত। প্রতি মাসে অন্তত একবার করে এই স্থূলবুদ্ধি জোয়ান কজাকটি বৃদ্ধ ছাশ্‌কার তেলচিটকুটে শার্টের কলার ধরে অন্তরালে নিয়ে শাসিয়ে বলত : ফের তুমি আমার লুকেরিয়ার ওপর নজর দেবে তো ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—বৌটা আমার খুশীর ওপর নির্ভর করে। রহস্য করবার জন্য চোখ মিটমিট করে হাল্‌কা জবাব দিত।

—বুড়ো বয়েসে তোমার লজ্জা করে না! তাছাড়া আবার তুমি চিকিৎসক···ঘোড়া দেখাশুনা করবে সেই তোমার কাজ···ধর্ম গ্রন্থও পড়েছ।

—ঐ মুখে দাগওয়ালা মেয়েগুলোকে আমার বেশ লাগে। না, তুমি খ'সে পড়; লুকেরিয়াকে নিয়ে আমি কোথাও ভেগে পড়ি। আঃ ছুঁড়ী কেমন! কিস্‌মিসের পুডিংয়ের চাইতেও রসাল।

—আচ্ছা, ধরতে পারলে সেদিন দেখে নেবো কেমন বুড়ো তুমি। তিখন বলত'। পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পকেট থেকে কয়েকটি তাম্রমুদ্রা বার করে বৃদ্ধের হাতে গুঁজে দিত।

এমনি ধীরমন্থর গতিতেই ইয়াগোদনয়ার জীবন গড়িয়ে চলেছে। —যেন আধ ঘুমন্ত মনের অলস স্বপন। মানুষের চলাচলের পথ থেকে বহু দূরে এই এষ্টেট অবস্থিত। হেমন্তের সঙ্গে সঙ্গেই পড়শী গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। শীতের রাত্রে পাহাড়-জঙ্গল থেকে নেকড়ের দল বেরিয়ে আসত'; সচকিত ঘোড়াগুলি তাদের ডাকে চঞ্চল হয়ে পড়ত'। মনিবের দোনালা বন্দুক হাতে তিখন প্রান্তরে গিয়ে ফাঁকা আওয়াজ ক'রে তাদের ভয় দেখাত'। বন্দুকের আওয়াজের প্রতীক্ষায় লুকেরিয়া কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করত'। এই সময়ে টেকো তিখন তার মানস চক্ষে দুঃসাহসী যোদ্ধা হয়ে ফুটে উঠত'। চাকরদের ঘরের দরজা খুলবার আওয়াজ কানে আসতেই লুকেরিয়া ছুটে গিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে তিখনের হাড়ের কাঁপুনি লাঘব করে দিত'।

গরমের দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইয়াগোদনয়া শ্রমিকদের কলরবে মুখর থাকত'। প্রায় শতাধিক একর জমিতে বুড়োকর্তা নানারকম শস্যের

আবাস করতেন। ইয়েভগেনি মাঝে মাঝে বাড়ী এসে বাগানে মাঠে ঘোরাঘুরি করে কিংবা ছিপ নিয়ে হ্রদে মাছ ধরে গোটাকয়েক দিন কোন মতে কাটিয়েই আবার যথাস্থানে ফিরে যেত। বাড়ীর ওপর পুত্রের এ যাযাবর-প্রীতি বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কিরও এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

লিস্তনিতস্‌কি-ভবনে গ্রীগরীর প্রথম দিন-দশেক ছোট কর্তার সঙ্গেই কেটেছে।

একদিন সহাস্যবদনে চাকরদের মহলে এসে বেন্যামিন জানাল:

ছোটকর্তা তোমাকে ডাকছেন গ্রীগরী!

গ্রীগরী লিস্তনিতসকির ঘরের কাছে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। ইয়েভগেনি ইশারায় একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলে। গ্রীগরী সন্তর্পণে কোণ ঘেঁষে বসতেই লিস্তনিতস্‌কি জিজ্ঞাসা করল: আমাদের ঘোড়াগুলো তোমার কেমন বলে মনে হয়?

—ভালোই। পাটকেল রঙেরটা চমৎকার!

—বেশ করে ব্যায়াম করিও। কিন্তু দেখো যেন বেশী না হয়ে যায়।

—ছাশ্‌কা বুড়োও তাই বলে।

তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ইয়েভগেনি জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা মে মাসে তো তোমাকে ট্রেনিং ক্যাম্পে যেতে হবে, না?

—হ্যাঁ।

—আমি আতামানকে বলব এ সম্বন্ধে। যাবার দরকার হবে না তোমার।

—ধন্যবাদ স্যার!

মুহূর্তের জন্য উভয়েই নীরব। উর্দির বোতাম খুলে ইয়েভগেনি তার নারীসুলভ বক্ষদেশ অবারিত করে সহসা জিজ্ঞাসা করে বসলো: আচ্ছা আকসিনিয়ার স্বামী তো' ওকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতেও পারে। কি বলো!

—সায়েব কিছু করবে না। সে ওকে ত্যাগ করেছে, আর ফিরিয়ে নেবে না।

—কি করে জানলে ?

—সেদিন গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বললে স্তেপান নাকি তাকে বলেছে।

—আকসিনিয়া দেখতে সত্যিই সুন্দরী !

সহাস দৃষ্টিতে গ্রীগরীর মুখের পানে চেয়ে অতর্কিতে লিস্তনিতস্‌কি মন্তব্য করল।

—হাঁ মন্দ নয়!—শুষ্ক হাসি হেসে লিস্তনিতস্‌কির কথায় সায় দিলেও অলক্ষ্যে গ্রীগরীর মনের ওপর দিয়ে একখানি কৃষ্ণমেঘের ছায়া উড়ে গেল!

ছুটির শেষের কটা দিন লিস্তনিতস্‌কি বেশীর ভাগ গ্রীগরীর ঘরেই কাটতো। আকসিনিয়ার যত্নে এই স্বল্প পরিসর কক্ষটি বেশ ঝরঝরে তকতকে হয়ে উঠেছিল। ঘরটির সংক্ষিপ্ত পরিপাটি এবং গোছাল ভাব একখানি কোমল হস্তের সুনিপুণ গৃহিণীপনার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিত'।

গ্রীগরী যখন 'কর্মান্তরে ব্যস্ত থাকত' অকিসার সেই সময়টুকুই গল্প করবার অনুকূল মুহূর্ত বলে বেছে নিয়েছিল। প্রথমে রান্নাঘরে গিয়ে লুকেরিয়ার সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাসা ক'রে কথার ফাঁকে ফাঁকে কোণের ঘরের দিকে চলে যেত। একদিন একখানা টুলের পর কুঁজো হয়ে বসে অকিসার নির্লজ্জ সহাস দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আকসিনিয়ার পানে চেয়ে রইল; আকসিনিয়া প্রমাদ গণ্‌ল। হাতের ছুঁচ-সুতো অলক্ষ্যে কাঁপতে লাগল।

—তারপর আকসিনিয়া, কেমন লাগছে?—সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে লিস্তনিতস্‌কি জিজ্ঞাসা করল। নীল ধোঁয়ায় ঘর পূর্ণ হয়ে গেল।

—ধন্যবাদ, ভালই!—চোখ তুলে আকসিনিয়া জবাব দিলে। কিন্তু

লিওনিডস্‌কির স্বচ্ছ দৃষ্টির ভেতর থেকে যে যৌন কামনার ছবি ফুটে উঠেছিল তার অনুভূতি আকসিনিয়ার মুখ চোখ লাল করে তুলল। অতঃপর আনতদৃষ্টিতে তার প্রশ্নের ছাড়া ছাড়া জবাব দিয়ে আকসিনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বার ছুতো খুঁজতে লাগল।

—আমাকে এখুনি যেতে হবে। হাঁসগুলোর খাওয়া হয় নি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আকসিনিয়া বললে।

—বস'না খানিকটা! হাঁসের সেবা যত্ন খানিকটা পরে করলেও চলবে। হেসে লিওনিডস্‌কি বল্লে; তারপর আবার আকসিনিয়ার গত জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তার অধীর নীরব আকুতির ইঙ্গিত তখন দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রীগরী ঘরে ঢুকতেই ইয়েভগেনি তাকে একটা সিগ্রেট দিয়ে দু'এক মিনিট পরে খসে পড়ল।

—কেন এসেছিল? গ্রীগরী প্রশ্ন করল।

—আমি কি ক'রে জান্‌বো বলো! ইয়েভগেনির দৃষ্টির কথা মনে পড়তেই জোর ক'রে হেসে আকসিনিয়া উত্তর দিলে: ঘরে এসেই সে ঐখানে বসে পড়ল। গ্রীশকা, দেখ ঠিক এই ভাবে। আকসিনিয়া বসে দেখিয়ে দিলে: উঠবার নামগন্ধও নেই।

—তুমি তার ভাল লাগবার মত কিছু করেছ নিশ্চয়!—চোখের পাতা কুঞ্চিত করে গ্রীগরী বলে: কিন্তু সাবধান, বেয়াড়াপনা দেখলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, বলে দিচ্ছি।

আকসিনিয়া গ্রীগরীর পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল; কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করতে পারলে না এ তার রহস্য, না প্রাণের কথা!

—বাইশ—

লেন্তের চতুর্থ সপ্তাহেই শীত কমে আসবার আভাষ পাওয়া গেল। ঘরের কিনারে ক্রমে জল দেখা দিল। উপর থেকে বরফ ও জলের ধারা সর্পিল গতিতে নীচে নামতে শুরু করল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পাহাড় থেকে একটা কড়মড় শব্দ শোনা গেল। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে লোকে বললে তুষার পাত হচ্ছে; কিন্তু বস্তুতপক্ষে শব্দটা আসন্ন বরফ গলাবার পূর্বাভাষ। প্রভাতী পবনে হাল্কা তুষার কণা ভেসে বেড়ায়। মধ্যাহ্নে কোথাও কোথাও ধরণী বরফমুক্ত হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে শেরী গাছের পচা ছালের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রান্তরে পচা খড়ের গন্ধ। সব কিছুতেই মার্চ মাসের শুভ পদার্পণের নিশানা।

মিরণ ধীরেসুস্থে অদূরবর্তি চাষ আবাদের গোছগাছ করতে লাগল। লেন্তের চতুর্থ সপ্তাহে গ্রীশকা উপবাস করে। শীতে জড়সড় হয়ে গীর্জা থেকে ফিরেই বৃদ্ধ পুত্রবধূর কাছে অনুযোগ করে বললে: পুরুতটা কোন কাজেরই নয়! সারাদিন আমায় উপোস করিয়ে মেরেছে। এত ধীরজ, মনে হয় যেন গাড়ী ভর্তি ডিম নিয়ে চলেছে।

—প্যাশন্ সপ্তাহে উপোস করলেই আপনার ভাল হ'ত। তখন এর চাইতে আর একটু গরমও পড়ত।

—নাতালিয়াকে ডেকে দাও!—বৃদ্ধ বললেন: আমাকে একজোড়া গরম মোজা করে দেবে!

নাতালিয়ার তখনও বিশ্বাস ছিল গ্রীগরী ফিরবে। এই দুরাশায় বুক বেঁধেই সে বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে চলেছে। অধীর আকাঙ্ক্ষায় বিছানায় গড়াগড়ি ক'রে সে রাত কাটাত। এই অপ্রত্যাশিত এবং

অযোগ্য অপমানের কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে যেতে চায় না। অপমানের উপর নতুন আর একটা শঙ্কা জুটে তাকে সারাক্ষণই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। কন্ট্রাক্টরের কথা ভাবতেই ভয়ে গা হিম হয়ে উঠত। গুলীবিদ্ধ পাখীর মত আপন ঘরে বসে সে নীরবে যন্ত্রণায় ছটফট করত। বাপের বাড়ী আসবার পর থেকে মিচকার চাহনি যেন তার কেমন কেমন লাগছে। একদিন বারান্দায় তাকে একেলা পেয়ে মিচকা সরাসরি জিজ্ঞেস করে বলল: এখনও তুই ঐকার আশা করিস নাকি?

—তা দিয়ে তোর কি দরকার?

—তোর কষ্ট লাঘব করতে সাহায্য করতে পারি।

নাতালিয়া চোখ তুলে চাইল মিচকার পানে। কিন্তু সেখানে যা দেখল তাতে ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেল। তার বিড়ালের মত চোখ দুটি এক লোলুপ কামনায় চক্ চক্ করে উঠেছে। নাতালিয়া তাড়াতাড়ি খিল আটকে এক দৌড়ে দাদুর ঘরে উপস্থিত হ'ল। ভয়ে বুকের মধ্যে তখনও টিপ টিপ করছে। দিন দুয়েক পরে আবার মিচকা উঠানে তার কাছে এল। নতুন খড়ের পর গড়াগড়ি করছিল সে; কানটুপী আর চুলে কচি ঘাসের ডাঁটা ঝুলছে।

—এমনি ক'রে নিজেকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ নাতালিয়া!

আত্মরক্ষার জন্য বাহু প্রসারিত করে নাতালিয়া চেঁচিয়ে বললে: বাবাকে বলে দেবো কিন্তু!

—আচ্ছা বোকা তো! চেঁচাচ্ছিস কেন?

—এখনও বলছি সরে পড় মিচকা, না হয় এখুনি গিয়ে বাবাকে বলে দেবো। লজ্জা করে না তোর অমন করে চাইছিস! ছিঃ! আশ্চর্য যে পৃথিবী দ্বিধা হয়ে তোকে গিলে ফেলছে না! একটু থেমে আবার মিনতি করে বললে: আমার কাছে অমন করে আসিস না মিচকা!

—আচ্ছা! এখন না এলাম! রাত্রে কিন্তু যাবোই তা বলে দিলাম।

নাতালিয়া কম্পিতপদে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল। রাত্রে সিন্দুকের পর বিছানা ক'রে সে ছোট একটি বোনকে সঙ্গে শুতে নিল। উৎকণ্ঠায় চোখে এক বিন্দু ঘুম ছিল না। সারারাত কান খাড়া করে রইল। সামান্য শব্দ হ'লেই চীৎকার করে বাড়ী ফাটিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে বিছানার পর এ-মোড় ও-মোড় ক'রে দীর্ঘ রাত্রি কাটাতে লাগল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করে দরজার পর নিবদ্ধ হয়ে রইল। কিন্তু বৃদ্ধ গ্রীশকার নাসিকা গর্জন ছাড়া অন্য কোন কিছুই সেই নিস্তব্ধতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করল না।

বিবাহের প্রচেষ্টায় নাকাল হয়ে মিচকা ইদানীং কিছুটা মন-মরা এবং বদখেয়ালী হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হ'লেই সহরের ব্যতিক্রম হবার জো ছিল না। কোনদিন বাড়ী ফিরত, কোনদিন আসতো না। প্রায়ই ফিরত না। তা'ছাড়া পাড়ার যে-সব মেয়েদের বাড়ীতে তার আনাগোনা সুরু হয়েছে, গ্রামে সবাই তারা সুপরিচিতা। মিরণ সবই লক্ষ্য করত, কিন্তু এপর্যন্ত কিছু বলে নি; চুপ ক'রে দেখে গেছে মাত্র।

ইষ্টারের অব্যবহিত পূর্বে একদিন মোখফের দোকানের সামনে পান্তেলিমনের সঙ্গে নাতালিয়ার দেখা হ'ল। তাকে দেখতে পেয়েই পান্তেলিমন ডেকে বল্লে—দাঁড়াও!

নাতালিয়া থামলে। শ্বশুরের মুখ দেখেই গ্রীশকার কথা মনে এলো। নাতালিয়ার বুকের মধ্যে এক তীব্র অস্বস্তিতে ধরাস্ ধরাস্ করতে লাগল। বৃদ্ধও পুত্রবধূর পানে চাইতে পারল না। যেন সে নিজেই অপরাধী। অন্য দিকে চেয়ে পান্তেলিমন ছাড়া ছাড়া ভাবে বল্লে—মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে একটু দেখা ক'রে এলেও তো পারো!

তোমার শাশুড়ী একবার দেখতে চেয়েছে তোমাকে। কেমন, যাবে একদিন ?

নাতালিয়ার বিব্রত ভাবটা কেটে গেল।—ধন্যবাদ। বাবা কথাটা মুখে এসেও আটুকে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে আবার বল্লে: বাড়ীতে কাজের বড্ড চাপ পান্তেলিমন প্রকোফিয়েভিচ !

—আমাদের গ্রীশ কাটা···উঃ !—অনুতাপে মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বল্লে: পাজীটা আমাদের সঙ্গে কি চালাকিটাই না করলে ! আজ সে থাকলে মিলেমিশে কেমন থাকতাম আমরা !

—কপালে নেই তার কি হবে ! বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নাতালিয়া বলে। পুত্রবধূর অশ্রুভারাতুর চোখের পানে চেয়ে পান্তেলিমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত কান্না চাপবার জন্য নাতালিয়া জোর ক'রে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল।

—আচ্ছা তা'হোলে আসি আজ ! পাজীটার কথা ভেবে দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি আমার ! সে তোমার পায়ের নখের যোগ্যও নয় ! হয়ত আবার সে ফিরে আসতেও পারে। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছি, কিন্তু···

নাতালিয়া ধীর পদে মাথা নীচু ক'রে চলে গেল। পান্তেলিমনও তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টা করল। রাস্তার মোড় ঘুরে নাতালিয়া পশ্চাতে চাইলে একবার ; বৃদ্ধ তখন কোনমতে লাঠিভর ক'রে খুঁড়িয়ে স্কোয়ার পার হচ্ছে।

—তেইশ—

বসন্ত এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শুকমানের কারখানার সান্ধ্য মজলিসে ভাঁটা পড়ে এল। গ্রামবাসীরা সবাই তখন চাষ-আবাদের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত। একমাত্র ইভান আলেকসিয়েভিচ আর ভালেৎ প্রায় রোজই একবার দাভিদকে সঙ্গে ক'রে হাজিরা দিত। মণ্ডি বৃহস্পতিবারে সূর্য্য পাটে বসতেই তারা শুকমানের কারখানায় এসে জমায়েৎ হ'ল। শুকমান একখানা বেঞ্চির 'পর বসে একমনে পঞ্চাশ কোপেক মুদ্রা দিয়ে তৈয়ারী করা একটা রূপোর আংটি সাফ করছিল। জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের সিঁদুরে আভা ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইভান একটা চিমটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। প্রথমে সে-ই মুখ খুলল: সেদিন আমাকে একটা পিস্‌টন্ আন্‌বার জন্ত মনিবের কাছে যেতে হয়েছিল। সেটাকে মিলেরোভাতেই নিয়ে যেতে হ'ল। এখানে সারবার কোন উপায় ছিল না। ওটার প্রায় এতখানি জায়গা ভেঙে গেছে। ইভান কড়ে আঙুলের দৈর্ঘটা মেপে দেখাল।

—মিলেরোভাতে একটা কারখানা আছে না? হাতে কাজ করতে করতে শুকমান্-জিজ্ঞাসা করল।

—হাঁ একটা ইস্পাতের ফাউণ্ড্রি আছে বটে। গত বছর আমাকে কিছুদিন সেখানে কাটাতে হয়েছে। ইভান উত্তর দিল।

—অনেক মজুর কাজ করে, না?

—তা শ' পাঁচেক হবে বই কি!

—তারের অবস্থা কেমন ?—নিতান্ত গতানুগতিক ভাবেই লুকমান জিজ্ঞাসা করল।

—ভালোই! কেউই তোমার সর্বহারা নয়!

—কেন ?—ভালেং প্রশ্ন করল।

—খুব ভালই তো আছে! ঘরবাড়ী, স্ত্রী, খাবারদাবার সবাইর আছে! সব ব্যাটাই ব্যাপটিষ্ট। কর্তা নিজেই প্রচারক। গায়ের ময়লা চামের এত পুরু হয়ে গেছে যে সহজে ঘষে তা সাফ করা যায় না!—মুচকি হেসে ইভান আবার তার গল্প বলে যেতে লাগল: আমি গেছলাম সেরগেয়ি প্রাতোনোভিচের সঙ্গে। আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি ভেতরে গেলেন। আমি বসে অপেক্ষা করতে লাগ্লাম। শুনি ওরা বলাবলি কচ্ছে যে, শীগগিরই নাকি জার্মানদের সঙ্গে লড়াই বাঁধবে। মোখক নাকি একখানা বইয়ে পড়েছে। আর একজন বললে—রুশ-জার্মান-যুদ্ধ হতেই পারে না। কেননা আমাদের শত্রু জার্মানদের চাইই! তারপর তৃতীয় একজন বলছে শুন্লাম: না জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে আঙুরক্ষেতের জন্ত লড়াই হবে! পরে দেখলাম যে অফিসার লিত্তনিতস্কি! তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না। তোমার কি ধারণা দাভিদোভিচ ?—লুকমানের দিকে ফিরে ইভান জিজ্ঞাসা করল।

—কি বলব বল, আমি তো গণক নই!—হাতের আংটিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে লুকমান্ জবাব দিল।

—একবার শুরু হয়ে গেলে আমরা জড়িয়ে পড়বোই। ইচ্ছায় হোক্, কি অনিচ্ছায় হোক্ চুলে ধরে আমাদের টেনে নামাবে। বিজ্ঞের মত ভাব করে ভালেং বল্লে।

ইঞ্জিন-চালকের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে লুকমান বল্লে: আসল ব্যাপার হচ্ছে···

এই সরল মজুরদের ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই শুকমান গম্ভীরভাবে বলতে শুরু করল। দাভিদ ঠিকঠাক হয়ে বেঞ্চিটার উপর বসে নিলে। ভালেৎ হাঁ করে শুকমানের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সুস্পষ্ট এবং সরল ভাষায় শুকমান মোটামুটি ভাবে বাজার ও উপনিবেশলুব্ধ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগ্রামের স্বরূপ ও তাৎপর্য তাদের বুঝিয়ে দিলে।

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ইভান্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আমরা কখন যোগ দেবো?

—অস্ত্রের মাতলামি দেখলেই তোমাদের মাথা ব্যথা ধরবে! মুচকি হেসে শুকমান জবাব দিল।

—ছেলে মানুষের মত কথা বোলো না! চটে গিয়ে ভালেৎ বল্লে: কথায় বলে না, প্রভু টানেন মাথা ধরে কুকুর তবু লেজ নাড়ে!

—লিস্তনিতস্‌কি মোখফের ওখানে গেছল কেন?—আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য দাভিদ জিজ্ঞাসা করল।

—ষ্টেশনে যাবার পথে গেছল। হাঁ ভাল কথা; আর একটা কথা শোনো বলছি, আমি যখন মোখফের বাড়ী থেকে বেরোই দেখলাম··· কাকে দেখেছি বলো তো? গ্রীগরী মেলেখফকে! দেখি একটা চাবুক হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—হাঁ আজকাল সে লিস্তনিতস্‌কির কোচোয়ান। দাভিদ বললে।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। ইভান আলেক্‌সিয়েভিচই প্রস্থানের পালা শুরু করল। শুকমান অতিথিবর্গের সঙ্গে সঙ্গে ফটক অবধি গিয়ে কারখানায় তালাচাবি লাগিয়ে কুটীরে প্রবেশ করল।

—চব্বিশ—

ইয়েভগেনিকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে গ্রীগরী পাম রবিবারে ফিরল। বরফ গলে কয়েক দিনের মধ্যেই পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ষ্টেশন থেকে মাইল কুড়ি পেছনে একটি উক্রাইনস্কি গ্রামের কাছে ছোট্ট একটি নদী পার হ'তে গিয়ে সামান্তের জন্ম তার একটা ঘোড়া রক্ষা পেয়ে গেল। বেলা পড়তে পড়তেই সে গ্রামে পৌছুলো। গত রাত্রে এই শীর্ণ নদীটির বুকে জমাটবাঁধা বরফ গলে ভেসে গেছে। নদী থেকে সামান্ত দূরে একটি সরাইতে গ্রীগরী ঘোড়া দুটোকে খাইয়ে নিলে। রাত্রে নদীর পরিস্ফীত পঙ্কিল আবর্ত পাছে স্ফীততর হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় গ্রীগরী সন্ধ্যার আগেই নদী পার হবার সঙ্কল্প করল।

ষ্টেশনে যাবার বেলা যে-পথে সে নদী পার হয়েছিল, সেখানে গিয়ে দেখে নদীর জল কানায় কানায় ভরে আছে। মাঝ নদীতে একখণ্ড বেড়া ও আধখানা চাল নদীর আবর্তে পাক খাচ্ছে। কিনারে বালির ওপর তখনও গাড়ীর চাকার দাগ রয়েছে। জলের কিনারে গিয়ে চাকার দাগগুলি কিছুটা বাঁয়ে বেঁকে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আন্দাজ ক'রে দেখল নদীটি বড় জোর গজ পঞ্চাশেক পাশে হবে। এই সময়ে একজন প্রৌঢ় উক্রাইনেৎসি নিকটতম কুটীর থেকে বেড়িয়ে তার দিকে এল। চাবুক দিয়ে নদীর দিকে ইশারা করে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল : পার হওয়া যাবে ?

—ভোরবেলাও লোকে পারাপার হয়েছে তো !

—জল খুব বেশী ?

—না ! কিন্তু লেগা ডুবে যাবে !

গ্রীগরী বল্‌গা টেনে ধরে কশাটা হাতে তুলে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে ঘোড়া ছুটোকে চলবার ইঙ্গিত করল। অনিচ্ছুক ঘোড়া ছুটি নাসিকা-শব্দ ক'রে সন্তর্পণে পা ফেলে এগুতে লাগল।

বাঁ পাশের ঘোড়াটা মাথা নাড়া দিয়ে চলছে। গ্রীগরী পায়ের দিকে চেয়ে দেখে স্লেগার সামনে পঙ্কিল জলরাশি ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রথমে ঘোড়া ছুটো হাঁটু জল দিয়ে চলছিল। কিছুদূর এগুতেই জল বুক অবধি হ'ল। গতিক ভাল নয় বুঝে গ্রীগরী বল্‌গা টেনে ঘোড়া ছুটোকে ফেরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু না থেমে তারা সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। স্রোতের টানে স্লেগাখানার মাথা জলের ওপর আরও উঁচু হয়ে উঠল। পিঠের ওপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে—স্লেগাখানা তুলে ঘোটাছুটোকে পেছন দিকে টানতে লাগল।

—এই! এই—ডাইনে—আরও ডাইনে! নদীর পাড় দিয়ে দৌড়ে হাতের ত্রিকোণাকার টুপীটি নেড়ে উক্রাইনেৎসিটি চীৎকার ক'রে বললে। গ্রীগরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনবরত ঘোড়া ছুটোকে তাড়া করতে লাগল। স্লেগাখানার পশ্চাতে বুদ্‌বুদ্‌ তুলে ফেনিল জল ঘুরপাক খাচ্ছে! গত রাত্রে যে সাঁকোটা ভেঙে গেছে তার একটা পাঁজার সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই গাড়ীখানা উল্টে গেল। গ্রীগরীও অমনি হুড়মুড়ি খেয়ে জলের মধ্যে ছিটকে প'ড়ে কোন মতে ভেড়ার চামড়াখানা ধরে গাড়ী আঁকড়ে রইল। বল্‌গা ঠিক মতই হাতে ধরা ছিল। একটু পরেই বল্‌গা ছেড়ে সে একটা ঘোড়াকে টেনে ধরে ঘোড়া ছুটোর সামনে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ঘোড়াটা পেছনের পা দিয়ে তাকে এমনি বেয়াড়াভাবে চাট মারল, মনে হ'ল তার হাঁটু বুঝি ভেঙে গেছে। দাঁতে দাঁতে চেপে গ্রীগরী কোনমতে সামনে গিয়ে বল্‌গা ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু দু-তিন বারই হাত ফসকে গেল। অবশেষে কোনমতে বল্‌গা ধরে সে ঘোড়া ছুটোকে পাড়ের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করল। হঠাৎ

বেকায়দায় পা ফসকে যেতেই ঘোড়া দুটো একরকম তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। উঠবার চেষ্টা করতেই তাদের বুকে ধাক্কা লেগে গ্রীগরী তিন-চার হাত দূরে চড়ার ওপর ছিটকে পড়ল। গাড়ীখানা তার পায়ের ওপর দিয়েই জল থেকে টেনে তুলে ঘোড়া দুটো কয়েক পা সামনে গিয়ে থামল। শরীরের বেদনা অগ্রাহ্য ক'রে গ্রীগরী এক লাফে উঠে দাঁড়াল। শীতে ঘোড়া দুটোর চেয়েও সে বেশী ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। মনে হচ্ছিল পা দুখানা তার রোগ-শীর্ণ শিশুর চেয়েও দুর্বল। সহসা মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। স্লেগাখানা উল্টেঘোড়া দুটোর কাঁপুনি কমাবার জন্য তীর বেগে তাদের ছুটিয়ে দিলে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে দৌড়োবার বেলা মনে হচ্ছিল, সে আক্রমণ করতে চলেছে বুঝি। সামনে প্রথম যে ফটক দেখলে নিঃসঙ্কোচে গ্রীগরী তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সৌভাগ্যবশতঃ উক্রাইনস্কি গৃহকর্তাটি নিতান্ত অতিথিপরায়ণ। পুত্রকে ঘোড়া দুটো দেখাশুনা করবার জন্য পাঠিয়ে নিজে ভদ্রলোক গ্রীগরীর জামা কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থা করে দিলেন। কোন ওজর আপত্তি যাতে না উঠতে পারে এমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর'পর স্তোভ জ্বালবার আদেশ হ'ল। নিজের কাপড় না শুকানো পর্যন্ত গৃহকর্তার পাজামা পরেই গ্রীগরী স্তোভের পাশে শুয়ে কাটাল। অনতিবিলম্বেই খাবার এসে হাজির হ'ল। বেশ এক পেট খেয়ে গ্রীগরী পাশের ঘরে বিছানো শয্যায় নিশ্চিন্ত আরামে গা এলিয়ে দিল।

পরদিন ভোর হবার বহু পূর্বেই গ্রীগরী আবার যাত্রা করল। এখনও পুরো পঁচাশি মাইল পথ যেতে হবে। প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। সামনেই বিরাট ধাঁধার মত পথ-রেখা-বিলুপ্ত বরফাস্তীর্ণ বাসন্তী প্রান্তর। প্রত্যেকটি সুড়ঙ্গ এবং খাদের মধ্য দিয়ে বরফগলা জলস্রোত কলোল্লাসে ছুটে চলেছে। ঘোড়া দুটো পথ-শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুপুরের কিছু

আগে গ্রীগরী রাস্তা থেকে মাইল দশেক দূরে একটি গ্রামে পৌঁছুলো। ক্লান্তিতে ঘোড়া দুটোর মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছে। এইখানে জোগাখানা খুলে রেখে, একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে অপরটার লাগাম ধরে আবার রওনা হয়ে শেষ রবিবার সকালে গ্রীগরী ইয়াগোদনয়া পৌঁছুল।

নিবিষ্টমনে পথের কথা শুনে বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কি ঘোড়া দুটো দেখতে গেলেন। ছাশকা রুষ্টভাবে ঘোড়া দুটোর শীর্ণ পেটের দিকে চেয়ে তাদের হাঁটাচ্ছিল।

—ঘোড়া দুটো ঠিক আছে তো? .

—না, মাদীটার বুকের কাছে একটু ছড়ে গেছে। তা মারাত্মক কিছু নয়!

—যাও, বিশ্রাম করগে। হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে লিস্তনিতস্‌কি বললেন। গ্রীগরী ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়ল। কিন্তু একটি রাতের বেশী বিশ্রাম করা ভাগ্যে জুটল না। পরদিন সকাল বেলাই বেঞ্জামিন এসে সংবাদ দিল—কর্তা তোমাকে ডাকছেন গ্রীগরী। এখুনি যেতে বললেন।

জেনারেল অন্যমনস্ক ভাবে হলঘরে পায়চারি করছিলেন। গ্রীগরী দু'বার গলা খাঁকার দিতেই চোখ তুলে বললেন: ও, এসেছ! শোনো, দুটো ঘোড়া প্রস্তুত করগে! আর লুকেরিয়াকে বোলো কুকুরগুলিকে খাওয়ায় না যেন; ওদের শিকারে নিয়ে যেতে হবে।

গ্রীগরী চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বৃদ্ধ আবার ডেকে বললেন: তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু!

ঘোড়া দুটো ঠিকঠাক করে বেড়ার কাছে এনে শিস্‌ দিতেই কুকুরগুলি ছুটে এল। লিস্তনিতস্‌কি শিকারের পোষাকে এলেন। তার নীল পরিচ্ছদের ওপর কোমার কারুকার্য-খচিত চামড়ার কোমরবন্ধ, কাঁধে ঝুলান মাঝারি একটা ফ্লাস্ক; হাতের চাবুকটা সর্পিল-গতিতে

মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে। মনিবকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করবার জন্ত গ্রীগরী তার হাত থেকে চাবুকটা নিল। কিন্তু বৃদ্ধের স্বচ্ছন্দ চড়বার ভঙ্গী দেখে কিছুটা অবাক হয়ে গেল। গ্রীগরীর হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে লিস্তনিতস্‌কি বললেন—আমার পেছু পেছু এস।

গ্রীগরী ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসল; পেছনের পায়ে নাল পরান ছিল না বলে বরফের 'পর দিয়ে ছুটবার বেলা ঘোড়াটা ছু'তিন বার পেছনের পা ভেঙে বসে পড়ল। ফলে গ্রীগরীকে লাগাম বেশ কষে টেনে ধরতে হ'ল। ঘোড়াটা বারে বারেই ঘাড় বাঁকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সওয়ারের পানে চেয়ে তার হাঁটু কামড়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ইয়াগোদনয়া থেকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেই লিস্তনিতস্‌কি অশ্বের গতি দ্রুততর করে দিলেন। কুকুরের দল গ্রীগরীর পশ্চাদনুসরণ করতে লাগল। একটা কালো বুড়ী কেটি ঘোড়াটার লেজ ছুঁয়ে ছুঁয়েই চল্‌ছিল। টের পেয়ে ঘোড়াটা ছু'তিন বার থেমে কুকুরটাকে চাট্টি মারবার চেষ্টা করলে; কিন্তু প্রতিবারেই কুকুরটা খানিকটা পিছিয়ে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে উৎসুক নয়নে গ্রীগরীর পানে চাইতে লাগল।

আধঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা লক্ষ্যস্থল সঙ্কীর্ণ ওলশান্‌স্কি গিরি-সঙ্কটের মধ্যে পৌছুলো। লিস্তনিতস্‌কি ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গপথ ধরে এগুতে লাগলেন। কিন্তু গ্রীগরী সন্তর্পণে গর্তবহুল পথ অতিক্রম করে উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ল। উপরের দিকে চাইতেই দেখে ইস্পাতের মত নীলচে মুমূর্ষু পত্রহীন এডলার ঝোঁপের মধ্যে লিস্তনিতস্‌কি উৎসুক ভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন; আর কুকুরগুলি তার পেছনে ঝোঁপের মধ্যে উতলা হয়ে ছুটাছুটি করছে। দস্তানা খুলে গ্রীগরী সিগ্রেটের কাগজের জন্ত পকেট হাতড়াতে লাগল।

সহসা পিস্তলের আওয়াজের মত পাহাড়ের ওপাশ থেকে একটা শব্দ শুনেই গ্রীগরী চেয়ে দেখে লিস্তনিতস্‌কি চাবুক উঁচু করে

তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন। আবার শব্দ হ'ল—ঐ ঐটার পেছনে।

একটা বড়া নেকড়ে সুড়ঙ্গের নীচু দিয়ে নিমেষের মধ্যে ঝোঁপ জঙ্গল সঙ্কীর্ণ গিরিনদ শুষ্ক বক্ষ লাফিয়ে পার হয়ে ফিরে চাইল পেছনে। কুকুরগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে তার পেছনে তাড়া করেছে যাতে সে জঙ্গলের মধ্যে লুকোতে না পারে। নেকড়েটা লাফিয়ে দৌড়ে বনের দিকে ছুটল। বৃদ্ধা কেটি কুকুরটাও সোজা তার পেছন পেছন তাড়া করল। নেকড়েটা মুহূর্তের জন্ম ইতস্ততঃ করল; কিন্তু গ্রীগরী ঘোড়ায় চড়ে সুড়ঙ্গের বাইরে এসে আর তাকে দেখতে পেল না। পাহাড়ের চূড়া থেকে যখন আবার নেকড়েটা দৃষ্টি-পথে এল তখন সে প্রান্তরের মধ্যদিয়ে প্রাণপণে নিকটস্থ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকবার জন্ম ছুটছে আর কুকুরগুলি তাকে তাড়া করে ঝোঁপের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। বৃদ্ধ লিস্তনিতস্কিও তাদের পাশাপাশি থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন। নেকড়েটা গিরি সঙ্কটে ঢুকতে যাবে এমনি সময়ে কুকুরগুলি প্রায় তাকে ধরে ফেললো; একটা তো প্রায় তার গায়ের উপরই লাফিয়ে পড়ল। ফলাফল দেখবার জন্ম গ্রীগরীও তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে; কিন্তু কোনই লাভ হ'ল না। অনবধানতার জন্ম একটা গর্তের মধ্যে পড়ে ঘোড়াটার পায়ে বেশ চোট লাগে। কোনমতে সে মাইল খানেক ছুটল। খুড়ের তলায় ভিজা আঁটাল মাটি ছিটে এসে তার মুখে লাগতে লাগল। প্রথম বাঁকটা পার হয়েই গ্রীগরী দেখলে কুকুরগুলি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে নেকড়েটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গিরি-সঙ্কটের মাঝখানে একটা ওক ও এল্ডার গাছের ঝোঁপের মধ্য থেকে নেকড়েটাকে তাড়িয়ে বার করা হয়েছে। বেগতিক দেখে নিরুপায় জন্তুটি তখন সামনের শুক্‌নো এবং কণ্টকাকীর্ণ ঝোঁপটার মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্ম প্রাণপণে ছুটেছে। পাদানির পর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আস্তীন দিয়ে চোখের জল মুছে গ্রীগরী তাদের লক্ষ্য

করতে লাগল। বাঁদিকে চোখ পড়তেই গ্রীগরী বুঝলে যে তারা তাতারস্কায়ার সন্নিহিত প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েছে। নাতালিয়া ও সে গত শরৎকালে যে জমি চাষ করেছে পাশেই তা পড়ে রয়েছে। খেয়ালের মাথায় গ্রীগরী জমিখানার মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছু কালের জন্য শিকারের এই নিষ্ঠুর পরিহাস তার মন থেকে মুছে গেল। নেকড়েটা টিবিতে হোঁচট খেয়ে বহুবার গড়াগড়ি খেয়েছে। গ্রীগরী চেয়ে দেখল লিস্তনিতস্কি তাকে লক্ষ্য করছেন কিনা। বৃদ্ধ তখন শিকারের নেশায় অনন্যমনা। সুযোগ বুঝে গ্রীগরী আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

অদূরেই চাষীদের শূন্য বিশ্রামস্থল পড়ে রয়েছে। আরও কিছু দূরে তিন জোড়া বলদে হাল টানছে।

—গ্রামেরই কেউ হবে নিশ্চয়! জমিটা কার? আনিকুশকার? কুঞ্চিত দৃষ্টিতে কর্ষণরত কজাকটির পানে চেয়ে গ্রীগরী মনে মনে ভাবল।

আরও দেখ্‌লে দু'জন কজাক হাল ফেলে সামনের গিরিসঙ্কট থেকে নেকড়েটার দিকে ছুটে আসছে। তাদের একজন একটা লোহার ডাণ্ডা ঘুরাচ্ছে। হঠাৎ নেকড়েটা একটা ফাঁড়ির মধ্যে হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সামনের কুকুরটা তার উপর লাফিয়ে পড়েই থাবা দিয়ে নেকড়েটাকে চেপে ধরল। বৃদ্ধা কেটি কুকুরটা তার পেছনেই ছিল, সেও অমনিই এসে পড়ল। কিন্তু ঠিক জায়গায় দৌড়ের বেগ সামলাতে না পেরে সে একেবারে নেকড়েটার গায়ের উপরই হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ল। নেকড়েটা তখন মাথা ঝাড়া দিয়ে গর্জন করে উঠতেই মাদী কুকুরটা ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আর সব কুকুরগুলিও এসে পড়ল। তখন সবাই মিলে কামড়ে নেকড়েটাকে টেনে কয়েক হাত দূরে নিয়ে গেল। গ্রীগরী লিস্তনিতস্কির চাইতে সামান্য আগে ছিল। ঘোড়াথেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁটুগেড়ে বসে সে কোমর থেকে ছোরাখানা

টেনে বার করল। লোহার ডাণ্ডাহাতে কজাকটি পরিচিত স্বরে চীৎকার করে বল্লে—গলায়! গলায়—গলায় বসাও। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে সেও গ্রীগরীর পাশে বসল।

তারপর যে কুকুরটা নেকড়েটার পেট কামড়ে ধরেছিল সেটাকে টেনে সরিয়ে সে দড়ি দিয়ে নেকড়েটার সামনের পা' বেঁধে ফেলল। গ্রীগরী এক হাতদিয়ে নেকড়ের শ্বাসনালীটা ধরে অপর হাতে সজোরে ছুরিখানা আমূল বসিয়ে দিল।

—কুকুরগুলিকে তাড়াও!—ঘোড়া থেকে নাম্‌তে নামতে বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কি বল্লেন। অতিকষ্টে কুকুরগুলিকে সরিয়ে গ্রীগরী প্রভুর পানে চাইল। স্তেপান আস্তাখফ সামনেই দাঁড়িয়েছিল। প্রতিমুহূর্তে তার মুখে অদ্ভুত রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হাতের মুঠোয় লোহার ডাণ্ডাটা বারে বারেই কড়কড় করে উঠছে।

—তোমার বাড়ী কোথায়?—স্তেপানের দিকে ফিরে লিস্তনিতস্‌কি জিজ্ঞাসা করলেন।

—তাতারস্কায়া?—একটু ইতস্ততঃ করে স্তেপান জবাব দিল।

—নাম?

—আস্তাখফ।

—কখন বাড়ী যাবে ছোক্‌রা?

—আজ রাতেই।

—এটা নিয়ে চল না। পা দিয়ে নেকড়েটাকে দেখিয়ে লিস্তনিতসকি বল্লেন: যা লাগে আমি দেবো।

স্কার্ফখানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে লিস্তনিতস্‌কি পিঠ থেকে ফ্লাস্‌কটা খুলে ফেল্‌লেন।

গ্রীগরী তার ঘোড়াটার কাছে গেল। পা'দানিতে পা তুলে পেছনের দিকে চাইতেই দেখে স্তেপান ক্রোধে ধৈর্যহারা হয়ে কাঁপছে। বুকের

ওপর হাত চেপে গ্রীগরীর কাছে এসে পা'দানিটা ধরে ঘোড়ার পিঠে একরকম হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই স্তেপান বল্লে—ভালোই আছো, না গ্রীগরী?

—হাঁ।

—এখন কি ভাবছো?

—কি ভাববো বলো!

—পরের স্ত্রী চুরি করে নিয়ে তার উপর বেপরোয়াভাবে নিজের খেয়াল চালাচ্ছো, না?

—পাদানিটা ছেড়ে যাও।

—ভয় নেই, মারবো না।

—ভয় কোরবো কাকে? বাজে কথা বলবে না। স্তেপান।—মুখ চোখ লাল করে জোর গলায় গ্রীগরী বল্লে।

—আজ তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমি চাই না। কিন্তু বলে রাখছি, আজ কি কাল—একদিন না একদিন তোমাকে খুন আমি করবোই।

—একজন অন্ধ বলে ছিল একদিন আমরা দেখবোই।

—ঠিক জেনো, আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না। দশজনের কাছে তুমি আমার মুখে কালি দিয়েছ। আমার জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছ। ঊর্ধে দু'বাহু তুলে স্তেপান বল্লে—ভগবান জানেন কি জন্ত আমি চাষ করি। কিছু জমি ছাড়িয়ে দিলেও আমি শীতকাল কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সংসারের নির্মম শূন্যতা আমাকে পাগল করে তোলে। তুমি যে কালি লেপে দিয়েছো, এ জীবনে তা যাবার নয়।

—আমার কাছে অনুযোগ করা নিরর্থক। ওসব আমি বুঝি না। পরিতৃপ্ত যে কোনকালেই সে বুভুক্ষুর দুঃখ বোঝে না।

—আমি। স্থির দৃষ্টিতে গ্রীগরীর পানে চেয়ে স্তেপান বললে। বালকের মত সরল হাসিতে সহসা তার চোখের কোণ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।—একটা দুঃখু কিছুতেই ভুলতে পারছিনা গ্রীগরী, কিছুতেই পারি না। মনে পড়ে, বছর খানেক আগে মাশলেনিৎসা পরবের সময় দু'জনে আমরা মুষ্টিযুদ্ধে নেমেছিলাম?

—না, পড়ে না।

—পড়ে না? অবিবাহিতেরা যেখানে বিবাহিতদের সঙ্গে লড়েছিল? মনে পড়ে, কি ভাবে তোমায় আমি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলাম? তখন তুমি এর চাইতে অনেক দুর্বল ছিলে। আমার তুলনায় দুর্বল শুস্কের মত। পালাবার সময় যদি তোমায় আমি আঘাত করতাম তাহলে তোমাকে দু'ভাগ করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি তুমি সট্‌কে পড়লে। তখন যদি বুকের পাশে লাগাতাম তাহ'লে তখনই ভবপারে পাঠাতে পারতাম। আজ আর বেঁচে থাকতে হ'ত না।

—দুঃখু কোরে লাভ কি! এখনও একদিন মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা তো রইলই।

স্তেপান্ কি একটা কথা মনে করবার জন্য হাত দিয়ে কপাল রগড়ালে। তখনও পাদানিটা' ধরে সে ঘোড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গ্রীগরী তার প্রতিটি হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল। স্তেপানের কটা ঝুলে-পড়া গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গজান চিবুক ও মলিন ঘর্মাক্ত মুখ দেখে গ্রীগরীর মনে হ'ল যেন সে পাহাড়ের চুড়া থেকে দূরান্তের আবছা এক প্রান্তরের পানে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্গতা এবং মানসিক অবৃত্তি স্তেপানের দেহে একটা বিশীর্ণ পাণ্ডুর ছাপ এঁকে দিয়েছে। বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই নীরবে সে পেছনে পড়ল। স্তেপান পেছনে পড়েছে দেখে গ্রীগরী ঘোড়া ছুটাবে ঠিক এমন সময়ে সে ডেকে বললে—একটু দাঁড়াও! আকসিনিয়া কেমন আছে?

চাবুক দিয়ে জুতার জড়ান মাটি ঝেড়ে ফেলে গ্রীগরী উত্তর দিল: খুব ভাল! ঘোড়া থামিয়ে পেছনে চাইতেই গ্রীগরী দেখ্‌লে ক্লেপার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁতে একটা ঘাসের শিষ্‌ কাট্‌ছে। ক্ষণিকের জন্য তার কেমন একটা মায়া হ'ল; কিন্তু পর মুহূর্তেই ঈর্ষা এসে সেই ক্ষণিকের দুর্বলতার টুটি টিপে ধরল। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে সে চীৎকার করে বললে—মনেও কোরো না সে তোমার জন্য একবারও ভাবে!

—তাই নাকি?

জবাব না দিয়েই গ্রীগরী ঘোড়াটার কানের কাছে চাবুক হাঁকাল।

—পঁচিশ—

ইষ্টার রবিবারের পূর্ব রাত্রে আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছিল। সন্ধ্যা হতে না হ'তেই দনের বুকে অবিরাম কড়কড় শব্দ হতে লাগল। একখণ্ড ভাঙা বরফের আঘাতে প্রথম ভাসমান বরফের স্তূপ জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর সহসা মাইল তিনেক জুড়ে বরফ ভেঙে স্রোতের টানে ভাঁটিতে ভেসে যেতে লাগল। সেই ভাসমান বরফের ঘর্ষণের শব্দ গীর্জার ঘণ্টাধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। দনের প্রথম বাঁকের কাছে গিয়ে বরফরাশি আট্‌কে গেল। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে উপাসনার মিলিত কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে। ঝলকে ঝলকে আলো জানালা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের অন্ধকার তরুণতরুণীদের হাসিকেলি প্রেমগুঞ্জন, চুম্বন ও অশ্লীল আলোচনায় গুল্‌জার। দনের বুক থেকে একটা মৃদু মর্মরধ্বনি ভেসে আস্‌ছে। সেই ফিস্‌ফিস্‌ এবং ঝুম্‌ঝুম্‌ শব্দ

শুনে মনে হয়, পপলার গাছের মত দীর্ঘ তন্বী সুগঠিত এক অভিসারিকা বুঝি তার অদৃশ্য স্কার্ট খস্‌খস্‌ করে গজেন্দ্র গমনে চলে যাচ্ছে।

দুপুর রাতে দিমিত্রি কোরশুনফ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গীর্জার কাছে এসে হাজির হ'ল। কেশরের সঙ্গে বল্গা জড়িয়ে ঘোড়াটার পেটে একটা চড় মেরে মিচ্‌কা সেটাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ কান পেতে সে খুরের শব্দ লক্ষ্য করল; তারপর বেল্টটা ঠিকঠাক করে গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করল। বারান্দায় এসে টুপীটা খুলে ভক্তিভরে নমস্কার করে সে মেয়েদের ঠেলে বেদীর কাছে গেল। প্রথম সারিতেই মিচ্‌কা বাবাকে দেখতে পেল। কনুই ধরে টেনে মিচ্‌কা তার কানে কানে ফিসফিস করে বললে: একটিবার বাইরে এসো না বাবা!

ভীড় ঠেলে বাইরে আসবার সময় চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন গন্ধে মিচ্‌কার নাক জ্বালা করতে লাগল। জ্বালানো মোমের গন্ধ, স্ত্রীলোকের ঘামের ভ্যাপসানি, ভিজা চামড়ার দুর্গন্ধ, পোষাক পরিচ্ছদের বহুদিন সঞ্চিত বোঁটকা গন্ধ (বড়দিন ও ইষ্টার পর্ব ছাড়া তো আর তাদের দ্বিতীয় ব্যবহার নাই) সব মিলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। বারান্দায় এসে বাবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে মিচ্‌কা জানাল: নাতালিয়া মরতে বসেছে বাবা।

ইষ্টার শুক্রবারে পাড়ার মেয়েরা অনেকে কোরশুনফের প্রতিবেশী শেলগেইয়া আইদাম্নিকভার ঘরে এক বৈঠক বসাল। আইদাম্নিকভার স্বামী গাভ্রিলা লোদ্জ শহর থেকে লিখেছে যে ইষ্টার উপলক্ষে সে ছুটি নেবার চেষ্টা করছে। ইষ্টারের পূর্ব সোমবারেই শেলগেইয়া বাড়ীতে রঙ করে সব ফিটফাট করে বৃহস্পতিবার থেকে স্বামীর শুভাগমনের জন্ত উৎসুক প্রতীক্ষায় অনেকবার ঘরে-বাইরে করেছে। চুল আঁচড়ে একবার ফটকে, একবার বেড়ার কাছে, আবার ঘরে এই

ভাবে অধীর প্রতীক্ষায় সে সারাটি দিন কাটাল। একবার চোখের উপর হাত দিয়ে রাস্তা লক্ষ্য করে পেলগেইয়া ভাবলেঃ ঐ আসছে বুঝি! বর্তমানে সে অন্তঃস্বত্বা এবং সেটা বৈধভাবেই। গত বছর রেজিমেন্ট থেকে ছুটি নিয়ে গাব্রিলা চার রাত বাড়ীতে কাটিয়ে গেছে। পঞ্চম দিবসে অতিরিক্ত ভোদকা পান করে নেশার ঘোরে গাব্রিলা অকথ্য ভাষায় জার্মান ও পোলদের গালাগালি দিয়ে অবশেষে পোলদের সম্বন্ধে এক প্রাচীন কজাক্ সঙ্গীত ধরে দিল। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই জুটে সঙ্গীত ও ভোদ্কা পানে সান্ধ্যভোজন পর্যন্ত বিভোর হয়ে রইল।

সান্ধ্য ভোজনের পর বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে আবার গাব্রিলা কর্মস্থলে যাত্রা করল। সেই দিন থেকেই পেলগেইয়া স্কার্টের কোমরবন্ধ লক্ষ্য করতে সুরু করে।

সন্তানসম্ভাবনা সম্পর্কে পেলগেইয়া যা নাতালিয়াকে বলেছিল তার মর্মার্থ এইঃ গাব্রিলা আসবার দু'একদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি সামনে গত বছর আমরা যে গরুটা বেচে দিয়েছিলাম সেইটা। সে আমার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। টপটপ করে তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। ভাবলাম হে ভগবান! কি বিশ্রীভাবে আমি তাকে দুইয়েছি। পরদিন বৃদ্ধা দ্রোজদিখা আমাদের বাড়ী এলে তাকে স্বপ্নের কথা বললাম। সে আমাকে একখণ্ড মোম ভেঙে তাল পাকিয়ে গোবরের মধ্যে পুঁতে রাখতে বললে; কেননা স্বপ্নটা নাকি ভাল নয়। আমিও তার কথা মত ছুটে মোমবাতি আনতে গেলাম; কিন্তু পেলাম না। একখানা মোম আমার ছিল। কি জানি ছেলেরা হয়ত নিয়ে গেছে বা আরশুলায় খেয়ে ফেলেছে। তারপরই গাব্রিলা বাড়ী এল; আর আমার এই দুর্ভোগ!

—এর আগে বছর তিনেক বেশ ছিলাম। আর দেখ এখন কেমন হয়েছি।—অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিজের অবস্থা দেখিয়ে পেলগেইয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার কাহিনী শেষ করল।

স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় পেলগেইয়া ছটফট করছিল। একেলা থেকে থেকে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই আজ সে পড়শীদের নেমন্তন্ন করে বাড়ী এনেছে। নাতালিয়া একটা অসমাপ্ত মোজা হাতে করে এল। বসন্ত সমাগমে গ্রীশকা দাদুর শীত-বোধ অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। অন্তরের নিভৃত কামনা চাপা দেবার জন্ম নাতালিয়া আজ নিজেকে বেশ হাসিখুশীই রেখেছে। পাছে নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় আজ প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যে সে অতিমাত্রায় হাসছে। পেলগেইয়া তার গোলাপী শিরা-বেরুনো অনাবৃত পা দুখানি বার করে স্তোভের কাছে বসে তরুণী কুদ্দুলে ফ্রোশিয়াকে ব্যঙ্গ-পরিহাস করছে।

—তোর স্বামীকে কি করে মারলি ফ্রোশিয়া ?

—কেন, জান না ? পিঠে-মাথায় যেখানে পেলাম…

—তা বলছিনে ! কিসের জন্ম মারলি ?

—কারণ নিশ্চয়ই ছিল !—অনিচ্ছায় ফ্রোশিয়া বললে।

—বল না শুনি।

—বলবার কি আছে ?

—ভয় কি ?…এখানে বাইরের কেউ নেই তো।

থুক করে সূর্যমুখীর বীজের একটা চিবানো খোসা হাতের পাতায় ফেলে ফ্রোশিয়া হেসে বললে : জানিস, বহু দিন ধরে আমি তার পরের ঘরে আনাগোনা লক্ষ্য করছিলাম। তার পর একটা লোক আমায় বললে যে দনের ওপারের একটা ছুঁড়ি মেয়েকে নিয়ে সে কারখানার ধারে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি তারা…

—তোর স্বামীর কোন খবর হ'ল নাতালিয়া ?

নাতালিয়ার পানে ফিরে অপর একটি স্ত্রীলোক বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—সে ইয়াগোদনয়াতে আছে।—সসঙ্কোচে নাতালিয়া বলল।

—তুই কি আর তাকে নিয়ে ঘর করবি না ভেবেছিস নাকি ?

—ও চাইলেও সে চায় না। পেলগেইয়া কথার ফাঁকে বললে। নাতালিয়ার মনে হ'ল তার সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে এসে জড় হয়েছে। মোজাটির পর আরও ঝুঁকে বসে অলক্ষ্যে আড়চোখে সে মেয়েদের লক্ষ্য করতে লাগল। যখন বুঝলে যে তার লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই তখন ইচ্ছে করে সে হাঁটু থেকে উলের বলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে আনাড়ীর মত হাতড়াতে লাগল। কিন্তু তার এ নিষ্ফল অভিনয় সমবেত কারও চোখ এড়াল না।

—মুখে আগুন মিনসের! ওর কথা আর তুই মনেও আনিস নে! ও শুধু তোর কাঁধের জোয়াল নাতালিয়া! জনৈক স্ত্রীলোক সহানুভূতি দেখিয়ে উপদেশ দিল।

বায়ুতাড়িত স্ফুলিঙ্গের মত নাতালিয়ার কৃত্রিম আনন্দদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল। ক্রমে মেয়েদের আলোচনা রুচিকর খোশখবরের দিকে মোড় ঘুরে যায়। খানিক পরেই মজলিসটি পাড়ার অধুনাতম কেলেঙ্কারীর সুললিত বর্ণনা টিকা-টিপ্পনিতে মশগুল হয়ে উঠল। বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত নাতালিয়াকে এক রকম বাধ্য হয়েই থাকতে হ'ল। বাড়ী ফিরবার পথে বহু এলোমেলো সিদ্ধান্ত তার মাথায় আনাগোনা করতে লাগল। এই অনিশ্চিত অবস্থার কলঙ্ক তাকে বেপরোয়া করে তুলল। অনিশ্চিত বটেই! কেননা নাতালিয়া তখনও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতো না যে গ্রীগরী এ জীবনের মত তাকে ছেড়ে গেছে এবং কোন

কালেই সে আর ফিরে আসবে না। গোপনে একখানা চিঠি লিখে জানবে ঠিক করল যে, শ্রীগৌরী কি এ জীবনের মত তাকে ত্যাগ করেছে, না আবার ফিরবার কথা ভাবছে। বাড়ী ফিরে দেখে শ্রীশঙ্কা একখানি জীর্ণ চামড়ার বাঁধাই তেল চিরকুট বাইবেল হাতে করে বসে আছেন। বাবা রান্নাঘরে বসে জাল সারছে। মা ছেলেপিলেদের ঘুম পাড়িয়ে নিজেও স্টোভের কাছে কাত হয়ে আছে। জ্যাকেট খুলে নাতালিয়া বিভ্রান্তের মত এ ঘর ওঘর ঘুরে অবশেষে দাদুর ঘরে এসে ইকনটার নীচেকার ধর্মগ্রন্থের পাতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইল।

—তোমার কাগজ আছে দাদু!

—কি কাগজ? সবিস্ময়ে ললাট কুঞ্চিত করে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

—লিখবার কাগজ?

বৃদ্ধ শুবমালাখানি হাতড়ে একখণ্ড কুঁচকনো কাগজের টুকরা পৌত্রীর হাতে দিলেন।

—পেন্সিল?

—আর জ্বালাসনে বাপু, 'বাবার কাছ থেকে নে গে যা!

বাবার টেবিল থেকে একখণ্ড পেনসিল যোগাড় করে নিজের ঘরে এসে নাতালিয়া খিল দিয়ে বসল। কি লিখবে? এত কথা ভেবেছে কিন্তু লিখতে গিয়ে-যে সবই পালিয়ে যায়! মনের জ্বালা লেখনীমুখে মুক্তি পায় কই? বহুক্ষণ ভেবে কয়েকবার লিখতে আরম্ভ করতে গিয়ে থেমে অবশেষে নাতালিয়া লিখল:

শ্রীগৌরী পান্তেলিয়েভিচ,

কি নিয়ে আমি বাঁচবো বলতে পারো? আমার সাধ আশা কি এ জীবনের মত শেষ হয়ে গেছে! যাবার বেলা তুমি একটি কথাও আমাকে

বলে গেলে না। আমার কোন দোষ নেই। বহুদিন আমি মুক্তির আশায় বসে ছিলাম। ভেবে ছিলাম তুমি চিরকালের জন্ত গেছ এই কথা জানিয়ে আমার বাঁধন খুলে দেবে। কিন্তু আজ পর্যন্তও কিছুই জানতে পেলাম না। ভেবে ছিলাম রাগের মাথায় চলে গেছ, আবার ফিরে আসবে। আমি তোমার হয়েই থাকতে চাই। বিচ্ছেদ হবার চাইতে মরণও শ্রেয়। দয়া করে উত্তর দিও। আজকে আমি মাঝপথে দাঁড়িয়ে; তোমার উত্তর পেলে পথের দিশা পাবো।

যীশুর দোহাই, রাগ করো না গ্রীশকা!

নাতালিয়া।

পরদিন ভোদকা খাবার পয়সা দেবে এই সর্তে নাতালিয়া গেচকাকে ইয়াগোদনয়া যেতে রাজী করাল। প্রতিশ্রুত ভোদকা পানের উল্লাসে বিভোর গেচকা মিরণকে না বলেই ইয়াগোদনয়ার দিকে রওনা হল। বিকেল বেলা চিনির ঠোঙার একখণ্ড নীল কাগজের টুকরা নিয়ে গেচকা ফিরল। কাগজখানি বার করতে করতে নাতালিয়ার পানে চেয়ে গেচকা ক্লান্তস্বরে বললে: ওঃ! কি বিচ্ছিরি পথ রে বাপু! এমন একটা ঝাঁকানি খেলাম, মনে হ'ল যেন পেটের পিলে উল্‌টে গেছে।

পত্রখানি পড়তে পড়তে নাতালিয়ার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। পত্রের শব্দ চতুষ্টয় সুতীক্ষ্ণ সূচের মত তার বুকে ফুটে বসল। শরবিদ্ধা হরিণীর মত নাতালিয়া ছটফট করতে লাগল।

একাকিনীই থাকো।

—গ্রীগরী মেলেখফ।

নাতালিয়া টলতে টলতে ঘরে ছুটে গিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। মা যথাসময়ে ইষ্টার রবিবারের পিঠে তৈয়ারী করবার জন্ত তোড়জোড় করাচ্ছিল। নাতালিয়াকে ডেকে বলল—নাতালিয়া, এদিকে একটু আয় মা, একা আর পারি না।

—আমার ভীষণ মাথা ধরেছে মা, একটুখানি না শুয়ে পারছি না।

মা দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—হাঁ, রোগে পড়বার এই ত' সময়।

নাতালিয়া দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে পড়ে রইল।

প্রথম একটা পশমী শাল মুড়ি দিয়ে নাতালিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে রইল। ক্ষীণ কম্পনে তার সারা দেহ মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। মিরণ গ্রীগরিয়েভিচ এবং গ্রীশকা গীর্জার রওনা হবার সময় উঠে সে রান্নাঘরে গেল; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, দৃষ্টি শুষ্ক অশ্রুতে ঝাপসা।

পাজামার বোতাম আটকাতে আটকাতে কন্যার দিকে চেয়ে মিরণ সস্নেহে বল্লে: বড় বে-সময়ে তোর অসুখ করে বসল! চল্ আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যাবি।

—তোমরা যাও, আমি একটু পরে আসছি।

উভয়েই চলে গেল। রান্নাঘরে তখন শুধু লুকিনীচ্না আর নাতালিয়া। নাতালিয়া অস্থির ভাবে পায়চারি করছে; ঝাপসা চোখে তোরঙ্গ ভর্তি পোষাকের পানে চাইতেই পুরানো কথা মনে আসে। বিড়বিড় করে নাতালিয়া কি বলে। লুকিনীচ্না ভাবলে মেয়ে কোন্ জামাটা পরবে ঠিক করতে পারছে না। সস্নেহে কন্যার পানে চেয়ে বললে: আমার ঐ নীল স্কার্টটা পর, বেশ মানাবে তোকে। দেবো?

—না থাক, আমি এইটে পরেই যাবো! তোরঙ্গ থেকে সযত্নে নাতালিয়া সবুজ স্কার্টটা বার করল। অমনিই মনে পড়ল গ্রীগরী যেদিন তাকে দেখতে আসে এবং প্রথম চকিত চুম্বনে তাকে বিব্রত করে তুলে ছিল সেদিনও তার এইটেই পরা ছিল। রুদ্ধ কান্না চেপে বাক্সের ডালায় বুক চেপে নাতালিয়া এলিয়ে পড়ল।

—কি হ'লো নাতালিয়া? মা জিজ্ঞাসা করল।

কোনমতে কান্নার আবেগ চেপে নিজের অস্থিরতা দমন করে শুষ্ক;

হাসি হেসে নাতালিয়া বললে—কিছু নয় মা, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।

—আমায় লুকোসনি নাতালিয়া, আজ ক'দিন আমি লক্ষ্য করছি…

—কি লক্ষ্য করেছ?—অশোভন বিরক্তির ভাব দেখিয়ে দু'হাতে স্কার্ট চেপে ধরে নাতালিয়া বললে।

—না, তোর ভাবগতি ভাল নয়! একটা স্বামী না হলে আর তোর চলে না!

—খুব হয়েছে মা, আর কাজ নেই! একটা তো রয়েছে।

নিজের ঘরে গিয়ে চটপট করে সাজ পোষাক সেরে নাতালিয়া আবার রান্নাঘরে এল। কিন্তু এই নিপুণ পরিপাটিও তার গালের হাসি রেখার মালিন্য মুছে ফেলতে পারল না।

—তুই যা, আমি গোছগাছ করে আসছি!—মা বললে।

কোমরে একখানা রুমাল নিয়ে নাতালিয়া বেরিয়ে পড়ল। বাতাসে বরফ ও ভিজা খড়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঁ হাতে স্কার্টের প্রান্ত ধরে নাতালিয়া দ্রুতপদে গীর্জায় এলো। পথে পথে বহু অসংলগ্ন অর্থহীন চিন্তা এবং ছুটির কথা ভেবে নাতালিয়া তার প্রাক্তন মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত বারে বারেই তা ঘুরে ফিরে বুকের মধ্যে লুকান সেই চিনির ঠোঙার কাগজের টুকরো-টুকুর দিকে ফিরে যেতে চাইছে। মনে পড়ছে গ্রীগরী ও সেই পরিতৃপ্তা মেয়েটির কথা। হয়ত এখন মেয়েটি তাকে উপহাস করছে, বা তার উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছে। গীর্জার বেড়ার মধ্যে ঢুকতেই কয়েকটি ছেলে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা নাতালিয়া শুনলো ওরা তারই সম্বন্ধে বলাবলি করছে।

—কে গেল দেখলি?

—নাতালিয়া কোরজুনভা না?

—ও নাকি বিয়ের আগেই অনেক কীর্তি করেছে। তাই টের পেয়েই ত ওর স্বামী চলে গেল। ক্ষত কৌমার্যের স্ত্রী নিয়ে কে আর ঘর করতে চায় বাপু!

—না রে না। ওর শ্বশুর খোঁড়া পান্তেলিমনের সঙ্গে নাকি ওর বেশ জমে উঠেছিল।

—বা বলেছিল? না হ'লে শ্রীগরী পালায়!

উঁচুনীচু পাথরে হোঁচট খেতে খেতে নাতালিয়া গীর্জার বারান্দায় উঠল। মেয়েরা তাকে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে রুদ্ধশ্বাসে সে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলো। ফটকের কাছে এসে দম নিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে স্কার্টের আঁচলে পা জড়িয়ে নাতালিয়া. হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চালার হাঁ-করা খোলা দরজাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নাতালিয়া এক দৌড়ে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে ঢুকল। মাথায় তখন তার বেপরোয়া পাগলামি চেপে বসেছে। সেই ঠাণ্ডা শুষ্ক চামড়ার গন্ধওয়ালা চালার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের লাঞ্ছিত জীবনকে শত ধিক্কার দিয়ে নাতালিয়া একটা কোণে বসল। কাস্তেখানা নিয়ে ধীর অকম্পিত হস্তে সে আছারিখানা খুলে ফেলল। তার পর বেপরোয়া পাগলামির বশে মাথা চিৎ করে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে কাস্তেখানা গলার মধ্যে বসিয়ে দিলে। যন্ত্রণায় সর্ব-শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। টলতে টলতে নাতালিয়া ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় নি বুঝে আবার চার হাত পায়ে কাস্তেখানা খুঁজতে লাগল। বুকের ওপর রক্তধারা দেখে তখন তার বেশ ভয় ধরেছে; কাজেই তাড়াতাড়ি জ্যাকেটের বোতাম ছিঁড়ে এক হাতে স্তন টেনে ধরে অপর হাতে কাস্তেখানা সেই ঋজু স্তনের মধ্যে বসিয়ে দিলে। তার পর হামাগুড়ি

দিয়ে দেয়ালের কাছে এগিয়ে কাস্তেটার বাঁকা দিকটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দু-হাতে মাথা চেপে ধরে চাপ দিতে লাগল। পড়্পড়্ করে প্রতিরোধী মাংস ভেদ করে কাস্তেখানা বসে গেল। এক সুতীব্র যাতনায় তার সারা বুক টন্টন্ করে উঠল। দম বন্ধ হয়ে এলো। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল; কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে। দৃষ্টি ঝাপসা, অন্ধকার।

সহসা কবাট খুলবার শব্দ হ'ল। পা টিপে টিপে সুকিনীচন্দ্রা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। গীর্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন বিকট গর্জনে ভাসমান বরফরাশি দনের ভাঁটিতে ভেসে চলেছে। পরিপূর্ণ বন্ধনমুক্ত নদী আজ কলকল রবে তার বুকের পাষাণ-বোঝা বিসর্জনের আশায় আজব সাগরের পানে ধেয়ে চলেছে।

—ছাব্বিশ—

ষষ্ঠ মাসে আকসিনিয়া গ্রীগরীকে জানালে সে অন্তঃসত্ত্বা। তখন আর গোপনই বা কি করে রাখা যায়। এত কাল বলেনি, পাছে গ্রীগরী মনে করে যে এ তার সন্তান নয়!

একদিন সন্ধ্যাবেলা তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে গ্রীগরীর মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে সসঙ্কোচে আকসিনিয়া বলে ফেল্ল। শুনে গ্রীগরী জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিরক্তি ভরে কয়েক বার গলা ঝাড়ল।

—আগে বললে না কেন?

—ভরসা পাইনি গ্রীশ্কা! ভেবেছি হয়ত তুমি ছেড়ে যাবে।

বিছানা খুঁটিতে খুঁটিতে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল—ক'মাস বাকী?

—আগষ্টের প্রথম বলেই মনে হচ্ছে।

—এ কার ? স্তেপানের ?

—না, তোমার !

—হুম্ !

—শুনে দেখ ! কাঠ কাটার দিন থেকে আজ……

—বাজে কথা বোলো না আকসিনিয়া ! যদি স্তেপানেরও হয় কোথায় তুমি যাবে বল ?

বেঞ্চের পর বসে ডুক্‌রে কেঁদে আকসিনিয়া বল্লে : এত বছর তার সঙ্গে থাক্‌লাম তাতে কিছু হ'লো না, নিজেই ভ্যাখোনা ভেবে ! আমি বন্ধ্যা নই ! এ নিশ্চয়ই তোমার ! আর আজ তুমি…

গ্রীগরী এ সম্পর্কে আর দ্বিতীয় কথাটি বললে না। সেই দিন থেকেই একটা অস্বস্তিকর নিঃসঙ্গতা এবং আকসিনিয়ার প্রতি টানের মধ্যে একটা ক্ষীণ অনুকম্পার ভাব তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। আকসিনিয়াও কৃপাপ্রার্থিনী নয়। আপনার মধ্যেই সে নিজেকে সমাহিত করে রাখল। গ্রীষ্মকাল থেকেই তার কমনীয়তা একে একে ছুটি নিতে আরম্ভ করল। তবু দেহসৌষ্ঠবের বিন্দুমাত্র অপহ্নব হ'ল না। এই পূর্ণগর্ভাবস্থাও তার সুঠাম দেহের বলিষ্ঠ গঠনকে হার মানাতে পারলো না ; বরং পরাজিত হয়ে রইল। মুখখানি কিছুটা কৃশ দেখালেও, চোখের সহাস দীপ্তি তাকে এক নব শ্রীমণ্ডিত করে তুলছিল। দৈনন্দিন রান্নাবান্নার কাজ সে অনায়াসেই করত ; অবশ্য সেবারে মজুরও কিছু কম খাট্‌ছিল।

ইয়েভগেনির প্রচেষ্টায় গ্রীগরী সেবারকার মত বসন্তকালীন ট্রেনিং ক্যাম্পে যাবার হাত থেকে অব্যাহতি পেল। কাজের মধ্যে তখন কখনও শস্য মাড়াই করতে সাহায্য করা, কখনও বা বৃদ্ধ নিক্তনিতস্‌কিকে নিয়ে সহরে যাওয়া ; বাকী সময় কাট্‌ত বৃদ্ধের সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত আরাম গ্রীগরীকে নষ্ট করে ফেলবার উপক্রম ক'রল।

দিনে দিনে সে অলস ও মোটা হ'য়ে উঠল। দেখে বয়স ঠিক করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আসন্ন সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের চিন্তায় ক্রমেই সে উদ্বিগ্ন হয়ে প'ড়ল। ঘোড়া বা সাজসরঞ্জাম কিছুই তার নেই। বাবার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাবার আশাও সুদূরপরাহত। কাজেই বাবার কাছ থেকে না চেয়ে যাতে নিজেই একটা ঘোড়া কিনতে পারে সেজন্য গ্রীগরী মাইনে থেকে টাকা জমাতে আরম্ভ করল। সঞ্চয়ের জন্য তাকে ধূমপান পর্যন্ত সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হ'ল। বৃদ্ধ লিস্তনিতস্কিও কিছু সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। বাবার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না বলে গ্রীগরী যে অনুমান করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। জুন মাসের শেষাশেষি পিয়োতর একবার দেখা করতে আসে। কথার ছলে সে বলে ফেল্ল যে বাবা নাকি গ্রীগরীর পর পূর্বের মতই চটে আছে এবং এমন কথাও ব'লছে যে তাকে ঘোড়া কিনতে পর্যন্ত কোনও সাহায্য করবে না। বলেছে যে স্থানীয় কর্তাদের কাছে গিয়ে একটা নিয়ে আসুক।

—সে চিন্তা তাকে করতে হবে না, আমার নিজের ঘোড়া নিয়েই আমি পল্টনে যাবো! আমার নিজের ঘোড়া কথাটার পর জোর দিয়ে গ্রীগরী বল্লে।

—কোথায় পাবি তুই? পিয়োতর জিজ্ঞাসা করল।

—আর না পারি ভিক্ষে করব, না হয় নেচে যোগাড় করব। তাও যদি না হয় তাহ'লে চুরি করব।

—এই তো পুরুষের মত কথা!

—নিজের মাইনে থেকেই আমি ঘোড়া কিনব। গম্ভীর ভাবে গ্রীগরী বল্লে।

সিঁড়িতে বসে ঠোঁটে গোঁফের প্রান্ত চেপে ধরে পিয়োতর গ্রীগরীর চাকুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। উঠবার বেলা ভাইকে

বল্লে: তোমার আবার ফিরে যাওয়া উচিত। ইটের দেয়ালে বৃথা মাথা ঠুকে কি লাভ বলো!

—ভেবে দেখিনি।

—ওকে নিয়েই থাকবো ঠিক করেছ?

—কাকে নিয়ে?

—একে নিয়ে?

—আপাতত, কিন্তু কেন?

—অমনিই জিজ্ঞাসা করলাম!

দাদাকে রওনা করিয়ে দিতে গিয়ে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা না করে আর পারলো না—বাড়ীর সব কেমন আছে? রেলিং থেকে ঘুড়ীটা খুলে মুচকি হেসে পিয়োত্তর বল্লে—ইঁদুরের গর্তের মত বাড়ীর তো আর তোমার অন্ত নেই। ভালই আছে! মা তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছে। এবারে আমাদের অনেক খড় হয়েছে গ্রীশকা, তিন মড়াই।

কথাটা এড়াবার জন্য বৃদ্ধা ঘুড়ীটার পানে চেয়ে গ্রীগরী বললে—এবারে এটার কোন বাচ্চা হয়নি।

—না! হবে বলেও মনে হয় না! খৃস্তোনিয়ার কাছ থেকে যে বাচ্চাটা আমরা নিয়েছিলাম না, তার একটা হয়েছে। মদ্দা! আচ্ছা বাচ্চা হয়েছে! যেমন লম্বা চওড়া, তেমন বলিষ্ঠ গঠন…কালে চমৎকার ঘোড়া হবে।

গ্রীগরী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে: গাঁয়ে যেতে বড় মন টানছে পিয়োত্তর। সেই ডনের কথা যখন ভাবি…এখানে কোনও স্রোতজল তুমি দেখবে না, শুধু মাঠ আর মাঠ!

—একদিন তাহ'লে চল না!—ঘুড়ীটার পিঠে চড়তে চড়তে পিয়োত্তর বললে।

—যাবো একদিন!

—আচ্ছা আসি তাহ'লে!

—এসো!

প্রাঙ্গণ পার হয়ে কি কথা মনে পড়তেই পিয়োতর ফিরে ডাকল গ্রীগরীকে; গ্রীগরী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

—নাতালিয়া, আমি ভুলে গেছি…পোড়াকপাল!

কথাটার শেষাংশটুকু বাতাস গ্রীগরীর শ্রবণ থেকে কেড়ে দূরে ঠেলে নিয়ে গেল। পিয়োতর এবং তার বাহনটি উর্দ্ধোত্থিত ধূলিকণায় ঢাকা পড়ে গেল। কিছু কাল নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থেকে ধীরপদে গ্রীগরী আস্তাবলের দিকে গেল।

গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের জল শুকিয়ে এল। মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা পড়লেও তা বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। উত্তাপে নিয়মিত সময়ের পূর্বেই শস্য পেকে উঠল। রাই কাটা শেষ হ'তে না হ'তেই যবের শীষের রঙ বদলে উঠল। পর পর চার দিন মজুরদের সঙ্গে জমিতে গিয়ে গ্রীগরী ফসল কেটে আনল।

সেদিন হাতের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে আকসিনিয়াও ওদের সঙ্গে মাঠে যাবার বায়না ধরল। গ্রীগরী তাকে এড়াবার চেষ্টা করলেও চটপট মাথায় রুমালখানা বেঁধে সে ওদের সঙ্গী হ'ল।

এতকাল ধরে আকসিনিয়া অধীর আগ্রহে যে দিনটির অপেক্ষা করছিল, যার জন্য গ্রীগরীর উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না, এই ফসল কাটবার মধ্যেই তা উপস্থিত হ'ল। নিশ্চিত লক্ষণ টের পেয়ে আকসিনিয়া কাজ ফেলে রেখে একটা ফসলের গাঁজার তলায় মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মজুরেরা ফসল কাটবার যন্ত্রটা নিয়ে বৃত্তাকারে তাকে পরিক্রম করে গেল। খাবারবেলা একটি মজুর আকসিনিয়াকে ডেকে বল্লে—এই! কি বিশ্রী জায়গায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছো দেখো না! ওঠ, ওঠ, না হয় গলে যাবে।

গ্রীগরী তার জায়গায় আর একজন মজুরকে কাজে লাগিয়ে আকসিনিয়ার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—কি হলো ?

প্রসব-বেদনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যন্ত্রণায় অধীর আকসিনিয়া ঠোঁট কামড়ে বললে—বেদনা…

—বলেছিলাম না, এসো না! তা তখন তোমার গ্রাহ্যিই হ'ল না। এখন কি করি ?

—রাগ কোরো না গ্রীশ্‌কা! ওঃ—ওঃ! গাড়ীতে ঘোড়াটা জুড়ে বাড়ী চল। এখানে কি করে কি হবে, সব ব্যাটাছেলেরা রয়েছে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে আকসিনিয়া বললে।

গ্রীগরী দৌড়ে ঘোড়া আনতে গেল। সামান্য দূরেই একটা খাদের মধ্যে ঘোড়াটা চরছিল। আকসিনিয়া চারহাত পায়ে উঠে বসে থু থু করে মুখ থেকে চিবানো শস্যের মঞ্জরীগুলি ফেলে দিলে।

পাছে মজুরেরা ককানি শুনতে পায় এই ভয়ে আকসিনিয়া গ্রীগরীর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে মুখের মধ্যে রুমালখানা গুঁজে দিলে। গ্রীগরী তাকে ধরে কোন মতে গাড়ীতে তুলে দ্রুত বেগে বাসার দিকে গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

—ওঃ! অত তাড়াতাড়ি চালিও না…ওঃ! মরে যাবো! গ্রীশ্‌কা বড্ড ঝাঁকানি লাগছে। কাত হয়ে গাড়ীতে বসে করুণ কণ্ঠে আকসিনিয়া বললে।

গ্রীগরী পেছনে না চেয়েই গাড়ীর বেগ কিছুটা সংযত করে দিল। উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যাবার বেলা গাড়ীর ঝাঁকানিতে দু'হাতে গাল চেপে আকসিনিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় গাড়ীর ওপর ছটফট করে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। একটু পরেই আবার গ্রীগরী গাড়ীর গতি দ্রুততর করে। মুহূর্তের জন্য আকসিনিয়ার কোন কাকুতি শোনা গেল না। ঘর্ঘর শব্দে চাকা ছুটে চলেছে। প্রথমে তার এ নীরবতায় গ্রীগরী

কান দেয় নি; কিন্তু একটু পরেই নীরবতায় কারণ চিন্তা করে গ্রীগরী পেছনে চাইল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে আকসিনিয়া গাড়ীর এক ধারে গাল চেপে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ঠোঁট-দু'খানি জল থেকে তোলা মাছের মত নড়েছে। কপাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। গ্রীগরী ঘাড় বাঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই আড় চোখে চেয়ে আকসিনিয়া বললে—আর বাঁচলাম না গ্রীশ্‌কা!

গ্রীগরী চমকে উঠল। ভয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। নিজের আতঙ্ক লুকোবার জন্য সে আকসিনিয়াকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

—যা'তা কথা বোলোনা বোকা কোথাকার। মাথা নেড়ে আকসিনিয়ার দিকে ঝুঁকে সে তার পা দুটো টান করে দিলে: আকসিনিয়া লক্ষ্মী…

মুহূর্তের জন্য আকসিনিয়ার সমস্ত বেদনার অনুভূতি মিলিয়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তা দ্বিগুণতর হয়ে ফিরে এল। পেটের মধ্যে কি একটা যেন বাঁকা হয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে টের পেয়ে আকসিনিয়া এক তীব্র অস্পষ্ট আর্তনাদে গ্রীগরীর কানে তালা লাগিয়ে দিল। গ্রীগরী আরও জোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসাতে লাগল।

ওঃ!…আঃ! অসহ্য যন্ত্রণায় আকসিনিয়া করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। একটু পরেই চাকার নিরবচ্ছিন্ন ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ডাকছে—গ্রীশ্‌কা!

বলগা টেনে ধরে গ্রীগরী ঘাড় ফেরাল। রক্তাপ্লুত আকসিনিয়া হাত পা ছড়িয়ে অবশভাবে শুয়ে আছে। তার স্কার্টের নীচুতে দুপায়ের মাঝখানে একটি শাদা রক্তমাখা জীবন্ত প্রাণী নড়ছে। হুড়মুড় করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে গ্রীগরী তার কাছে গেল। আকসিনিয়ার

[illegible] একটা অবলার মুখের পানে চাইতেই তার মনে হ'ল যে বলছে—দাঁত দিয়ে নাড়ীটা কেটে ফেলে স্কার্টটা থেকে সুতো ছিঁড়ে বেঁধে দাও।

কম্পিত হস্তে দ্রৌপদী নিজের পশমী শার্টটা ছিঁড়েই সুতো বার করল। তারপর মুহূর্তের জন্য শিশুটির পানে চেয়ে পলকের মধ্যে দাঁত দিয়ে নাড়ীটা কেটে রক্তমোক্ষণ বন্ধ করবার জন্য সযত্নে সুতো দিয়ে বেঁধে দিল।

—সাতাশ—

বিস্তৃত এক উপত্যকার মধ্যে ইয়াগোদনয়া এস্টেট্। উত্তরা বাতাসের গতি মোড় ঘুরে যায়—গ্রীষ্ম এগিয়ে আসে—হেমন্তের ঝরাপাতায় বনতল ভরে যায়; আবার শীতের তুষার ও বরফের দোর্দণ্ড প্রতাপে মাটি জমাট বেঁধে ওঠে। কিন্তু তন্দ্রালু ইয়াগোদনয়া দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বিকার ভাবে ঋতুরাজের এই খেয়ালী রঙ্গ সহ্য করে যাচ্ছে।

চীনা হাঁসের প্যাক প্যাক, অসংখ্য গিনি-পিগের বিক্ষিপ্ত বিচরণ এবং আস্তাবলের চালে ময়ূরের কলাপনৃত্যে গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণ সর্বদাই মুখর। পাখী পোষা বৃদ্ধ জেনারেলের একটা নেশার মত। এমন কি একটা ডানাভাঙা মরাল পর্যন্ত তিনি পুষেছিলেন। নভেম্বর মাসে দক্ষিণাভিমুখী উড়ন্ত বনমরালীদের ডাক শুনে যখন সে কাঁসার-ঘণ্টার মত ঝাঁঝাল কর্কশ কণ্ঠে ডেকে তাদের সঙ্গী হবার জন্য পাখার ঝাপট মেরে লাফিয়ে বেড়াত, বৃদ্ধ জেনারেল জানালা থেকে তার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে আনন্দে হো হো করে হেসে উঠতেন; আর তার সেই বিকট হাসির শব্দ শুভ্র হলঘরে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে তামাকের ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যেত।

গ্রীগরী ইয়াগোদনয়া আসবার পর মাত্র দুটি ঘটনা এখানকার নির্ঝঞ্ঝাট একঘেয়ে জীবন-যাত্রার মধ্যে ক্ষীণ বৈচিত্র্য দান করেছিল। প্রথম ঘটনা আকসিনিয়ার সন্তান প্রসব, দ্বিতীয়টি একটা রাজহাঁস হারান। কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে কিছুদিনের মধ্যেই সবাইর কৌতূহল থামল; আর রাজহাঁসটারও একটা হদিস্ মিলল। প্রান্তরে তার পালক দেখে নিশ্চিত অনুমান করা গেল যে, শৃগালের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই তাকে হারাতে হয়েছে।

ডিসেম্বর মাসে ভেশেনস্কায়াস্থিত জিলার সদর শাসন কার্য্যালয় থেকে একদিন গ্রীগরীর আহ্বান এল। সেখানে তাকে ঘোড়া কিনবার জন্য একশত রুবল দিয়ে বড়দিনের দুদিন পরে ম্যানকোভাতে গিয়ে সৈন্যদলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

নিতান্ত মানসিক অস্বস্তি নিয়ে গ্রীগরী ইয়াগোদনয়া ফিরল। বড়দিন এসে পড়েছে, অথচ তার কোন কিছুই যোগাড় নেই। সরকারী টাকা এবং নিজের সঞ্চিত যা কিছু তাই মিলিয়ে একশ' চল্লিশ রুবল্ দিয়ে গ্রীগরী ঘোড়া কিনল একটা। কিনবার সময় ছাশ্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে গেছল। ঘোড়াটা মোটের উপর চলনসই; খুঁৎ যা ছিল তা লক্ষ্যে পড়ে না।

—এর থেকে সস্তায় আর কি হবে? খুঁৎ যা আছে না, ওসব ওদের নজরে আস্‌বে না। অত খুঁজে দেখলে তো হয়েছিল!

গ্রীগরী ঘোড়াটার দৌড় পরীক্ষা করবার জন্য খালি পিঠে চড়েই ইয়াগোদ্‌নয়া ফিরল।

বড়দিনের হপ্তাখানেক আগে একদিন পান্তেলিমন ইয়াগোদনয়ায় উপস্থিত হ'ল। গাড়ীটা বাইরে রেখেই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাড়িতে লাগা তুষার-কণা ঝেড়ে চাকরদের বাসার দিকে গেল। জানালা দিয়ে বাবাকে আস্‌তে দেখে অবাক হয়ে গ্রীগরী বলল—

[illegible]; আকসিনিয়া জানালার কাছে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে ঢেকেঢুকে রাখলে। পান্তেলিমন ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা দমকা শিরশিরে হাওয়া ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। মাথা থেকে ত্রিভুজাকৃতি টুপীটা খুলে ইকনের সামনে ক্রশ্‌ করে, বৃদ্ধ ঘরের চতুর্দিকে চাইলে একবার; তারপর পুত্রের দিকে চেয়ে বল্লে—ভাল আছিস!

—হাঁ! বেঞ্চি থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে গ্রীগরী বলল।

পান্তেলিমন পুত্রের দিকে তার হিমশীতল হাতখানা বাড়িয়ে দিল। দুজনেই বসল বেঞ্চিতে। ভুল করেও বৃদ্ধ আকসিনিয়ার পানে চাইলে না একবার।

—পল্টনের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিস?—বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

—নিশ্চয়!

পান্তেলিমন নীরবে পুত্রের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

—জামা কাপড় খুলে ফেলো বাবা! স্তামোভার চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ফেলব'খন! নখ দিয়ে জামার শুকনো কাদার ছিটা খুঁটতে খুঁটতে বৃদ্ধ বললে: আমি তোর জন্ত সব নিয়ে এসেছি। দুটো কোট, জিন একটা, পাজামা গোটাকয়েক ··গাড়ীতেই সব আছে।

গ্রীগরী বাইরে গিয়ে গাড়ী থেকে পুঁটুলি দুটি নিয়ে এল। সে ঘরে ফিরলে বৃদ্ধ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কখন তোরা যাচ্ছিস?

—বড়দিনের পরদিন! তুমি কি এখুনি যাবে নাকি?

—হাঁ একটু সকাল করেই বাড়ী ফিরতে হবে।

পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে আকসিনিয়ার দিকে না চেয়েই বৃদ্ধ দরজার কাছে গেল। খিল খুলতে গিয়ে সহসা দোলনার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললে—তোর মা তোকে তার আশীর্বাদ জানিয়েছে। পায়ের বেদনায় সে

পাশাপাশি। একটু থেমে আবার বলল—আমি তোর সঙ্গে [illegible] পর্যন্ত যাব। তৈরী হয়ে থাকিস। এসে যেন বিলম্ব করতে না হয়।

হাতে পশমী দস্তানা দুটো ভরে বৃদ্ধ বেরিয়ে পড়ল। স্বেচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যের অপমানে জর্জরিত আকসিনিয়া কোন কথাই বললে না। বাবার পেছনে যেতে যেতে গ্রীগরী আড়চোখে আকসিনিয়াকে দেখে গেল একবার।

বড়দিনে গ্রীগরী বৃদ্ধ লিস্তনিতস্‌কিকে নিয়ে একবার ভেশেনস্‌কায়ায় গেল। লিস্তনিতস্‌কি উপাসনায় যোগদান করে তাঁর এক স্থানীয় জমিদার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে প্রাতরাশ খেয়ে গ্রীগরীকে স্লেগা প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। গ্রীগরী তখনও তার ঝোলটুকু শেষ করতে পারে নি। তবু তখুনি টেবিল ছেড়ে উঠে ঘোড়াদুটো জুড়তে হ'ল।

তুষারকণা বায়ুভরে চারিদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে। রজত-শুভ্র ফেনার মত লঘু হিম-কণা হিস্‌ হিস্‌ শব্দে প্রাঙ্গণে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেড়ার ওধারে গাছের মাথায় আলতো তুষারের অবগুণ্ঠন। বায়ুতাড়িত হিম-কণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বার বেলা সূর্য্যকিরণে প্রতিবিম্বিত হয়ে অপূর্ব বর্ণরাগ সৃষ্টি করেছে। চিমনীর পাশে ঘরের চালে একঝাঁক দাঁড়কাক। পদশব্দে চমকিত হয়ে কা-কা রবে বৃত্তাকারে চালের ওপর দিয়ে উড়ে তারা পূর্বাভিমুখে চলে গেল। অরুণ-আলোকে তাদের দেহ-রেখা প্রভাতী আকাশের বুকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি-পথে রইল।

সিঁড়িতে একটি ঝিকে দেখে গ্রীগরী ডেকে বলল—কর্তাকে বল সব প্রস্তুত!

ফার কোটে আধখানা মুখ ঢেকে লিস্তনিতস্‌কি স্লেগায় বসলেন্‌। পা দুটো ঢেকে গ্রীগরী তার কুটকুটে ভেড়ার ছালটা জড়িয়ে নিল।

বর্ষা ঘুরেকের মধ্যেই তারা ইয়াগোদনয়ায় পৌছাল। লিস্তানিত্‌স্‌কি পথে গ্রীগরীর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেননি; একবার শুধু সিগ্রেট ধরাবার জন্য গ্রীগরীর পিঠে টোকা দিয়ে তাকে গাড়ী থামাতে ইঙ্গিত করেছিলেন। আর একবার পাহাড় থেকে নাম্‌বার সময়ে জিজ্ঞেস্‌ করেছিলেন—কালকেই?

শীতে গ্রীগরীর দাঁতে দাঁত লেগে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পাশ ফিরে কোনমতে সংক্ষেপে সে জবাব দিল—হাঁ।

—টাকা-পয়সা সব পেয়েছ?

—হাঁ!

—স্ত্রীর জন্য কোন কিছু ভেবো না; কোন চিন্তা নেই! বাপ পিতামহের নাম রাখবার চেষ্টা কোরো। তোমার পিতামহ একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিল। ১৮৮৩ সালে সম্রাটের সৈন্য পরিদর্শনের সময়ে তোমার বাবা দৌড়ে জিতে ছিল—তাই না?

—হাঁ, বাবা পুরস্কার পেয়েছিল বটে!

একটু পরেই বৃদ্ধ আবার ফার কোটে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলেন।

বাড়ী পৌছে ছাশ্‌কার হাতে ঘোড়াটা দিয়ে গ্রীগরী নিজের ঘরে গেল।

—তোমার বাবা এসেছে গ্রীগরী! পিছু ডেকে ছাশ্‌কা জানাল।

ঘরে ঢুকেই গ্রীগরী ভোজনরত পান্তেলিমনকে দেখতে গেল। তার মুখের দিকে চেয়েই ভাবলে: নিশ্চয় মদ খেয়েছে।

—এতক্ষণে এসেছ সৈনিক! পান্তেলিমন সোৎসাহে বলল।

—আমি একেবারে জমে গেছি! গ্রীগরী উত্তর দিলে। তারপর আকসিনিয়ার দিকে ফিরেই বল্লে: হুডটা খুলে দাও তো, আমার আঙুল টাঙুল সব অসাড় হয়ে গেছে!

এবারে পাভেলিসন আকসিনিয়ার 'পর কিছুটা প্রসন্ন হয়েছে। সে নিজেই যেন ঘরের কর্তা এই ভাবে বললে—আমাকে আরও কিছু রুটি দাও তো।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে, বৃদ্ধ আরাম করে ধূমপান করবার জন্য প্রাঙ্গণে গেল। দোলনার পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা সেটাকে দু-একটা দোলা দিয়ে জিজ্ঞেস করল—কজাক ?

—না মেয়ে! গ্রীগরীর হয়ে উত্তরটা আকসিনিয়াই দিলে। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে বিরক্তির ভাব দেখে সে অমনিই আবার বললে: এত সুন্দর হয়েছে, ঠিক গ্রীশ্‌কার মত!

মেয়েটির মুখের দিকে কয়েক মিনিট একদৃষ্টে চেয়ে পাভেলিসন বলে উঠল: ও আমাদের বংশেরই! বৃদ্ধের এই স্বীকারোক্তির মধ্যে খানিকটা গর্বের ছোঁয়াচ ছিল কি না বলা যায় না।

—কি করে এলে বাবা! গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল।

—পিয়োতরের ঘোড়াটা আর মাদীটাকে নিয়ে এসেছি।

—তোমাকে ও থেকে শুধু একটা নিলেই চলবে; মানকোভা যাবার বেলা আমারটা জুড়ে নোব'খন।

—না না ওর ঘাড়ে অত বোঝা চাপিয়ে কাজ নেই। তোরটাও ভালোই।

একই চিন্তায় উভয়ে উদ্বিগ্ন; কাজেই দুজনেই বিভিন্ন কথার অবতারণা করে বিস্মৃত হবার চেষ্টা করতে লাগল। আকসিনিয়া এদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে বিছানার পর চুপ করে বসে রইল। প্রসবের পর আজকাল তার চেহারাটা বেশ সেরে উঠেছে। হাঁ, দেখলেই বোঝা যায়।

শুতে অনেক রাত হ'ল। গ্রীগরীকে বুকে জড়িয়ে আকসিনিয়া চোখের জলে শার্ট ভিজিয়ে দিলে।

—তুমি চলে গেলে আমি বাঁচবো না! কি জোরে তোমায় ছেড়ে থাকবো? এই দীর্ঘ রাত্রি···মেয়েটা জেগে উঠবে! একবার ভেবে দেখো গ্রীশ্‌কা, চার বছর!

—লোকে বলে আগে নাকি একুশ বছর ছিল।

—আগের কথা দিয়ে আমার কি হবে? চুলোয় যাক্ তোমার পল্টনের সার্ভিস!

—ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসব!

—ছুটি নিয়ে আসবে! নাক ঝেড়ে অনুযোগের সুরে বললে আকসিনিয়া: তার আগে দনের অনেক জলই বয়ে যাবে!

—অত ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কোরো না আকসিনিয়া; সেই শরৎকালের বৃষ্টির মত একবার সুরু হল তো আর বিরাম নেই!

—তোমায় আমি গায়ের চামড়া করে রাখবো! আকসিনিয়া দৃঢ়তর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ভোর হবার কিছু আগে গ্রীগরী ঘুমিয়ে পড়ল। আকসিনিয়া উঠে মেয়েটাকে খাইয়ে আবার শুলো। কনুইয়ে ভর করে একদৃষ্টে গ্রীশকার পানে চেয়ে সে আসন্ন দীর্ঘবিদায়ের জন্ম প্রস্তুত হ'তে লাগল। মনে পড়ল সেই রাতের কথা যেদিন সে গ্রীগরীকে কুবানে যাবার জন্ম কত না মিনতি করেছিল। আজও তেমনি জ্যোৎস্নাপরশ মুগ্ধা ধরণী সোহাগভরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আজও তারা তেমনি ভাবেই শুয়ে আছে। সেই গ্রীশকাই আজও তার পাশে, তবু যেন কোথায় ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। দু'জনের পেছনেই অতীত দিনের কত বিচিত্র অনুভূতি পড়ে আছে! মোড় ফিরে বিড়বিড় করে ওল্‌শানস্কি গ্রা সম্বন্ধে কি যেন বলে গ্রীগরী আবার চুপ করল। আকসিনিয়া চো বুজবার চেষ্টা করল; কিন্তু চিন্তায় তার সমস্ত ঘুম উড়ে গেল সারারাত বিছানায় শুয়ে সে গ্রীগরীর কথাটার অর্থ খুঁজতে লাগল

জানালা দিয়ে উষার ক্ষীণ আলোক ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই পান্তেলিমন ঘুম থেকে উঠল।

—গ্রীগরী ওঠ!

সূর্য্য ওঠবার আগেই প্রাতরাশ শেষ করে পান্তেলিমন ঘোড়া জুড়তে গেল। আকসিনিয়ার ব্যাকুল চুম্বন ও আলিঙ্গন ছাড়িয়ে গ্রীগরী ছাশ্‌কা ও অন্যান্য সবারই কাছে বিদায় নিতে গেল। মেয়েটিকে গরম জামা কাপড়ে জড়িয়ে কোলে নিয়ে আকসিনিয়া শেষবার বিদায় নিতে এল। গ্রীগরী আস্তে মেয়েটির কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে গাড়ীর কাছে গেল।

—গাড়ীতে আয়! বৃদ্ধ পান্তেলিমন ডেকে বলল।

—না আমি ঘোড়ায় চড়েই যাবো!

ধীর সংযতভাবে জিন লাগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গ্রীগরী বল্গা তুলে ধরল। আকসিনিয়া বার বার অনুনয় করে বলল: একটু দাঁড়াও গ্রীশকা আর একটা কথা আছে। কিন্তু কথা মনে এলো না। ভ্রূকুঞ্চিত করে আকসিনিয়া ব্যাকুল আগ্রহে কত কি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

—আচ্ছা আসি তাহোলে! মেয়েটাকে দেখো। দাঁড়াবার সময় নেই, দেখছ না বাবা কতখানি এগিয়ে গেছে।

—গ্রীশকা থামো, গ্রীশকা! বাঁ হাত দিয়ে আকসিনিয়া হিমশীতল লৌহপাদানিটা টেনে ধরল। ডান হাতে মেয়েটি বুকে চাপা কাজেই চোখের ধারা মুছবার জন্য একখানি হাতও খালি ছিল না। অপলক দৃষ্টিতে সে গ্রীশকার পানে চেয়ে রইল। ইতিমধ্যে বেঞ্জামিন সিঁড়িতে এসে ডেকে বলল—কর্তা ডাকছেন তোমাকে গ্রীগরী!

গ্রীগরী একটা গালাগালি দিয়ে চাবুক তুলে ঘুরাতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে ছুটে বেরুল; আকসিনিয়া মেয়ে কোলে করে বরফের চাকায় হোঁচট খেতে খেতে কিছু দূরে পর্যন্ত তার পেছন পেছন ছুটল।

পাহাড়ের মাথায় বাবাকে ধরে গ্রীগরী পিছন ফিরে চাইল। আকসিনিয়া তখনও মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

গ্রীগরী বাবার স্লেগার পাশাপাশি চলতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে বৃদ্ধ ফিরে জিজ্ঞাসা করল—তাহ'লে স্ত্রী নিয়ে ঘর ক'রবার ইচ্ছা তোর নেই?

—আবার সেই পুরানো কথা! আমি তো বলেছি···

—কিছুতেই তুই···

—না!

—জানিস্ সে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল!

—শুনেছি। গ্রামের একজন লোক বল্লে।

—ধর্ম্মের দিকে চেয়ে···

—বার বার একথা বলে কি লাভ বাবা? যা একবার গাড়ী থেকে পড়ে যায় আর তা পাওয়া যায় না।

—আমার কাছে ওসব বাজে কথা বলবি না। আমি যা বলছি তা তোর ভালোর জন্যই। পান্তেলিমন একটু চটেই বল্লে।

—নিজেই তা দেখছো একটি সন্তান হয়েছে; কাজেই ও কথা বার বার বলে লাভ? এখন আর তো তাকে আমার'প··· চাপিয়ে দিতে পারো না?

—দেখিস আবার পরের মেয়ে পুষিস না যেন।

গ্রীগরীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। এতক্ষণে বাবা তার ক্ষতস্থানের সন্ধান পেয়েছে। মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে এ-রকম একটা সংশয় তার মন তোলপাড় করে তুলেছে; কিন্তু মুখ ফুটে আকসিনিয়ার কাছে বলতে পারে নি। রাত্রে আকসিনিয়া ঘুমোলে সে

 মুখখানির

দিকে চেয়ে নিজেকে খুঁজেছে। কিন্তু প্রতিবারেই অনিশ্চয়তা নিয়ে বিছানায় ফিরতে হয়েছে। স্তেপানের রঙও তারই মত লালচে, ময়লাটে! কি কোরে বুঝবে যে তারই রক্ত এই ক্ষুদ্র শিশুর ধমনীতে প্রবাহিত? মাঝে মাঝে ভাবত মেয়েটি তারই মত; আবার মনে হত, না স্তেপানের মতই দেখায়। যন্ত্রনায় তার মন ছটফট করে উঠত। মেয়েটির পর কোন মায়াই ছিল না; বরং প্রসবের কথা মনে হলে রাগই হ'ত। একদিন আকসিনিয়া ঘরে ছিল না; মেয়েটির ভিজা তোয়ালেখানা গ্রীগরীকেই বদলাতে হয়। বদলাতে গিয়ে তার মনের মধ্যে চিন চিন করে উঠল। পরে চুপি চুপি দোলনাটির'পর ঝুঁকে সে মেয়েটির পায়ের বুড়ো আঙুলটি মুখের মধ্যে নিয়ে চুষে দিয়েছিল।

বাবা আজ নির্মমভাবে সেই গোপন ক্ষতে আঘাত করেছে।

কিন্তু গ্রীগরী তবু বিমূঢ়ভাবে জিনের পর হাত রেখে বললে—যারই হোক ওকে আমি ফেলে দিতে পারবো না।

পান্তেলিমন পুত্রের দিকে না চেয়ে মাথার ওপর দিকে চাবুকটা ঘুরিয়ে বললে—নাতালিয়ার আর সে চেহারা নেই। পক্ষাঘাত রোগীর মত সে মাথা বেঁকিয়ে চলে! কেমন একটা অবসন্ন ভাব!

—এখন কেমন আছে? ঘোড়ার কেশরের মধ্য থেকে একটা উকুন খুঁটে বার করতে করতে গ্রীগরী জিজ্ঞাসা করল।

—কোনমতে বেঁচে গেছে এ যাত্রা! সাত মাস শয্যাশায়ী ছিল। ত্রইৎস রবিবারে তো যায় যায়! ফাদার পাংক্রাটি এসে শেষকৃত্য করে গেলেন! কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেরে উঠল; এখন তো হাঁটে চলে। বুকের মধ্যে কাস্তেটা বসিয়ে দিয়েছিল। হাত কেঁপে গেছল তাই রক্ষা!

—পাহাড়ের'পর দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি চলো। গ্রীগরী বললে।

তারপর ঘোড়াটাকে তাড়া দিতেই মুহূর্তের মধ্যে সে বৃদ্ধকে ছাড়িয়ে গেল। ঘোড়ার খুর থেকে ছিটে খানিক বরফ এসে স্লেজখানার গায়ে লাগল।

—নাতালিয়াকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি! পান্তেলিমন অশ্বের গতি দ্রুততর করে উঁচু গলায় বলল: মেয়েটা তার বাপের বাড়ী থাকতে চায় না। সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হতেই আমি বললাম তাকে।

গ্রীগরী উত্তর করল না। প্রথম গ্রামে না পৌঁছান অবধি আর কোন কথাই হ'ল না। বৃদ্ধও এ সম্বন্ধে আর কোন কিছু উল্লেখ করল না।

সেইদিন পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করে পরদিন সন্ধ্যার মুখে তারা মান্‌কোভায় পৌঁছুলো। ভেশেনস্‌কায়ার কসাকদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানেই সে রাত কাটাতে হ'ল!

পরদিন প্রভাতে জিলার আতামান ভেশেনস্‌কায়ার সৈন্যদলকে স্বাস্থ্য-পরীক্ষক কমিশনের কাছে উপস্থিত করল। গ্রীগরী গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেদের সারিতেই দাঁড়াল। প্রভাতে একটা তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে মিচ্‌কা কোরশুনফ্‌ গ্রীগরীর পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

সবাই একে একে পালাক্রমে পরীক্ষাগারে ঢুকে জামা কাপড় খুলে ফেলে দিতে লাগল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমর বিভাগের কেরাণীরা ঘোরাঘুরি করছে। প্রাদেশিক আতামানের এডজুটান্ট মচ্‌ মচ্‌ করে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ডাক্তারের নির্দেশ এবং দু-একটি মন্তব্য মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল। একজন কেরাণী বেরিয়ে এসে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গ্রীগরী এবং আর একজনকে ডেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেল। গ্রীগরী ভেতরে গিয়ে জামা-কাপড় খুলতেই শীতে তাঁর দেহখানা কন্‌কন্‌ করে উঠল। তার ওক গাছের মত রুক্ষ, লোমশ

পদক্ষয় লক্ষ্য করে নিজেই সে সংকোচ বোধ করতে লাগল। ডাক্তারী পরীক্ষার নমুনা দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ রাগ হ'ল। একজন পক্কেশ ডাক্তার বুকে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে তাকে পরীক্ষা করলেন। আর একজন চোখ টেনে জিভ্ বার করে দেখল। পেছনে একজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।

—ওজন দেখো। অফিসার আদেশ করলেন।

শ্রীগরীকে ঠিকঠাক করে একটা মঞ্চের 'পর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল।

—তেরো···সাড়ে তিন।

—কত? খুব বেশী লম্বাও তো নয়! বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে পক্কেশ ডাক্তারটি জিজ্ঞাসা করলেন।

—আশ্চর্য! তরুণ ডাক্তারটি গলাখাকাড় দিয়ে বলল।

—কত হল? টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট অফিসারটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—তের ষ্টোন সাড়ে তিন পাউণ্ড! পক্কেশ ডাক্তারটি উত্তর করলেন।

—লেফগার্ড দলে দিলে কেমন হয়? পার্শ্বে উপবিষ্ট অফিসারটির দিকে ঝুঁকে জিলার সামরিক কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন।

—দেখছেন না দেখতে কেমন ডাকাতের মত···

—এই ফের তো! পিঠে দাগ কিসের? কর্ণেলের পোষাকপরা অফিসারটি জিজ্ঞাসা করল।

নিজের হৃদ্‌কম্পন গোপন করবার জন্ত কর্ণেলের দিকে ফিরে শ্রীগরী উত্তর করল—বসন্তকালে বরফে আটকে অমন দাগ হয়ে গেছে।

পরীক্ষা সমাপ্ত হতে না হতেই টেবিলের চারিপাশে উপবিষ্ট

অফিসারগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে গ্রীগরীকে সাধারণ রেজিমেন্টেই দেওয়া হবে।

—বাবণ রেজিমেন্ট যেলেখক! শুনলে? তাকে বলে দেওয়া হল।

বেরিয়ে যাবার মুখে গ্রীগরী শুনলে একজন বলছে—অসম্ভব! তবে দেখুন না অমন একখানা মুখ যদি সম্রাট দেখেন, কি হবে বলুন তো! ওর চোখ দুটোই তো……

—ছেলেটা নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর। প্রাচ্য দেশের কেউ হবে নিশ্চয়!

—দেখছেন না কেমন ময়লা! ঐ দাগ কটা…

কোটের বোতাম লাগিয়ে দুপ্‌দাপ্‌ করে গ্রীগরী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। স্কোয়ারের মধ্যে ঘোড়াগুলো জড়ো করা হচ্ছে; কবোষ্ণ পবন পচা খড়ের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে। রাস্তা কোথাও কোথাও জলশূন্য। মুরগীগুলি পাখায় ঝাপট মেরে রাস্তা দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাঁসগুলি ডোবার মধ্যে পাখা দিয়ে জল সিঞ্চন করছে।

পরদিন ঘোড়া পরীক্ষা করা হবে। গীর্জার দেয়ালের গায়ে ঘোড়াগুলোকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশু-চিকিৎসক সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়াগুলো পর্যবেক্ষণ করে গেলেন। স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে একটা জায়গায় পরীক্ষার ফলাফল খাতায় লেখা হচ্ছে; ভেশেনস্‌কায়ার আতামান দাঁড়িপাল্লার কাছ থেকে ছুটে সেখানে এলেন। একজন তরুণ কর্ণেলের সঙ্গে গভীর আলোচনা-মগ্ন সামরিক কমিশনার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

নিজের পালা আসতেই গ্রীগরী ঘোড়াটাকে কাটার কাছে নিয়ে গেল। পশু-চিকিৎসক ও তার সহকারী ডাক্তারটি ঘোড়াটার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে ওজন নিলেন। দাঁড়িপাল্লা থেকে নামবার পূর্বেই ডাক্তার ঘোড়াটার দাঁত বার করে দেখলেন; তারপর নীচু হয়ে গলাটা দেখে বুকের পেশীগুলি পরীক্ষা করলেন; পরে মাকড়সার

মত সন্তর্পণে সুড়সুড় করে জন্তুটির পেটের 'পর দিয়ে হাত নিয়ে পায়ের সংযোগটা পরীক্ষা করলেন। গ্রীগরী উদগ্রীবভাবে ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার ঘোড়াটাকে প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। ছাশ্‌কার অনুমান শেষ পর্যন্ত টিকল না। ঘোড়াটির যে গোপন দোষের কথা ছাশ্‌কা বলেছিল, অভিজ্ঞ সার্জনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দোষ ধরা পড়ে গেল। গ্রীগরী তখন বাবার সঙ্গে আলোচনা করে আধঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পিয়োত্তরের ঘোড়াটাকে ডাক্তারের সামনে এনে দাঁড় করাল। সার্জন এটিকে একরকম পরীক্ষা না করেই পাশ করে দিলেন।

গ্রীগরী ঘোড়াটাকে কিছু দূরে নিয়ে একটা শুকনো জায়গায় স্যাডল্ ক্লথখানা পাতল। বাবা ঘোড়াটি ধরে রইল। দীর্ঘকায় পক্ককেশ আস্ত্রাখানী পশমী টুপী পরা একজন জেনারেল কয়েকজন, অফিসারের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

—ঐ প্রাদেশিক আতামান! পান্তেলিমন ফিসুফিস্ করে বললে।

গ্রীগরী অপরিচিত অফিসার ও সরকারী কর্মচারীদের পানে উৎসুকনয়নে চেয়ে রইল। একজন এডজুটাণ্ট বিরক্তভাবে তাকে লক্ষ্য করছিল; কিন্তু গ্রীগরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নামাল। বৃদ্ধ এক ক্যাপ্টেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঠোঁট কামড়ে ত্রস্তপদে চলে গেল। স্যাডল ক্লথখানার 'পর গ্রীগরী তার নীল ফিতা দিয়ে সাজান জিনটা রাখল। সঙ্গে জিনের ব্যাগ কটাও ছিল। জিনিষপত্রের মধ্যে দুটো আর্মিকোট, দুটো পাজামা, একটা আঙরাখা, দু'জোড়া বুট, দেড়পাউণ্ড বিস্কুট, একটিন মাংস আর কিছু অন্যান্য খাবার। খোলা ব্যাগগুলোর মধ্যে জোড়াচারেক নাল, ময়লা একখানা কম্বলের টুকরোয় জড়ান কিছু পেরেক, সৈনিকের গৃহস্থালীর কিছু জিনিষপত্র, একজোড়া সূচ ও সূতো আর তোয়ালে কয়েকখানা। নিজের জিনিষপত্তর

একবার দেখে নিয়ে গ্রীগরী খলের বড়িতে লাগা মাটী খুঁটে খুঁটে ফেলে দিতে লাগল। স্কোয়ারের ওপাশ থেকে আর্মি কমিশন নয়া কজাক সৈন্যদের লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন। আতামান ও অফিসারগণ ভাল করে সৈন্যদের সজ্জা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। এমন কি কজাকদের ওভারকোটে হাত দিয়ে ব্যাগগুলি খুলে তাদের গৃহস্থালীর জিনিষপত্রগুলি ওলট্‌পালট ক'রে এবং হাতে ওজন ক'রে তাদের বিস্কুটের টিনগুলি পর্যন্ত দেখা হ'ল। কমিশনার নিকটে আস্‌তেই পাশের কজাকদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। গ্রীগরী উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ পান্তেলিমন পেছন থেকে কেশে উঠল। বাতাসে ঘোড়ার প্রস্রাব ও গলা বরফের গন্ধ। সূর্য্যেরও যেন কেমন একটা মরা মরা ভাব, মনে হয় কোন পানশালা থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে।

অফিসারদল গ্রীগরীর পাশের লোকটির কাছে এসে থাম্‌ল। তার পর একে একে তারই সাম্‌নে দাঁড়াল এসে।

—তোমার উপাধি কি? খৃষ্টান নাম?

—মেলেখফ, গ্রীগরী।

কমিশনার তার কোটটা ধরে শুঁকে দেখলেন। আর একজন অফিসার পাজামার ছিট্‌টা পরীক্ষা করল; তৃতীয় জন ব্যাগগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। কমিশনার আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে পেরেকগুলি গুনে বললেন—একি, তেইশটা কেন?

—না স্যার, চব্বিশটা!

—তার মানে, আমার কি চোখ নেই নাকি?

গ্রীগরী তাড়াতাড়ি কম্বলের টুক্‌রাখানার একটা ভাঁজ খুলে চতুর্বিংশ পেরেকটি দেখাল। দেখাতে গিয়ে গ্রীগরীর ময়লা লোমশ হাতখানা অফিসারের পরিচ্ছন্ন ফর্সা হাতে লেগে গেল; অমনিই হাতখানা টেনে

তিনি পাজামায় মুছে ফেললেন। পরক্ষণেই দস্তানাপরা সারা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গ্রীগরী ক্রূরভাবে একটু হাসলে শুধু। চোখাচোখি হতেই কমিশারটি একটু লজ্জা পেয়ে জোর গলায় বললে: এ কি, এসব কি কজাক? তোমার বাক্স বাঁধবার দড়িগুলি গোছান নেই কেন? এর মানে কি? তুমি কি কজাক, না কিষাণ? বাবা কোথায় তোমার?

পান্তেলিমন ঘোড়ার বল্‌গা টেনে খুঁড়িয়ে সাম্‌নে এগিয়ে এলো।

—তুমি কি কজাকদের নিয়ম জানো না নাকি? কমিশার পান্তেলিমনের 'পরই ঝাল ঝাড়তে আরম্ভ করলেন। প্রাদেশিক আতামান এলে কমিশারের ক্রোধ থামল। আতামান পরের কজাকটির দিকে চলে গেলেন; গ্রীগরীর রেজিমেণ্টের অফিসার ধীর শান্তভাবে মায় গৃহস্থালীর জিনিষপত্রসহ গ্রীগরীর সব খুঁটিনাটি দেখে পাশ করে দিলেন।

কয়েকদিন পরেই কজাক ও ঘোড়া বোঝাই একটা লাল গাড়ীর বহর ভরোনিশের দিকে যাত্রা করল। জানালা দিয়ে অপরিচিত সমতল দিকচক্রের ছবি দেখা দিতে আরম্ভ করল। দূরদিগন্তে শ্যামল বনরেখা চক্রাকারে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। পেছনের ঘোড়াগুলি খড় চিবুচ্ছে আর পায়ের তলায় পিছল মাটিতে খট্‌খট্‌ শব্দ করছে। ঘোড়া ও বসন্তকালীন বরফের গন্ধে গাড়ীগুলি ভরপুর। সবুজ বৈচিত্র্যহীন বনরেখা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে ম্লান সন্ধ্যাতারার মত দিগন্তের বুকে লেগে আছে।

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে নাতালিয়া আবার শ্বশুর বাড়ী ফিরে এল। পান্তেলিমন বুনো লতা দিয়ে ভাঙ্গা বেড়াটা সারছিল। ঘরের চাল থেকে সূর্য্যের উষ্ণ সোহাগে রজতশুভ্র হিমকণা টপ টপ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফের বোঝা গলে নেমে

যাচ্ছে। স্থানে স্থানে তুষারমুক্ত ধরণীর বুকে কচি ঘাসের পাতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।

নাতালিয়া পেছন থেকে শ্বশুরের কাছে গিয়ে আনত মস্তকে বল্ল—ভাল আছেন বাবা?—

কে? নাতাশ্‌কা? এস মা, এস! পান্তেলিমন সোৎসাহে পুত্রবধূকে অভ্যর্থনা করল। হাত থেকে আনন্দের আতিশয্যে লতাগুলি পড়ে গেল।—এতদিন দেখা করতে আসো নি কেন? চল, তোমার মা তোমাকে দেখলে ভারী খুসী হবে!

—বাবা আমি এসেছি···যদি তাড়িয়ে না দেন তবে আপনাদের সঙ্গেই থাক্‌বো বলে এসেছি।

—কি বল্লে, কি বল্লে মা! তুমি কি আমাদের পর? চল দেখবে এসো, গ্রীগরী তার পত্রে তোমার কথা লিখেছে। তোমার কথা জেনে তাকে লিখতে বলেছে!

উভয়েই একসঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল। ইলিনীচনা নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। রুমাল দিয়ে নাক মুছে বৃদ্ধা ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে—একটি সন্তান হলেই আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না! বস, তোমাকে আমি দুটো ডিমের বড়া এনে দিচ্ছি, কেমন!

সলজ্জ হাসি মুখে দৌড়ে এসেই দুন্যা বৌদিকে জড়িয়ে ধরল: আরে বেহায়া, আমাদের একেবারেই ভুলে গেলে! ভৎ'সনা ক'রে বল্লে দুন্যা।

সবাই মিলে তখন নাতালিয়াকে নিয়ে বেশ একচোট মাতামাতি করল। ইলিনীচনা গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে পুত্রবধূর পানে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবল: কিই বা ছিল, আর কি হয়েছে!

—আর যাবে না! আর যাবে না তো! আর যাবে না তো! নাতালিয়ার হাত চেপে ধরে দুন্যা অভিমানভরে বল্লে।

—কে বলতে পারে বলো?

—না, যাবে আর কোথায়। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাক্‌বে। টেবিলের পর কতকগুলি ডিমের বড়া রেখে ইলিনীচনা বল্লে।

যাবো কি যাবো না—এই সংশয় কাটিয়ে মনস্থির করতে নাতালিয়ার বহুদিন লেগেছে। অবশেষে ঠিক করলো, শ্বশুরের কাছে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মিরণ প্রথম আপত্তি করছিল। নাতালিয়া বাবার কাছে নিজের অভিপ্রায় জানালে সে রেগে-মেগে অনেক কথাই তাকে শোনাল। চটে লাভ নেই দেখে অবশেষে নানা রকম বুঝ দিয়ে কন্যাকে বিরত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নাতালিয়ার পক্ষে আত্মীয়স্বজনদের মুখ দেখান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সে বুঝল যে বাপের সংসারে সে পর হয়ে গেছে। গ্রীগরীকে সৈন্যদলে পাঠিয়ে দিয়ে এসে পান্তেলিমন কয়েক বার পুত্রবধূকে আনবার চেষ্টা করছিল। ছেলের সঙ্গে নাতালিয়ার আবার মিল করিয়ে দেবার জন্য বৃদ্ধ বদ্ধপরিকর।

মার্চ মাসের সেইদিন থেকে নাতালিয়া মেলেখফদের বাড়ীতেই থাক্‌ল। পিয়োতর তাকে ভাইয়ের মত যত্ন আদর করত। দারিয়া মাঝে মাঝে তার বিষদাঁত বার করলেও, দুন্যার প্রীতি ও শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ-যত্নে নাতালিয়া সব ভুলতে পেরেছিল।

নাতালিয়া বাড়ী আসবার পর দিনই পান্তেলিমন দুন্যাকে গ্রীগরীর কাছে একখানা পত্র লিখতে বল্লে :

পুত্র গ্রীগরী পান্তেলিয়োভিচ,

আমাদের আশীর্বাদ জেনো। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। আমার এবং তোমার মা, ভাসিলিশা ইলিনীচনার আন্তরিক আশীর্বাদ নিও। তোমার দাদা পিয়োতর পান্তেলিয়েভিচ ও তার স্ত্রী দারিয়া তোমাকে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তোমার মঙ্গল কামনা করছে। তোমার বোন দুন্যা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলেও তোমার মঙ্গল এবং উন্নতি কামনা করে।

আমরা তোমার গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত পত্র পেয়েছি এবং পত্রের জন্ত তোমাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তুমি লিখেছ যে ঘোড়াটা চাঁটি মারতে চায়। ওটার পায়ে কিছু চর্বি মাখিয়ে দিও। কি ভাবে মাখাতে হয় তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। যে পর্যন্ত তার পা সেরে না যায় পায়ে নূতন নাল পরাবে না। তোমার স্ত্রী নাতালিয়া মিরণোভনা বর্তমানে আমাদের সঙ্গেই আছে। সে ভাল আছে। তোমার মা তোমার জন্ত একজোড়া মোজা, কিছু শুকনো শেরী ও সামান্ত কিছু ফল পাঠাচ্ছে। আমরা সবাই ভাল আছি; কিন্তু দারিয়ার সন্তানটি মারা গেছে। কয়েকদিন আগে আমি ও পিয়োত্তর ঘরের চালে ছাউনি দিয়েছি। সে তোমাকে ঘোড়াটার দিকে নজর রাখতে বলেছে। গরু কটার রাচ্চা হয়েছে; বৃদ্ধা ঘুড়ীটারও বাচ্চা হবে বলে আশা করি। আমাদের জিলার সদর থেকে একটা ঘোড় এনে পাল দেবার ব্যবস্থা করেছি। তোমার সার্ভিসের সংবাদে এবং তোমার উর্ধতন অফিসারগণ যে তোমার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট এই সংবাদে বিশেষ প্রীতি লাভ করেছি। যথাশক্তি কাজ করবে। জারের সেবা কখনও বৃথা হয় না। নাতালিয়া এখন আমাদের সঙ্গেই থাকতে চায়। কথাটা তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখো। লেন্তের কয়েক দিন আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটা বুনোজন্তু পালের কয়েকটা ভেড়া নিয়ে গেছে। আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক। ভগবান তোমার সহায় হউন। কখনও নিজের স্ত্রীর কথা ভুলো না—তোমার প্রতি এই আমার একমাত্র নির্দেশ। সে সাধ্বী এবং আইনতঃ তোমার সহধর্মিণী। লাঙলের দাগ স্বেচ্ছায় নিজেদ হাতে ভেঙে দিও না। বাবার কথা শুনো।

তোমার বাবা, সিনিয়র সার্জেন্ট

পান্তেলিমন মেলেখফ।

রুশো-অস্ট্রিয়ান সীমান্ত থেকে মাইল তিনেক দূরে রাদজিভিলোভাতে গ্রীগরীদের রেজিমেণ্ট মোতায়েন করা হ'ল। বাড়ীতে চিঠিপত্র প্রায়ই সে লিখতো না। নাতালিয়া তাদের বাড়ীতেই আছে এই সংবাদ জানিয়ে বুড়ো বাবা যে পত্রখানা লিখেছিলো তার জবাবে গ্রীগরী একখানি সংক্ষিপ্ত এবং সতর্ক জবাব লেখে এবং পত্রে তার হ'য়ে নাতালিয়াকে সম্ভাষণ জানাতেও বলেছিল। যেসব পত্র তার কাছ থেকে পাওয়া যেত, তার প্রায় সবগুলিই কেমন উড়োউড়ো অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। পিয়োত্তর বা দুন্যাকে দিয়ে কয়েকবার পত্রগুলি পড়িয়ে পান্তেলিমন অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করতো। ইষ্টারের অব্যবহিত পূর্বেই একখানা পত্র লিখে বৃদ্ধ স্পষ্ট জান্‌তে চাইলো যে গ্রীগরী আর্মি সার্ভিসের পর বাড়ী ফিরে নাতালিয়ার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে চায়, না আকসিনিয়াকে নিয়েই থাকতে চায়। উত্তর গ্রীগরী কিছু বিলম্ব করেই দিল। ত্রইৎসা রবিবারের পর তার একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাওয়া গেল। দুন্যা কথাগুলি সম্পূর্ণ উচ্চারণ না করেই দ্রুত পত্রখানা পড়ে গেল।

সম্ভাষণ ও জিজ্ঞাসা বহুল পত্রের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পান্তেলিমনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'ল। পত্রের শেষের দিকে গ্রীগরী নাতালিয়া সম্পর্কে লিখেছে—

"নাতালিয়ার সঙ্গে ঘর-সংসার করবো কিনা সে কথা তুমি জান্‌তে চেয়েছো। কিন্তু বাবা, যা ছিন্ন হয়ে গেছে তা আর জোড়া লাগতে চায় না। তাছাড়া, আমার একটি সন্তান হয়েছে একথা তুমি জানো। এ অবস্থায় কি ক'রে আমি নাতালিয়ার সঙ্গে মিটমাট করতে পারি বলো! নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানাতে হ'ল যে বর্তমানে কোন কথা দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়। কয়েক দিন পূর্বে সীমান্ত অতিক্রম করবার সময়ে চোরাই মালসহ একজন ইহুদীকে গ্রেফতার করা হয়। আমরা তাকে দেখেছি। তার কাছ থেকে

শুনলাম যে গ্রীগরিই নাকি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে বাধবে। তাদের সম্রাট নাকি সীমান্ত পরিদর্শন ক'রে কোন্ জায়গা থেকে আক্রমণ সুরু ক'রে কোন্ জায়গা প্রথমে অধিকার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যুদ্ধ যদি লেগেই যায় তা'হলে আমি নাও বেঁচে থাকতে পারি। কাজেই আগে থেকে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা মোটেই সম্ভব নয়।"

নাতালিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর কাজকর্ম ক'রে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগল। গ্রীগরীর কাছে কোন পত্রই সে লিখ্‌তো না। কিন্তু গ্রীগরীর পত্রের আশায় পরিবারের মধ্যে তার চাইতে বেশী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় কেউই অপেক্ষা করত না।

সেই পুরনো বাঁধাধরা পথে গ্রামের দৈনন্দিন জীবন গড়িয়ে চলছিল। দিনের বেলা একঘেয়ে কাজে অলক্ষ্যে সময় কেটে যায়। রবিবার দিনে নিজ নিজ গাড়ীতে চড়ে সবাই এসে গীর্জায় সমবেত হয়। পুরুষের আঙরাখা এবং মেয়েদের দীর্ঘ ধূলায়লুটান বিচিত্র স্কার্টের রঙে গীর্জার প্রাঙ্গণ মশগুল হয়ে ওঠে। স্কোয়ারের মধ্যে শূন্য গাড়ী ও ঘোড়ার চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দ। রাস্তা দিয়ে বুলগুর বাসিন্দারা দল বেঁধে চলাফেরা করে। ছেলের দল উট দেখবার লোভে উৎসুক ভাবে তাদের অনুসরণ করে। সর্বত্রই পুরুষের লাল-ফিতে জড়ান টুপী এবং মেয়েদের বিচিত্র বর্ণের স্কার্ট। সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীত নৃত্য এবং একর্ডিয়নের শব্দে পল্লী-পথ কোলাহল-মুখর হয়ে ওঠে। রাত্রি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিস্পন্দ স্তব্ধতা সারা গ্রামটিকে গ্রাস ক'রে ফেলে

নাতালিয়া রবিবার সন্ধ্যায় কোন পড়শীর বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী যেত না। চুপ করে ঘরের কোণে বসে সাগ্রহে শুধু দুন্নার আবোল তাবোল গল্প শুনত।

দেখতে দেখতে দুন্না বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তার সুগঠিত

নারীদেকে এতদিনে কশগয়ের সঙ্কুচিত প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু বয়স অনুপাতে মেয়েটি অকালের আপেলের মত কিছু আগেই পেকে গেছে। ছুন্নার বয়স্কা বান্ধবীরা এ বছর ভুলেই গেছল যে, ওর চাইতে তাদের জোয়ার কিছু আগেই এসেছে। ফলে ছুন্না অনায়াসেই তাদের গোপন বৈঠকে স্থান লাভ করল। ছুন্নার বয়স বছর পনর। দেহের কিশোর-চপলতা তখনও লুকায় নি। কৈশোর ও ফুটন্ত যৌবনের হানা-হানিতে দেহের প্রকাশটা কিছু ঘোলাটে হয়ে গেছে। দৃষ্টির চপলতার মধ্যে চটুলতার বহ্নিশিখা উঁকি-ঝুকি মারছে। সান্ধ্য পাড়া বেড়ান শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে সে বলত—নাতালিয়া একটা গোপন কথা আছে!

—বল!

—কালকে গ্রামের গোলাঘরের পাশে মিশা কোশিভয় সারা বিকেল আমার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে।

—ওকি তোমার মুখ লাল হয়ে উঠল কেন?

—যাঃ! মিথ্যে কথা!

—আয়নায় দেখো না গে! মনে হবে ঠিক যেন একটি আগুনের শিখা লক লক করছে।

ছুন্না হাত দিয়ে মুখ রগড়ে হো হো করে হেসে উঠত।

—বল্লে আমি নাকি টকটকে একটি লাল ফুলের মত। আবার খিল খিল করে হাসি।

—তারপর! সাগ্রহে নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করে। পরের সুখেই আজ তার আনন্দ। না হ'লে নিজের দহন ভুলবে কি ক'রে?

—আমি বল্লাম, মিথ্যে কথা বলো না মিশা! সে শপথ করে বল্লে ··

মাথা চিতিয়ে নাতালিয়া হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়ল। তার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ সহস্র গোধিকার মত পিঠময় ছড়িয়ে পড়লো।

—আর কিছু বলে নি ?

—হাঁ রুমালখানাও চাইলে ! স্মৃতিচিহ্ন ক'রে রাখ্‌বে ব'লে।

—দিলে ?

—ইশ্‌, কেন দেবো ? বল্লাম—যাও না, তোমার ভালবাসার লোকের কাছ থেকে নাও গে' ! জানো বৌদি, আমি তাকে ইয়েরোফিয়েভনার ছেলের বউয়ের সঙ্গে দেখেছি। মেয়েটা ভারী লক্ষীছাড়া। জানো সে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই ঢলাঢলি করে।

—তুমি তাহ'লে আর ওর কাছে যেও না !

—হাঁ আর যাচ্ছি না ! তারপর কি হোলো জানো বৌদি ? আমরা তিনজনে, আর দুটো মেয়ে আর আমি যখন ফিরে আসছি না, মদ খেয়ে বুড়ো স্মিথি আমাদের কাছে এসে বললে—আমায় চুমু খাও তো ! দুরা তাকে মুখের ওপর লাথি দিয়ে মারলে এক ঘা ; তারপরই দে ছুট্‌ !

:

—আটাশ—

গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিল। গ্রামের কাছে যে জায়গায় কিছুদিন আগেও দনের খরস্রোত ও উত্তালতরঙ্গ নেচে বেড়াত সেখানে ক্রমে চড়া জেগে উঠল। গরুগুলি পিট না ভিজিয়েই নদী পার হয়। রাত্রে পাহাড়ের চূড়া থেকে বিশুষ্ক পবন পোড়া ঘাসের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। প্রান্তরের শুক্‌নো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা দনের চড়া তারই মাদকগন্ধে ভরপুর। রাত্রে দারুণ মেঘ ক'রে আসে ; ঘনকৃষ্ণ মেঘে নীলাম্বর ছেয়ে যায় ; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কানি ও গুরু গুরু ডাকে দনের বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু বর্ষণের নামগন্ধ নেই।

রাত্রির পর রাত্রি ধরে একটা প্যাচা গীর্জার ঘণ্টার চূড়ায় ব'সে বিকট চীৎকার ক'রে যাচ্ছে। আতঙ্কে পল্লীবাসীদের প্রাণ শিউরে ওঠে। ঘণ্টার চূড়া থেকে উড়ে সে গোরস্থানে গিয়ে তৃণাচ্ছাদিত কবরের পাশে ব'সে করুণ আর্তনাদ করতে থাকে।

—যুদ্ধ আসন্ন। তুর্কী যুদ্ধ লাগবার আগেও একটা প্যাচা এমনি ডেকেছিল।

—গীর্জা থেকে উড়ে যখন কবরের কাছে যায় তখন অমঙ্গল অনিবার্য।

গাঁয়ের প্রবীনদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে পান্তেলিমন বলে—আমাদের গ্রীগরী লিখেছে যে অস্ট্রিয়ার জার নাকি সীমান্ত পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং সমস্ত সৈন্য জমায়েৎ করে মস্কোভা এবং পেতরবুর্গের দিকে অভিযান চালাবার নির্দেশও নাকি দিয়ে গেছেন।

প্রবীনেরা অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ক'রে যে যার অনুমান প্রকাশ করতে লাগল। একজন আপত্তি ক'রে বললে—কিন্তু যুদ্ধ কিছুতেই বাধবে না, দেখছো না ফসলের অবস্থা!

—এর সঙ্গে ফসলের কি সম্পর্ক আছে? এঃ! ছাত্রেরা দিয়েছে ওর মাথায় গোল পাকিয়ে!

—যাই হোক্ খবর আমরা পাবোই। কিন্তু কার কার সঙ্গে হবে?

—নিশ্চয়ই সাগরপারের তুর্কিদের সঙ্গে। সমুদ্রের ব্যবধানে কিছুই এসে যাবে না।

আলোচনা ক্রমে ঠাট্টা বিদ্রূপে পর্যবসিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরা একে একে বৈঠক ছেড়ে যায়।

গোরস্থানের পাশেই মার্তিন শামিলের বাড়ী। আজ দু'রাত ধরে সে গোরস্থানের বেড়ার এপাশ থেকে প্যাচাটার ভাবগতি লক্ষ্য করছে। কিন্তু এই অদৃশ্য নিঃশব্দচারী পাখীটি তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে

গিয়ে ওধারের একটা কবরের ক্রুশের পর বসে কর্কশ রবে নিদ্রালু গ্রামবাসীদের শঙ্কাকুল করে তোলে। মার্তিন একটা অশ্লীল শপথ ক'রে শূন্যে গুলী ছুড়ে বাড়ী চলে যায়। ঘরে ফিরতেই তার মুখরা রোগশীর্ণা ষষ্ঠীর বর-প্রাপ্তা স্ত্রী ভর্ৎসনা ক'রে বলে—তুমি চিরকালই কি এমনি নিরেট থাকবে? কেন, পাখীটা কি করেছে তোমার? ভগবান আবার যদি তোমায় শাস্তি দেন তখন কি করবে? এই তো সেদিন আঁতুর থেকে উঠলাম, আবার যদি এখুনি আমার সন্তান-সম্ভাবনা হয়?

—চুপ কর্! আর বকিস্ নি! ধমক দিয়ে মার্তিন বললে: তোর সন্তানসম্ভাবনা অমনিই হবে। পাখীটা ওখানে বসে আতঙ্কে যে আমাদের প্রাণ উড়িয়ে দিচ্ছে দেখছিস্। ওই শালাই আমাদের অমঙ্গল ডেকে আনছে। যুদ্ধ লাগলে আমাকে যদি নিয়ে যায়, তাহ'লে ঐ যে একপাল জন্মেছে ওদের নিয়ে কি দুর্গতি তোর হবে ভেবে দেখেছিস্? হাত দিয়ে শামিল ঘরের একপাশে ঘুমন্ত সন্তানদের দেখিয়ে দিল।

—ঊনত্রিশ—

প্রান্তরের খড় পাহারা দেবার জন্য প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে। দনের ওপারের ঘাসের চাইতে প্রান্তরের ঘাস অনেক ভাল। একই ধরণীর বুকে জন্মে সারভেদে তারা ভিন্নতর। প্রান্তরের কালো মাটি এত ভারী এবং শক্ত যে গরুর পায়ের দাগ পর্যন্ত পড়ে না। এই মাটির বুকেই উগ্রগন্ধী সতেজ ঘাস ঘোড়ার পেট পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে। কিন্তু দনের আর্দ্র পোড়ামাটির বুকে যে শীর্ণ মরামরা গন্ধহীন অকেজো ঘাস জন্মেছে গরুগুলি পর্যন্ত তাতে মুখ দেয় না।

ঘাসকাটা যখন পুরাদমে চলছে সেই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যার ফলে সমস্ত গ্রাম তটস্থ এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। জিলার কমিশার, একজন গোয়েন্দা এবং উর্দিপরা অপর একজন অফিসারকে একসঙ্গে গ্রামে ইতিপূর্বে কোন কালেই দেখা যায় নি। গ্রামে প্রবেশ ক'রেই তারা আতামানকে ডেকে পাঠালো; তারপর সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় ক'রে সটান্ লুকিয়েশকার বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। পল্লীর প্রধান পথ দিয়েই তারা এগুতে লাগলো; আতামান হন্তদন্ত হয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। গোয়েন্দাটি জিজ্ঞাসা করল—শুকমান বাড়ীতে আছে?

—হাঁ স্যার!

—কি ক'রে সে সংসার চালায়?

—ওঃ চমৎকার চাবিওয়ালা!

—তাকে সন্দেহ করবার মত কিছু লক্ষ্য পড়েছে?

—নাঃ!

—কোন লোক আসে তার কাছে? আতামানের হাত ধরে টেনে গোয়েন্দাটি আবার জিজ্ঞাসা করল।

—আসে। মাঝে মাঝে তারা তাস খেলে।

—কে কে আসে?

—প্রায়ই কারখানার মজুরেরা যায়!

—নাম বলতে পারেন?

—ইঞ্জিনচালক, কাঁটাদার, দাভিদ, মাঝে মাঝে আমাদের দু-চার জন কজাকও যায়!

গোয়েন্দাটি থেমে অফিসারের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। অফিসারটি খানিক পেছনে পড়েছিল। উর্দির বোতাম পাকিয়ে দুজনে কানে কানে কয়েক মিনিট ফিসফাস করে গোয়েন্দাটি

আতামানকে বল্লে—দুজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যাদের নাম করলেন তাদের গ্রেফ্তার করে দিয়ে আসুন। গ্রেফ্তার করে সোজা সরকারী দপ্তরখানায় যাবেন; আমরা দু-চার মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি, বুঝলেন?

আতামান নির্দেশ পালন করবার জন্য দ্রুতপদে চলে গেলো।

শুকমান দরজায় হেলান দিয়ে খোলা-বুকে কি একটা কাজ করছিল। অফিসারদের ঢুকতে দেখেই ঠোঁট কামড়ে চাইল তাদের পানে।

—ওঠ! তোমাকে গ্রেফ্তার করলাম। গোয়েন্দাটি আদেশের স্বরে বললে।

—কেন জানতে পারি?

—তোমার ঘর দু'খানা?

—হাঁ!

—আমরা তল্লাসী করব।

অফিসার টেবিল্ পার হয়ে হাতের কাছের বইখানা তুলেই ভ্রূকুঞ্চিত করলো: ট্রাঙ্কের চাবিটা দেখি।

—কেন আমার এই কুটীরে পদার্পণ জানতে পারি?

—পরে সে সম্বন্ধে কথা বলা যাবে।

শুক্মানের স্ত্রী দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে পেছনে সরে গেল। তদন্তকারীর সেক্রেটারী তার পশ্চাদনুসরণ করে সেই ঘরে ঢুকল।

—এখানা কি? হলদে মলাটের একখানা বই ধরে অফিসার ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—একখানা বই।

—ও সব চালাকি এখন রেখে দাও! অন্য সময় আছে। যা জিজ্ঞাসা করি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

মৃদু হেসে শুক্মান স্তোভে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। গোয়েন্দাটি

অফিসারটির ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বইখানা দেখে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি বইখানা পড়ছ নাকি ?

—ও বিষয়ে আমার একটু ঝোঁক আছে। নির্লিপ্ত ভাবে শুকমান জবাব দিল।

—হুঁ !

অফিসার দু-চারখানা পাতা উল্টে বইখানা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর একখানা বইয়েরও পাতা উল্টে এক পাশে সরিয়ে রাখল; তৃতীয় আর একখানার মলাটের লেখা পড়ে আবার শুকমানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস্ করলো : এ রকম আর সব বইগুলি কোথায় রেখেছো ?

শুকমান বাঁ-চোখটা কুঞ্চিত করে বললে : যা আছে দেখছেনই তো ?

—মিথ্যে কথা বলবে না। ধমক দিয়ে অফিসার বলল : আমি চাই…

—তল্লাস ক'রে দেখুন !

কমিশার তলোয়ারখানা কোষমুক্ত ক'রে ট্রাঙ্কটার কাছে গেল। সারামুখে দাগওয়ালা একজন কজাক সৈনিক ইতিপূর্বেই ট্রাঙ্কটা খুলেছে। বেচারা চক্ষের সাম্‌নে এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে ট্রাঙ্কের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে হাতড়াতে লাগল। ট্রাঙ্কের মধ্যে দেখবার মত যা ছিল ওলট-পালট ক'রে সবই দেখা হ'ল। দোকানঘরখানাও ভাল ক'রে তল্লাস করা হ'ল। অত্যুৎসাহী কমিশার দেয়াল কটাও গুঁতিয়ে দেখল।

খানাতল্লাস হ'য়ে গেলে শুকমানকে সরকারী দপ্তরখানায় নিয়ে আসা হ'ল। সৈনিকদের আগে আগে সে পথের মাঝখানটা দিয়ে একটা হাত পকেটে পুরে অপর হাতটা ঝুলিয়ে নির্বিকার ভাবে হাঁটতে লাগল। অপরাপর সকলে রাস্তার পাশ ঘেঁসে চলেছে।

বন্দীদের মধ্যে শুকমানকেই সবশেষে জেরা করা হ'ল। হাতে তেল-কালি মাখা ইভান আলেকসিয়েভিচ, অপরাধীর মত হাসিমাখামুখ দাভিদ, ভালেৎ এবং মিশা কোশিভয়কে পাশের একটা ঘরে সৈনিকদের পাহারায় আটক ক'রে রাখা হল।

খাতার পাতা উল্টে গোয়েন্দাটি প্রশ্ন করলো: কারখানার ওই গুলটার সময়ে যখন জেরা করলাম তখন কেন অস্বীকার করলে যে তুমি রুশীয় সোসাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দলের সদস্য নও?

শুক্‌মান নিরুত্তর।

—যা হোক্ সেটা অবশ্য জানা গেল। তোমার কাজের উপযুক্ত পুরস্কারই পাবে। বন্দীর নীরবতায় বিরক্ত হয়ে তদন্তকারী জোর গলায় বল্লে।

—দয়া ক'রে জেরা আরম্ভ করুন! বিরক্তির স্বরে শুকমান বললে। পাশে একটা টুল দেখে শুকমান বস্‌বার অনুমতি চাইল; গোয়েন্দাটি কোন উত্তর করল না। কিন্তু ঘাড় তুলেই দেখে শুকমান নিশ্চিন্ত আরামে সেটার 'পর বসে পড়েছে।

—কতদিন এসেছ এখানে?

—গত বছর।

—একি তোমার দলের নির্দেশেই এসেছো?

—কারও নির্দেশে আমি আসিনি।

—কত কাল দলে আছ?

—আপনি কি বলছেন?

—বলছি কবে থেকে তুমি রুশীয় সোসাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দলের সভ্য হয়েছো?

—আমার বিশ্বাস…

—তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না। যা জিজ্ঞাসা

করি উত্তর দাও। অস্বীকার ক'রে লাভতো নেইই বরং ক্ষতি হবে। খাতা থেকে একখানা দলিল বার ক'রে গোয়েন্দাটি টেবিলের 'পরে পিন দিয়ে আটকে রাখল।—রস্তক থেকে আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে তোমার সদস্যপদের কথা পাকাপাকি ভাবে বলা হয়েছে।

শুকমান তাড়াতাড়ি দলিলখানার উপর চোখ বুলিয়ে কয়েক মিনিট সে দিকে চেয়ে কি ভাবল, তারপর ধীর শান্তভাবে জবাব দিলে—১৯০৭ সাল থেকে।

—বটে! তুমি ব'লছো দল থেকে তোমাকে এখানে আসতে বলে নি!

—না।

—তাহ'লে কেন এলে?

—এদের একটা চাবিওয়ালার দরকার ছিল!

—তাহালে এ অঞ্চলটাকেই তুমি বিশেষ ক'রে বেছে নিলে কেন?

—বোললাম তো!

—এখানে থাকবার সময়ে দলের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখছো, বা পূর্বে কখনও ছিলো?

—না।

—তুমি এখানে এসেছো তারা জানে?

—আমার বিশ্বাস জানে।

ছুরি দিয়ে পেন্সিলের শিসটা ছুঁচালো ক'রে নিয়ে গোয়েন্দাটি ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে: দলের কোন সদস্যের সঙ্গে তোমার পত্রের আদান-প্রদান আছে?

—না।

—তা'হলে খানাতল্লাসীর সময় যে চিঠিখানা পেলাম তা পাবার অর্থ?

—ও আমার এক বন্ধুর চিঠি। কোন বিপ্লবীদলের সঙ্গেই তার কোন সংস্রব নেই!

—রস্তক্ থেকে তুমি কোন নির্দেশ পেয়েছো?

—না।

—কারখানার সব মজুররা তোমার ওখানে আসত কেন?

অফিসারের এই বোকার মত প্রশ্ন শুনেই শুকমান একটু মুচকি হাসল।

—শীতের রাতে নেহাৎ সময় কাটে না বলেই আমরা বসে বসে তাস খেলতাম।

—আর এই সব বাজেয়াপ্ত বই পড়তে!

—না:! প্রায় সকলেই তারা নিরক্ষর।

—কারখানার ইঞ্জিনচালক এবং আর সকলেও একথা স্বীকার করেছে।

—ওসব মিথ্যে কথা!

—আমার মনে হয় তোমার এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানও… শুকমান হেসে ফেল্ল: সোজা কথায় তোমার বুদ্ধি বেশী প্রখর নয়! বারে বারে অস্বীকার ক'রে নিজের বিপদই ডেকে আনছো। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কজাকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি ক'রে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্যই তোমাকে দল থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না অকারণ ভান ক'রে তোমার কি লাভ? এতে তোমার অপরাধ বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না!

—এগুলি সবই আপনার অনুমান। তামাক খেতে পারি? ধন্যবাদ। আর এসব অনুমান একেবারেই ভিত্তিহীন।

—যে সব মজুর তোমার ওখানে যেত তাদের এই বইখানা তুমি পড়ে শোনাতে? একখানা ছোট বইয়ের'পর হাত দিয়ে

নামটা চেপে ধরে তদন্তকারী জিজ্ঞাসা করল। তার হাতের ফাঁক দিয়ে প্রেথানফ শব্দটা দেখা যাচ্ছে।

—হাঁ কবিতার পড়ি বই কি? সিগ্রেটে টান দিয়ে শুকমান জবাব করল।

পরদিন সকালেই ডাকগাড়ীর পেছনে বসিয়ে শুকমানকে গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। উভয় পার্শ্বে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে দুইজন সৈনিক তাকে চেপে বসে ছিল। মুখে দাগওয়ালা যে সৈনিকটি খানাতল্লাসীর সময়ে ছিল সে বাঁ-হাতে শুকমানের কনুই চেপে ধরে আড়চোখে তার দিকে চাইছিল। গাড়ীখানা ঘর্ঘর শব্দে পথ দিয়ে ছুটে চলল। মেলেখফদের ফার্মের কাছে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক শালগায়ে ওয়াটল গাছের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখের জলে তার পাণ্ডুর মুখ ভিজে গেছে। গাড়ীখানি দ্রুতবেগে পাশ কাটিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি বুকে হাত চেপে তার পেছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে করুণ স্বরে বললে—অসীপ! অসীপ দাভিদোভিচ্! অসীপ! কি কোরে ওরা তোমাকে...

শুকমান হাত তুলে তাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার চেষ্টা করল; কিন্তু মুখে দাগওয়ালা সৈনিকটি সজোরে তার হাত ঠেসে ধরে কর্কশ কণ্ঠে বললে: চুপ ক'রে বসে থাক্। একচুল নড়েছিস তো মুণ্ড কেটে ফেলবো।

জারের বরুদ্ধে মাথা তুলবার দুঃসাহস করে এমন একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় তার নিরীহ কজাকজীবনে এই প্রথম।

—ত্রিশ—

তাতারস্কায়া থেকে রাদজিভিল্লোভা সহর পর্যন্ত দীর্ঘ পথ গ্রীগরীর কাছে আবছা কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে মনে মনে ছবি আঁকবার চেষ্টা করত কিন্তু বিশেষ ফল হ'ত না। শুধুমাত্র ষ্টেশনের কোঠাবাড়ী, গাড়ীর চাকার অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ, সীমাহীন রেল-লাইন এবং কিয়েফ বা ভরোনিশ ষ্টেশনের দাড়িওয়ালা সান্ত্রীর কথা আবছা আবছা মনে পড়ত'।

গন্তব্য ষ্টেশনে নেমে গ্রীগরী দেখল বহু অফিসার এবং দাড়িগোঁফ কামান বহু লোক দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। তাদের ভাষা সে বোঝে না। ঘোড়াগুলি নামানো হয়ে গেলে একজন কমাণ্ডার তার মধ্য থেকে শ'তিনেক ঘোড়া বেছে পশু-হাসপাতালে পরীক্ষা করবার জন্ম নিয়ে গেলেন। এইখানে আবার দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে ঘোড়াগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'ল। তারপর সৈন্যদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হ'ল। ঘোড়ার রঙ অনুসারে সৈন্যদের ছয়টি দলে ভাগ করা হ'ল। গ্রীগরী পড়লো চতুর্থ দলে। নতুন পাকা রাস্তায় চলতে গিয়ে বন অঞ্চলের ঘোড়াগুলি প্রথমে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। নিজেদের পায়ের শব্দে নিজেরাই কানখাড়া করত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই পরিচয়াভাব কেটে গেল।

এই অপরিচিত পোলমুলুকে বিচ্ছিন্ন ঝোঁপঝাড় ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। দিনের বেলা গুমট গরম, আকাশে মেঘলাভাব। মেঘের অবগুণ্ঠনের অন্তরালেই সূর্য্যদেবকে দৈনন্দিন পরিক্রমা শেষ করতে হয়।

অফিসারদের পাশ দিয়ে যাবার-বেলা গ্রীগরী ফিরে চাইল কিন্তু তাদের আলোচনার মধ্যে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার নামগন্ধও ছিল না।

এই নিরস একঘেয়ে উপায়ান্তরহীন জীবন কজাকদের মুক্তজীবনের চারিপাশে নিয়মের যে কঠিন বেড়াজাল গড়ে তুলেছিল তাতে প্রায় সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হল। তরুণদের অবস্থা হল বিশেষ দুর্বিসহ। সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্যারেড্—একবার ঘোড়ায় চড়ে, আবার হেঁটে! সেও তবু নাহয় যা হোক্ একরকম গেল। সন্ধ্যা হলেই ঘোড়াগুলিকে খাইয়ে দাইয়ে আস্তাবলে ঠিকঠাক করে রেখে আস্তে হবে; তারপরই আবার নাম-ডাকা; এই সব শেষ হয়ে রাত্রের মত প্রহরী নিয়োগ করে গোটা দশেক যখন বাজল, তখন ডাক পড়ল উপাসনার ঘরে।

ভোর হলেই আবার পুরাতন নিয়মের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। এ দিনের সঙ্গে পরদিনের কোনও তফাত হবার জো নেই!

সমস্ত এষ্টেটটার মধ্যে স্ত্রীলোক মাত্র দুটি। একজন নায়েবের বৃদ্ধা স্ত্রী, অপরটি নায়েবের তরুণী পরিচারিকা ফ্রন্যা।

ফ্রন্যাকে প্রায় সব সময়েই ভাঁড়ার ঘরে কর্ণহীন বৃদ্ধ প'টনের পাচকের সঙ্গে দেখা যেত। উঠান দিয়ে ছুটে যাবার বেলা সকলেই এই তরুণীটির স্কার্টের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত'। অফিসার ও সৈন্যসহ প্রায় তিনশ জোড়া চোখ তার দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে আছে টের পেয়ে মেয়েটি নিতম্ব দুলিয়ে হেঁশেল ও ঘরের মধ্যে বারে বারে ছুটাছুটি ক'রত। চলাফেরার মধ্যে ফুটে উঠত একটা সোহাগগলা ছিনালী হিল্লোল। সামনের কোন সৈন্যই তার বাঁকা চাহনির করুণা থেকে বঞ্চিত হত'না। তবে নজরটা অফিসারদের দিকেই ছিল কিছুটা বেশী। এই তিনশত সৈন্যের প্রত্যেকেই তার কৃপাপ্রার্থী হলেও, শোনা গেল যে জয় হয়েছে কোম্পানী কমাণ্ডারেরই।

প্রথম বসন্তে একদিন গ্রীগরীকে দিনভর আস্তাবলে কাজ করতে হয়। সারাবেলা সে এক কোণেই কাটাল। সেখানে অফিসারদের ঘোড়াগুলি একটি ঘুড়ীর উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কোম্পানী-কমাণ্ডারের ঘোড়াটা যেখানে থাকে, সেই জায়গা পার হতেই আস্তাবলের অন্ধকার কোণ থেকে গ্রীগরের কানে একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তি এবং গোঙানির শব্দ এল। এই অস্বাভাবিক শব্দে চমকিত হয়ে গ্রীগরী সেদিকে এগুলো। হঠাৎ কে যেন চট করে আস্তাবলের কবাটটা বন্ধ করে দিল; আর একজনে চাপা গলায় ওপাশ থেকে বল্লে—তাড়াতাড়ি! এই তাড়াতাড়ি।

গ্রীগরী দ্রুতপদে সেদিকে এগিয়ে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল: এই, কে ওখানে?

পর মুহূর্তেই অন্ধকারের মধ্যে একজন কোম্পানী-সার্জেন্টের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। ছোকরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল।

—মেলেখক নাকি? গ্রীগরীর কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় সার্জেণ্ট বল্লে।

—দাঁড়ান্! কি হচ্ছে?

সার্জেণ্ট অপরাধীর মত হেসে গ্রীগরীর হাত টেনে ধরল; হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রীগরী দরজার দিকে ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় কবাট খুলে ফেল্ল। হঠাৎ আলোর সামনে পড়ে তার চোখ ধেঁধেঁ গেল। আস্তাবলের অন্ধকার কোণে অধিকতর চাপা সোরগোল শুনে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে গ্রীগরী চাইল সেদিকে। দুচার পা এগুতেই জারককের সঙ্গে দেখা। বেচারী পাজামার বোতাম আটকাচ্ছে।

—ব্যাপার কি? এখানে কি কচ্ছ তোমরা?

—যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও। চাপাগলায় জারকক বল্লে: ওরা ফ্রস্কা মেয়েটাকে ধরে এনে তাকে ন্যাংটা করেছে।

পাশবিক উল্লাসে জারকফ হি হি করে হেসে উঠল। কিন্তু গ্রীগরীর এক ধাক্কাতেই দেয়ালে ছিটকে পড়ে বেচারীর হাসি থেমে গেল। কোণে ছুটে গিয়ে দেখে যে প্রথম কোম্পানীর কতগুলি কজাক ভেতরে প্রবেশ করবার জন্ত ঠেলাঠেলি করছে। কোন কথা না বলেই গ্রীগরী তাদের ঠেলে কিছুটা এগিয়ে উঁকি মেরে দেখে যে একখানা ছেড়া স্তাকড়া দিয়ে চোখ মুখ ঢাকা পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন বিবস্ত্রা ফ্রন্তার বিবশ দেহ মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর নির্লজ্জ পৈশাচিক উন্মাদনায় মাতাল এই বুভুক্ষু পশুর দল একের পর অন্তে ক্রমাগত তার উপর এদের রাক্ষুসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করছে। সার্জেণ্ট মেজরকে ডাকবার জন্ত গ্রীগরী ছুটে দরজার দিকে এল। কিন্তু কজাকদের মধ্যে কয়েকজন ছুটে এসে তার মুখ চেপে ধরল। একটাকে গ্রীগরী ধাক্কা মেরে দেয়ালের পর ফেলে দিলে; আর একটার পেটে লাথি মারতেই সে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু বাকী কয়েকজন এসে গ্রীগরীকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে চোখে মুখে কাপড় জড়িয়ে একটা শূন্ত গামলার মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আবার দলে ভিড়ল গিয়ে। নাক চাপা পড়ে গ্রীগরীর দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। চীৎকার করতে না পেরে সে প্রাণপণে বেড়ার উপর লাথি মারতে লাগল। কজাকদের চাপা কথা ও যাতায়াতের শব্দ কানে আসছে কিন্তু নিরুপায়। মিনিট কুড়ি পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। দরজার সামনে সার্জেণ্ট মেজর এবং আর দু'জন কজাক তাকে শাসিয়ে বল্লে: এ সম্বন্ধে শব্দটি করবি না বলে দিলাম।

তারপর দুটি কজাক ফ্রন্তার অসাড় দেহ তুলে একটা গামলার পর উঠে বেড়ার দুটো তক্তার ফাঁক দিয়ে ওপাশে ফেলে দিল। বাগানের পাশেই বেড়া। প্রত্যেকটি স্টলের উপরেই একটি করে জানালা। ফ্রন্তা কি করে দেখবার জন্ত কয়েকজন কজাক স্টলের বেড়া বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মারল। আর সবাই এই অবসরে দুপ্ দাপ্ করে

আস্তাবল থেকে খসে পড়ল। গ্রীগরীও দেখবার অদম্য কৌতূহল দমন করতে পারল না। একটা বেড়ার পরে উঠে সেই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রইল। প্রায় কুড়ি দুয়েক চোখ উৎসুকভাবে এই ধর্ষিতা মেয়েটির পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। চিৎ হয়ে পড়েছিল সে। মাঝে মাঝে শুধু পা দুখানা কাঁচির মত অসাড় ভাবে ঈষৎ নাড়ছে।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। অবশেষে ফ্রন্যা চার হাতপায়ে ভর করে উঠবার চেষ্টা করল। গ্রীগরী বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল তার হাত দু'খানা থর থর করে কাঁপছে। দেহের ভার বইবার মত ক্ষমতা নেই। খানিক পরে টল্‌তে টল্‌তে ফ্রন্যা কোন মতে পায়ে ভর করে দাঁড়াল। কিন্তু টাল সাম্‌লাতে না পেরে দেয়ালে ভর করে কিছুকাল অবসন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে অবসন্ন শূন্যদৃষ্টিতে জানালার দিকে চেয়ে একহাতে দেয়ালে ভর করে অপর হাতে উড্‌বাইন্‌ ঝোঁপ ধরে একপা' দুপা' করে এগুতে লাগল।

মেয়েটির করুণ অবস্থা দেখে গ্রীগরী লাফিয়ে নামল। মনে হ'ল তার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। দরজার কাছে একজন কজাক তাকে শাসিয়ে বল্লে—ত্যাখ্‌ একটি কথা বল্‌বি তো যীশুর নামে শপথ করে বলছি, তোর ঘাড়ে মুণ্ডু থাকবে না।

প্যারেডের মাঠে কমাণ্ডারের চোখে পড়ল যে গ্রীগরীর কোটের একটা বোতাম নেই। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কার সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলে? একে বলে কোন কায়দা?

গ্রীগরী চেয়ে দেখে সত্যিই একটা বোতাম হারিয়ে গেছে। কিন্তু যে উপলক্ষে হারিয়েছে তার করুণ স্মৃতির কথা মনে পড়তেই বহুদিন পরে তার বুক ফেটে কান্না এল।
